কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে সূফীবাদের অবস্থান

পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

উপস্থাপক

আশরাফুন নাহার
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি নং : ৮৮(পুন:)/২০১৮-২০১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

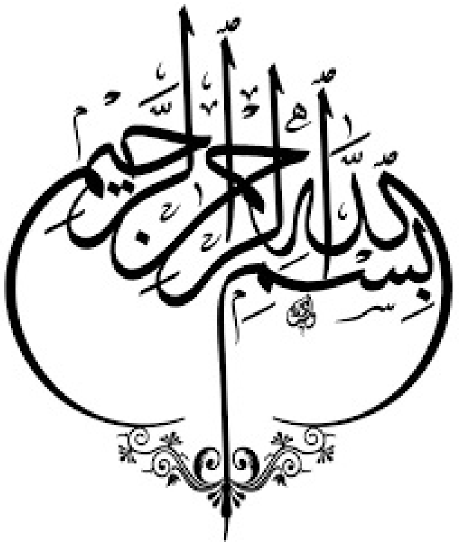

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে সূফীবাদের অবস্থান

পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

উপস্থাপক

আশরাফুন নাহার
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি নং : ৮৮(পুন:)/২০১৮-২০১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি স্ট্যাডিজ বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে সুফীবাদের অবস্থান** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে ও নির্দেশনায় রচিত। এটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে কোন Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

(আশরাফুন নাহার)

পিএইচ. ডি গবেষক

রেজি. নং- ৮৮/২০১৮-১৯ (পুন:)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মে ২০২৩ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি গবেষক জনাব আশরাফুন নাহার কর্তৃক পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে সুফীবাদের অবস্থান** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত পড়েছি, যথাযথ সংশোধনী প্রদান করেছি এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমার জানা মতে গবেষকের অভিসন্দর্ভে কোন প্রকার Plagiarism নেই।

(অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মে, ২০২৩ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
(আ.)	:	‘আলাইহিস সালাম
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি ‘আলায়হি
রেজি.	:	রেজিষ্ট্রেশন/রেজিষ্টার্ড
হি.	:	হিজরী
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ
ব.	:	বঙ্গাব্দ
তা. বি	:	তারিখ বিহীন
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
ড.	:	ডক্টর/পিএইচ.ডি
ঢা বি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢা বি লা	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী
বা ই সে	:	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
বাং	:	বাংলা
বি আই আই টি	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
লি.	:	লিমিটেড
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
সম্পা.	:	সম্পাদিত
অনূ.	:	অনূদিত
সং	:	সংস্করণ
মৃ.	:	মৃত

Dhaka University Institutional Repository

প্র.	:	প্রকাশিত/প্রকাশকাল
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
SM	:	Sallallahu Alaihi Wasallam
ibid	:	Ibiden
P.	:	Page
PP.	:	Pages
Vol	:	Volume
ed.	:	Edition
Opcit	:	Open Cito

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا – অ	ش - শ	و - ও, ব	اى - ঈ, য়ী	ى - যূ
ب - ব	ص - স	هـ - হ	ا - ঊ	يو - ই, উ
ت - ত	ض - দ, য	ء - ’	او - ঊ	ع - ‘আ
ث - স	ط - ত	ى - য়	و - ওয়া	عا - ‘আ
ج - জ	ظ - য	ا - া	وا - ওয়া	ع - ‘ই
ح - হ	ع - ‘	ا - ি	و - বি, ভি	عى - ‘ঈ
خ - খ	غ - গ	ا - ু	وى - বী, ভী	ع - ‘উ
د - দ	ف - ফ	او - ূ	و - উ	عو - ‘ঊ
ذ - য	ق - ক	اى - ূ	وو - ঊ	
ر - র	ل - ল	ا - আ	ي - য়্যা	
ز - য	م - ম	ا - আ	يا - ইয়া	
س - স	ن - ন	ا - ই	يِ - য়ী	

ء আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে ’ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা تأويل = তা’বীল এবং = ع আর সাকিন হলে ‘ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা نعت = না‘ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ মহা মহিম এক-অদ্বিতীয় অখণ্ডনিয় রাব্বুল আলামিনের প্রতি যিনি গুনে ও সৌন্দর্যে (নূরে তাজাল্লীতে) অনন্ত অসীম ও প্রেমময়। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের আকাঁ ও মওলা, উম্মতের কাণ্ডারী, পারের কাণ্ডারী, শাফায়াতের কাণ্ডারী, দো-জাহানের বাদশাহ, আখেরী নবী আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সমস্ত আহলে বাইয়াতের সদস্যদের প্রতি। এরপর আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার প্রাণপ্রিয় বাবা-মাকে যাঁদের পূর্ণ সমর্থন, সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও ত্যাগের ফলে আমি উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ তায়ালা আমার বাবা-মাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন, সবসময় সুস্থ রাখুন এবং হায়াতে তায়্যিবাহ বৃদ্ধি করুন।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ যিনি আমার গবেষণা কার্য তত্ত্বাবধানে সম্মতি জ্ঞাপন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমার গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মুল্যবান পরামর্শ ও কঠোর দিক-নির্দেশনা দানের মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আমি স্যারের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলা একাডেমী, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, গোপালগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, গোপালগঞ্জ নজরুল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি যারা আমাকে গ্রন্থাদি সরবরাহসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। যাদের লেখা থেকে আমি সহায়তা নিয়েছি তাদের প্রতিও আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, হাজী লালমিয়া সিটি ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড. সাইফুর রহমান (নান্টু), অধ্যক্ষ জনাব পলাশ কুমার বিশ্বাস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হকের প্রতি। যারা আমাকে গবেষণার ব্যাপারে কলেজ হতে সময় ও সুযোগ করে দিয়েছেন। এরই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, হাজী লালমিয়া সিটি ডিগ্রী কলেজের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রতি যারা এ ব্যাপারে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ, সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্বামী এ্যাডভোকেট মোঃ সিদ্দিকুজ্জামান এর প্রতি যিনি আমার এ গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করার পিছনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তার আন্তরিক সমর্থন না থাকলে আমার পক্ষে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার গবেষণা কর্মটি পুরাটাই কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন। আমার যে কোন অর্জন তার কাছে পরম প্রাপ্তির, তার জন্যও গর্বের। তাই শুধু কৃতজ্ঞতা তার জন্য যথেষ্ট নয়, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান কামনা করি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাইয়া শেখ মোঃ রাকিবুল হাসান (যিনি বর্তমান স্কলারশীপ নিয়ে আমেরিকায় অধ্যায়নরত) এর প্রতি যার আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন এবং তার সংগ্রহে থাকা প্রচুর আধ্যাত্মিক বই দেখে এই বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই সূফীবাদের উপর গবেষণা করার ইচ্ছা তৈরী হয়। আমার গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বই দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহ এবং সাহস দিয়ে সার্বক্ষণিক পাশে থেকে আমার গবেষণা কার্যকে সহজসাধ্য করেছেন। আল্লাহ পাক ভাইয়ার সমস্ত নেক বাসনা পূর্ণ করুন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় বোন আফরোজ জাহান শিল্পীর (পিএইচ.ডি গবেষক) প্রতি, যিনি ২০০৬ সালে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল গবেষক হতে হবে। তিনিই ছিলেন প্রথম অনুপ্রেরণা। তিনিও গবেষণাকর্মটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় ভাই ডাঃ আবু হেনা মোস্তফা আলীম সুজন (মনোরোগ বিশেষজ্ঞ) এর কাছে। গবেষণা কর্মটির মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ব্যক্তিগত কারণে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি, যার ফলশ্রুতিতে আমার গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ভাইয়ার মানসিক সাপোর্ট এবং ঔষধের ওছিলায় আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ হয়ে উঠি এবং আবার গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করি।

সর্বোপরি আমি আমার ছোট বোন মিতু, ভগ্নিপতি রাসেল খান, বড় দুলাভাই সুমন, বড় ভাবি সাবিল, ছোট ভাবি জুঁই এবং শুভানুধ্যায়ী, হিতাকাঙ্খী, স্নেহাস্পদ এর প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ প্রাপ্ত হন। আবারও পরম করুনাময়ের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার তৌফিক দানের জন্য। আর প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

আশরাফুন নাহার
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ঘোষণাপত্র

প্রত্যয়নপত্র

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

প্রতিবর্ণায়ন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৬-২২

অধ্যায় : এক

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা (Necessity, Retionality, Objective, Methods and Limitation of the Research) ২৩-৩০

১.১ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of the Research)

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা (Retionality of the Research)

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Research)

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি (Method of the Research)

১.৫ গবেষণায় গৃহীত উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ (Metrials and Sources of the Data Collection of the Research)

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research)

১.৬ গবেষণার কাঠামো (Structure of the Research)

অধ্যায় : দুই

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পর্যালোচনা (Review of the Books Related with the Research) ৩১-৫১

অধ্যায় : তিন

সূফী এবং সূফীবাদ (Sufi and Sufism)...৫২-১০৩

৩.১ সূফী পরিচিতি (Introuction of Sufi)

৩.২ সূফীবাদের উৎপত্তি (Origings of the Sufism)

[বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব মতবাদ, খ্রিষ্টীয় বা নিওপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ, পারসিক প্রভাব মতবাদ, কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক মতবাদ]

৩.৩ সূফীবাদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Sufism)

[প্রথম স্তরঃ আস্হাবে সূফ্ফার পবিত্র সাধনা, দ্বিতীয় স্তর : কৃচ্ছ্রতা সাধন, তৃতীয় স্তর : সূফীবাদের নীতিমালা নির্ধারণ, চতুর্থ স্তর : ওয়াহদাতুল ওজুদ এর উন্মেষ, পঞ্চম স্তর : কঠোর সাধনা, আধ্যাত্মিকতা ও ওয়াহদাতুল ওজুদের সমন্বিত রূপ, ষষ্ঠ স্তর : ওয়াহদাতুল ওজুদ এর তাত্ত্বিক রূপ, সপ্তম স্তর : ওয়াহদাতুশ শহুদ, অষ্টম স্তর : ‘ওজুদিয়া’ ও ‘শহুদিয়া’-এর সমন্বয়]

৩.৪ বিভিন্ন সূফী তরীকা (Variations of Sufism)

[কাদেরিয়া তরীকা; কাদেরিয়া তরীকামতে সাধনা, চিশতিয়া তরীকা; চিশতীয়া তরীকার সাধনা, নকশ্বন্দীয়া তরীকা; নকশ্বন্দিয়া তরীকার সাধনা, মুজাদ্দেদিয়া তরীকা; মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সাধনা, সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকা, কলন্দরিয়া তরীকা, মাদারীয়া তরীকা, শততারিয়া তরীকা, মৌলবীয়া তরীকা, সেনুনিয়া তরীকা, রিফাতিয়া তরীকা, হাতিমিয়া তরীকা, ওয়ায়েসিয়া তরীকা, আদহামিয়া তরীকা, জালালিয়া তরীকা, খাররাজিয়া তরীকা, আহমাদিয়া তরীকা, খিজিরিয়া তরীকা, তিজানীয়া তরীকা, খালওয়াতিয়া তরীকা, মুহাম্মদিয়া তরীকা, তাইফুরিয়া তরীকা, সাধিলিয়া তরীকা, নিয়ামতুল্লাহিয়া তরীকা, আহ্সানিয়া তরীকা; আহ্সানিয়া তরীকার সাধনা]

[উপসংহার]

অধ্যায় : চার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সূফীবাদের মূলনীতি, বিশ্বাসগত অবস্থান ও আচার-অনুষ্ঠান (The Principles, beliefs and rituals of the Sufism based of the Quran and Hadith)...১০৪-১৮৬

৪.১ সূফীবাদের মূলনীতি (The Principles of the Sufism)

[তাওবাহ্ (অনুশোচনা), তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা), পরিবর্জন, সবর (ধৈর্য), শুক্র (কৃতজ্ঞতা), তাসলীম (আত্মসমর্পণ), ইখলাস (পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা), ইশ্কে এলাহী (আল্লাহ প্রেম), যিকির (স্মরণ), কাশ্ফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি), সামা (সঙ্গীত), হাল (ভাবাচ্ছাস), ফানা, বাকা]

৪.২ সূফীবাদে বিশ্বাসগত অবস্থান (Beliefs in the Sufism)
[বাইয়াত, মুর্শিদের আবশ্যিকতা, তাওয়াসসুল (ওছিলা), শাফাআত; কুরআনের আলোকে শাফাআত, হাদীসের আলোকে শাফাআত, আহলে বাইত; কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে বাইত]

৪.৩ সূফী সমর্থিত কিছু আচার অনুষ্ঠান (Authorized Sufi Rituals)
[মীলাদ, কিয়াম, মাজার জিয়ারত]

অধ্যায় : পাঁচ

বাংলাদেশে সূফীবাদ (Sufism In Bangladesh).....................................১৮৭-২৬১

৫.১ সূফী সাধকগণের আগমনের প্রথম পর্যায় (The First Stage of the Arrival of Sufies)
[হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.), মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার (র.), শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.), হজরত বাবা আদম শহীদ (র.), হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.), হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.), শাহ মাখদুম রুপোশ (র.), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.), হযরত খায়রুল বাশার ওমজ (র.)]

৫.২ সূফী সাধকগণের আগমনের দ্বিতীয় পর্যায় (The Second Stage of the Arrival of Sufies)
[হযরত শাহ তুর্কান শহীদ (র.), মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.), হযরত মাখদূস শাহ দৌলাহ শহীদ (র.), হযরত চিহিল গাজী (র.), হযরত শাহ বন্দেগী গাযী (র.), নিমাই পীর বা মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন (র.), হযরত দেওয়ান শাহাদত হোসেন (র.), হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.), হযরত আমীর খান লোহানী (র.), হযরত শাহ কলন্দর (র.), হযরত মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.), হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী (র.), হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.)]

৫.৩ সূফী সাধকগণের আগমনের তৃতীয় পর্যায় (The Third Stage of the Arrival of Sufies)
[শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ (র.), হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.), হযরত শাহদৌলাহ (র.), হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব (র.), হযরত শেখ আখি সিরাজুদ্দীন (র.), হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (র.), হযরত উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী (র.), হযরত শাহ বদরউদ্দীন ওরফে পীর বদর (র.), হযরত শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা (র.), হযরত কাতাল পীর (র.), হযরত শাহ মুহসীন আউলিয়া (র.), হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ (র.), হযরত সৈয়দ মীরান শাহ (র.), হযরত মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশত বুখারী (র.), হযরত শাহ কামাল (র.), হযরত সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.),

হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (র.), হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.), হযরত শাহ লঙ্গর (র.), হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.), হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.), হযরত খান জাহান আলী (র.), হযরত খালাস খান (র.), হযরত শাহজালাল দক্ষিণী (র.), হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.), হযরত শাহ পীর (র.), হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী (র.), হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.), হযরত শরফুদ্দীন চিশতী (র.), হযরত কাযী মুওয়াক্কিল (র.), হযরত শাহ মুকাররাম (র.), হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র.), হযরত শাহ আবদুর রহীম শহীদ (র.), হযরত শাহ আফজাল মাহমুদ (র.)]

অধ্যায় : ছয়

বিশিষ্ট সূফী সাধকগণের জীবনচরিত (Biography of Eminent Sufies)....২৬২-৩২৮

[**হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.)** : জন্ম, জন্মস্থান, বংশ পরিচয়, নামকরণ, বাল্য জীবন, সংসার বিরাগ, শিক্ষা জীবন, ভারতবর্ষে আগমন, বিবাহ ও বংশধরগণের পরিচয়, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর রচনাবলী, ইন্তেকাল]

[**হযরত ইমাম গাযালী (র.)** : জন্ম ও বংশ, শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, ইমাম সাহেবের নির্জন বাস, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, গৃহ প্রত্যাবর্তন, পুনরায় অধ্যাপনা, ইমাম গাযালী (র.) এর রচনাবলী, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবলী (উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ), সন্তান, ইন্তেকাল]

[**হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)** : জন্ম, বংশ পরিচয়, নামকরণ, বাল্যকাল, শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন, গুনাবলী ও চরিত্র, সন্তান, রচনাবলী, ইন্তেকাল]

[**হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.)** : জন্ম ও বংশ, শৈশবকাল, শিক্ষা জীবন, তরীকত শিক্ষা, মুজাদ্দিদ আলফে সানী উপাধি লাভ, হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সংগ্রাম, বিবাহ, সন্তান, পুত্রগণ, কন্যাগণ, চরিত্র ও গুণাবলী, রচনাবলী, ইন্তেকাল]

সুপারিশমালা (Recommendations)...৩২৯-৩৩১

উপসংহার (Conclusion)...৩৩২-৩৩৫

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliogrpahy) ৩৩৬-৩৬৫

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম সর্বকালের সর্বদেশের সর্বমানবের সার্বিক ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বহুকালের ও বহু মস্তিস্কের বিপুল প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বুদ্ধিজাত মানবসৃষ্ট দর্শন এটি নয়; বরং অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের যিনি প্রভু, আদি-অন্তহীন প্রেমময় যে পরমজাতপাক আল্লাহ, যিনি আপনাতে আপনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দৃশ্য, অদৃশ্য, ভূত ও ভবিষ্যতের সকল কিছুর একমাত্র অধীশ্বর- তাঁরই প্রদত্ত এ জীবন বিধান। তাই মানব জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে এ জীবন বিধানে দিক নির্দেশনা রয়েছে। মানবের সামগ্রিক ও সার্বিক জীবনের বিভিন্ন দিক বা শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, পারলৌকিক, ইহলৌকিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রভৃতি দিক মিলিতভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। জীবনের এইসব দিককে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগ বাহ্যিক, অন্যটি অভ্যন্তরীণ। মানব জীবনের ব্যক্তিক ও সামাজিক দিকের বাহ্যিক রূপের যে বিধি বা নিয়ম, তাই শরীয়ত। শরীয়ত ইসলামের যাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। আর ইসলামের অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচায়ক সূফীবাদ। শরীয়তকে দেহ এবং সূফী দর্শনকে আত্মা বা প্রাণ চিন্তা করা হয়। যে দুটির সমন্বয়েই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ব্যতিরেকে আরেকটি অসম্ভব। তেমনি শরীয়ত ব্যতীত তরীকত কল্পনা করা যায় না। আত্মারূপ সূফীতত্ত্ব ও দেহরূপ শরীয়ত এ দুয়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা মুসলিম মানসে অপরিসীম। এজন্য একজন প্রকৃত সূফীর জীবনে শরীয়ত ও মারিফাত সমভাবে ক্রিয়াশীল। প্রকৃত মুমিন ও প্রকৃত সূফী এর মধ্যে তাই কোন পার্থক্য নেই।

সূফীবাদ হচ্ছে এক ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক মতবাদ যা ইসলামের মরমি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। সূফীসাধকগণ ন্যায়-নীতি ও ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে আন্তরিক ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চান। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই হল সূফীবাদের মূলনীতি। পরম সত্তা আল্লাহর সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে পরিতৃপ্তি তা-ই সূফী সাধককে ক্ষনস্থায়ী জাগতিক প্রলোভন এবং আপত মধুর ইন্দ্রিয় শক্তি হতে মুক্ত করে তাকে পরিপূর্ণ

মনুষ্যত্বের সাধনায় স্বার্থক করে তোলে। আল্লাহ প্রেমই সূফীসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরশ সত্তাকে জানার ও চেনার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। মানুষ এই পরিচয়-আকাঙ্খায় নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলে সেই আল্লাহর পথে, যার ধারণা দর্শনশাস্ত্রে নৈর্বাত্তিক আল্লাহ রূপে মানুষের অন্তরের অনন্ত পিপাসাকে নিবারণ করতে অসমর্থ। সেজন্যই মানুষ তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম প্রিয়তমের সন্ধান লাভ করে তাঁর সাথে নিবিড় যোগসূত্রে মিলিত হয়েছে। পরম সত্তাকে জানার এই প্রচেষ্টাকে 'মরমীবাদ' বলে অভিহিত করা হয়। মরমীবাদ তাই মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসাকে মেটাতে প্রয়াস পায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক অভাবিত সম্পর্কের সন্ধান দেয়। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে এই মরমীবাদ 'তাসাউফ' নামে খ্যাত, যাকে বাংলায় সূফীদর্শন বা সূফীতত্ত্ব বলা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মরমী সাধকদেরকে এক একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান মরমী সাধকদেরকে 'সূফী' নামে অভিহিত করা হয়।

সূফীতত্ত্বের ইতিহাসের সূচনাতেই দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবা কেরামকে বাতেনী ইলম প্রদান করেছেন এবং যিকির, ফিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা ও কুরআনী ফায়েজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ শ্রেণীভূক্ত একদল সাহাবী মসজিদে নববীর বারান্দায় ন্যূনতম সাংসারিক প্রয়োজন ব্যতীত সব সময় যাহেরী-বাতেনী আলোচনা ও ধ্যান-ধারনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। তাঁদেরকে আসহাবে সূফ্‌ফা বা আহলে সূফ্‌ফা বা বারান্দার অধিবাসী বলা হতো। আসহাবে সূফ্‌ফা বা আহলে সূফ্‌ফাগণই সূফী সাধনার ইতিহাসে প্রাথমিক পর্যায়ের সূফী নামে পরিচিত। কারো কারো মতে সূফ শব্দ থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সূফ শব্দের অর্থ পশম। যাঁরা পশমী কাপড় পরিধান করেন ও অনাড়ম্বর জীবন-যাবন করেন, তারাই সূফী নামে পরিচিত। সূফী শব্দটা সূফীদের অবয়ব ও পোশাকের সাথেই সংযুক্ত ছিল। তবে সূফ বা পশম থেকে সূফী মতবাদের উৎপত্তি, এটাই শেষ কথা নয়। কারণ আসহাবে সূফ্‌ফার সকলেই পশমের কাপড় পরিধান করতেন না। কেউ কেউ সাফা শব্দ থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন। সাফা অর্থ পরিচ্ছন্নতা সূফীগণ পূত-পবিত্র চরিত্রের মানুষ বলে ধরে নেওয়া হয়।

সূফী নামকরণের সব তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, একমাত্র আসহাবে সূফ্‌ফা শব্দেই সূফীতত্ত্বের ও সূফী জীবনের যাহেরী ও বাতেনী দিক পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সূফীর মূল

প্রেরণা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষায়, যিকির, ফিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা, কুরআনের গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা, বাস্তব ক্ষেত্রে সূফীসাধনার প্রয়োগ এবং কথা-বার্তায় সূফী ভাবের প্রকাশ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনেই প্রতিফতি হয়েছে। তাঁর তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনগণের জীবনাদর্শে এ ভাবধারা লক্ষ্যণীয়। কাজেই সূফী শব্দের উৎপত্তি যে আসহাবে সূফ্ফা থেকে হয়েছে, তা জোরালোভাবেই বলা যায়। পার্থিব ও লৌকিক জীবনকে অসীম লোকে উন্নীত করার সাধনাকেই সংক্ষেপে আমরা সূফীবাদ বলতে পারি। কুরআন ও হাদীসের যাহেরী ও বাতেনী শিক্ষাই সূফীসাধনার মূল ভিত্তি। কুরআন-হাদীসের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলিমগণের জীবনে বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সুফীতত্ত্বের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। সূফীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইলমে যাহেরীর সঙ্গে ইলমে বাতেনীর সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ সূফী। বস্তুত সূফীবাদের মূল উৎস পবিত্র কুরআন, আর পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন সর্বকালের সর্বদেশের সূফীবাদের শ্রেষ্ঠ মুর্শিদ। আর তাঁর মহান সাহাবা কেরাম এর বাস্তব নমূনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা কেরামের জিন্দেগীর ও বন্দেগীর মাঝে সূফীবাদের বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়, যা থেকে পরবর্তীকালে সূফীবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে। ইসলামে আধ্যাত্মিকতার চর্চা বা সূফীবাদের চর্চা পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূফীদর্শন নিজস্ব স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। কুরআনিক দর্শন থেকেই এর উৎপত্তি। সূফী দর্শন ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা থেকে প্রচলিত হয়েছে। কুরআন কোন নির্দিষ্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের জন্য নয়; বরং কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বজনীন। এতদসত্ত্বেও যদি অন্যান্য দর্শন ও ধর্মের কোন ভালো বিষয় সূফী দর্শনে এসে থাকে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ জ্ঞানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি খুবই উদার। তাই সূফীদর্শনে অন্যকোন দর্শনের, কোন বিষয়ের প্রক্ষেপ হলেও তাতে দোষের কি থাকতে পারে! সত্য-সুন্দর-সঠিক একই বৃন্ত থেকে আগত। কাজেই তাতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় ইসলামের উদার নীতি ইসলামী দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই অনেক দার্শনিক মতবাদ আজ অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সূফীদর্শন বা মুসলিম দর্শন নব উদ্যমে মানুষকে জীবনের উৎকর্ষ সাধনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে শিরোনামের সাথে যথার্থতা বজায় রেখে সর্বমোট ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উপস্থাপন করা হল :

অধ্যায় : এক
গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতা, পদ্ধতি

এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সূফীবাদের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করা কেন প্রয়োজন এবং তার প্রাসঙ্গিকতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণাটির উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে তার ফলাফল কি হবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কি পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে, কোন কোন উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কী কী সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে গবেষণাকর্মটি কোন কাঠামোতে সুসম্পন্ন করা হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় : দুই
গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পর্যালোচনা

এখানে সূফীবাদের উপর লিখিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থাদী, বিখ্যাত বাংলা, ইংরেজীগ্রন্থ এবং জার্নালসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অধ্যায় : তিন
সূফী পরিচিতি, সূফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সূফী তরিকা

এখানে সূফী শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মুসলিম ধর্মবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সকল মতভেদ রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুফী পরিচিতির মধ্যে মুসলিম মনীসীগণ তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার প্রধান কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে। সূফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, সূফীবাদের উৎপত্তি হয়েছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী থেকেই। সূফীবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে কালগত ও গুনগত দিক দিয়ে যে আটটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে তার প্রতিটি ভাগকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের সব শেষে সূফী তরীকার সংজ্ঞা এবং প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত কিছু সূফী তরীকার ও সেই সকল তরীকার সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : চার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সূফীবাদের মূলনীতি, বিশ্বাসগত অবস্থান ও আচার-অনুষ্ঠান

সূফী সাধনায় সাধককে ইনসান-ই-কামিল হতে হলে কতগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই অধ্যায়ে সেই সকল নীতি যেমন- তাওবাহ, তাওয়াক্কুল, পরিবর্জন, সবর, শুকর, তাসলীম, ইখলাস, ইশকে এলাহী, যিকির, কাশফ, সামা, হাল, ফানা, বাকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য তুলে ধারা হয়েছে। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার উপায় হিসাবে সূফী সাধকগণ বেশকিছু বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। সেগুলোর মধ্যে প্রধান কিছু বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- সূফীসাধকগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহপাকের এই রহস্যময় জগত সম্পর্কে জানতে হলে এবং আত্মিক উন্নতিকল্পে পীর মুর্শিদের হাতে হাত রেখে বাইয়াত হওয়াটা অত্যাবশ্যক। এছাড়াও তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা ধরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। সূফীসাধকগণ এটাও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের শাফায়াতে হাশরের ময়দানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে এবং এ সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এখানে আহলে বাইত বা নবী পরিবারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সূফীসাধকগণও কিছু আচার–অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। তাদের পালনকৃত এমন কিছু আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– মীলাদের আয়োজন করা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম বলে সূফীগণ মনে করে থাকেন। শুধু মীলাদের অনুষ্ঠান নয়, মীলাদ শরীফে কিয়াম করাটাও গুরুত্বপূর্ণ ও জায়েয বলে তাঁরা মনে করেন। এ সকল অনুষ্ঠানের বৈধতা প্রমাণের লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে মাজার জিয়ারত এবং মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় : পাঁচ

বাংলাদেশে সুফীবাদ

বাংলাদেশে ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বহিরাগত সূফী দরবেশগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এদেশে বিদেশী সূফীগণের আগমনকালকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে এখানে দেখানো হয়েছে। যেমন-

১। প্রথম পর্যায় : মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল,

২। দ্বিতীয় পর্যায় : মুসলিম বিজয়ের কাল থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের সময়কাল পর্যন্ত এবং

৩। তৃতীয় পর্যায় : ১২৫৮ থেকে পরবর্তীকাল অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় অষ্টদশ শতক পর্যন্ত।

এর প্রতিটি পর্যায়ে কে কখন এদেশে এসেছেন, ইসলাম প্রচারে তাঁদের ভূমিকা এবং যাঁরা এদেশেই ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মাজার কোথায় রয়েছে তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় : ছয়

বিশিষ্ট সূফী সাধকগণের জীবনচরিত

এখানে কয়েকজন বিখ্যাত সূফী সাধকের জীবন বৃত্তান্ত, তাঁদের শিক্ষা, ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান, আকিদা, শরী'আর প্রতি গভীর অনুরাগ, তাঁদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভের প্রকৃতি, তাঁদের বংশধরগণের পরিচয়, রচনাবলি ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

সুপারিশমালা ও উপসংহার

এখানে সূফীবাদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কীভাবে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা যায়, তার কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। উপসংহারে পুরো অভিসন্দর্ভটির একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি নামে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোটকথা, ইসলামে সূফীবাদ, মরমীবাদ ও অধ্যাত্মবাদ হলো ধর্মের মূল চাবিকাঠি যা আউলিয়া-কেরাম বিভিন্ন দেশে প্রচার করেছেন। আউলিয়া কেরামের সুমহান মর্ম বাণী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই গ্রহণ করেন। কুরআন-হাদীসের শুধু জাহিরি বিদ্যার দ্বারা ইসলামের সর্বজনীন

ভাব প্রকাশ পায় না এবং নফসের পরিশুদ্ধি হয় না। ফলে আত্মদর্শনও হয় না। এজন্য গুপ্তবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যারা নিজেকে জানতে চিনতে বুঝতে চায়, ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জানতে চায় এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার প্রেমে মশগুল হতে চায় তাদের জন্য এই গবেষণা কর্ম সহায়ক হবে আশা করি।

অধিকন্তু সূফীবাদের উপর মোটামুটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই এই বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ, সুগভীর ও সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজন অনুভব থেকেই আলোচ্য গবেষণার সূত্রপাত। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে সূফীবাদের অবস্থানের উপর পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পাদিত হয়নি, তাই এক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এবং গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় গবেষকদের সহায়তা দান করবে। এছাড়াও এ গবেষণাটি বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে আত্মশুদ্ধির পন্থা পর্যালোচনায় সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা রয়েছে। সেই সাথে সূফীবাদ বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্র উন্মোচন হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হচ্ছে।

অধ্যায় : এক

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

(Necessity, Retionality, Objective, Methods and Limitation of the Research)

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক ইত্যাদি। এসব দিক মিলিতভাবে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটিত করে তোলে। এ দিকগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ভাগ হলো বস্তুগত আর অভ্যন্তরিণ ভাগ হল আধ্যাত্মিক। বস্তুগত বিষয়গুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো মানুষের মনে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সংক্রান্ত মৌল প্রশ্নের উদ্রেক করে, বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টায় ব্রত হয়। জগৎ জীবন সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনা বা প্রজ্ঞা হলো দর্শন। ইন্দ্রিয়ানুভূতির নির্ভুল ধারণাকে জ্ঞান বলা হয়; অন্তর্দৃষ্টির নির্ভুল বিচার বিশ্লেষণের ভারসাম্যকে বলা হয় প্রজ্ঞা। আদিকাল থেকেই নবী-রাসূল ও প্রজ্ঞানুরাগীগণ জগৎ, জীবন ও অতীন্দ্রিয় বিষয়াদির ব্যাখ্যা, বিচার-বিশ্লেষণ করে আসছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) দীর্ঘদিন হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন ধ্যান ও আরাধনার পর ইসলামের মূল দর্শন ও বিধান পবিত্র কুরআন লাভ করেন। আল-কুরআনের বহু আয়াতে আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন : هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣﴾ "তিনি (আল্লাহ) আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপন।"[১] কুরআনের এসব ভাববাদী আয়াত থেকেই সূফীবাদের উৎপত্তি হয়েছে। পবিত্র কুরআন মানব জাতির শুধু জীবন-বিধান নয়, জীবন-দর্শনও বটে।

---

১. আল-কুরআন, ৫৭ : ৩।

সূফীবাদ হচ্ছে এক ধরণের রহস্যময় আধ্যাত্মিক মতবাদ যা ইসলামের মরমি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। সূফীসাধকগণ ন্যায়-নীতি ও ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে হৃদয়ের গভির অনুভূতি দিয়ে আন্তরিক ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই হলো সূফীবাদের মূলনীতি। পরম সত্তা আল্লাহর সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে পরিতৃপ্তি তা-ই সূফীসাধককে ক্ষনস্থায়ী জাগতিক প্রলোভন এবং আপাত মধুর ইন্দ্রিয় শক্তি হতে মুক্ত করে তাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় স্বার্থক করে তোলে। এদের প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۞ وَ
ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۞

> হে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। অতঃপর আমার সেবকদের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।[২]

আল্লাহ প্রেমই সূফীসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফীগণের আত্মা সর্বদা আল্লাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই সূফীকে আল্লাহর চিন্তা হতে বিরত রাখতে পারে না। একারণে সুফীর সাধনাকে প্রেমধর্মও বলা হয়। সূফীগণ কাশফ বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহকে জানতে পারেন। কাশফ এমন এক প্রকারের অন্তরদৃষ্টি, যার সাহায্যে সূফী, আত্মা, আল্লাহর জাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of the Research)

সূফীবাদ ইসলামের এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামের আগমনের সাথে সূফীবাদেরও আগমন। সূফীবাদ ইসলামের মতই পুরাতন। ইসলাম যেমন পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্ম ও বাণী এবং সাহাবী (রা.), তোবেঈ, তাবেতাবেঈন (র.) ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের প্রচেষ্টায় সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। তেমনি সূফীবাদ ও পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর কর্ম ও বাণী, সাহাবী (রা.), তাবেঈ, তাবেতাবেঈন

---

২. আল-কুরআন, *৮৯ :* ২৭-৩০।

(রা.) এবং বিভিন্ন সূফীর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। সূফী অভিজ্ঞতার জটিলতা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেকেই এর স্বাধীন আলোচনা এড়িয়ে যেতে চান। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে। এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমপ্রত্যয়গত জ্ঞান নয় বরং অনুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞাপ্রসুত জ্ঞান। এ জ্ঞান ব্যক্তি মানুষ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। ইসলাম একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপরদিকে মানুষে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন করে। তাই ইসলামের জীবন ধারাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জাহেরী ও বাতেনী এই দুই দিকের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا "আমি তোমাদের জন্য একটি বিধি বা জীবন ব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৩]

সূফীবাদ অনুসারে, আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটে থাকে। মানবহৃদয় আল্লাহর সিংহাসন; সুতরাং কু-চিন্তা, কু-মনন, কু-ইচ্ছা থেকে মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۙ﴿۹﴾ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ﴿۱۰﴾ "যে ব্যক্তি আত্মা শুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে; আর যে একে কলুষিত করেছে, সে অকৃতকার্য হয়েছে।"[৪] তাই হৃদয়কে পবিত্র করা সূফী সাধনার প্রধান অঙ্গ। আত্মিক উন্নতি ও হৃদয় পবিত্রকরণের মাধ্যমে সূফী সাধক আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হন। ধর্মের নিরস রীতিনীতির মধ্যে প্রেমের অমৃতধারা প্রবাহিত করে আল্লাহ ও মানুষকে এক অপূর্ব বন্ধনে আবদ্ধ করাই সূফী দর্শনের কাজ।

৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮।

৪. আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০।

সূফীবাদের মুল কথাই হলো আল্লাহ, যিনি একমাত্র পরম সত্তা। এই জগত এক পরম সুন্দরের প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ থেকে নি:সৃত হয়েছে। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছে। আত্মা অন্ধকারময় দেহকে আলোকিত করে। রূহ ব্যতীত আর একটি শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাহলো নফস। রূহের আকর্ষণ আল্লাহর দিকে আর নফসের আকর্ষণ পার্থিব জগতের দিকে। মানুষ এই দ্বিবিধ শক্তির মোকাবেলার কেন্দ্র। সূফীবাদ আত্মিক বিবর্তনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এখানে আত্মিক বিবর্তন বলতে নফসের ক্রমবিবর্তন বোঝানো হয়েছে। রূহ ঐশী শক্তি খোদার আদেশ, এর কোন পরিবর্তন নেই।

জড় জগতের জ্ঞান আহরনের জন্য যেমন দেহের ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়, তদ্রুপ অন্তর জগতের জ্ঞান আহরনের জন্য আত্মিক ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করতে হয়। আত্মিক ইন্দ্রিয় ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আহরন করা সম্ভব নয়। আর সেজন্য আত্মাকে সচল ও কার্যকর করার একমাত্র উপায় হলো সূফীবাদের সাধনা। সূফীবাদ মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আত্মিক পঞ্চইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তোলে। ফলে মানুষ ‘ইলমুল ক্বালবের’ অনুসারী হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে সমস্ত সৃষ্টিরাজির মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রথম সারির সাহাবীগণ প্রত্যেকেই সুফীবাদের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে তা’লীম দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, শরী’আত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরন সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা, আর সূফীবাদ হচ্ছে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আদর্শ চরিত্রবান হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আত্মিক উপায়। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো সুফীবাদ। এর উপর ভিত্তি করেই শাশ্বত চিরশান্তির ধর্ম ইসলামী জীবন বিধান বিরচিত। তাই সঙ্গত কারণে বর্তমান বিশ্বের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় রোধে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করা অতীব প্রয়োজন।

গবেষণার যৌক্তিকতা (Retionality of the Research)

মানুষের চিন্তার ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, মানুষের পরম সত্তাকে জানার আকাঙ্খা চিরনূতন। এই জানার পথে কোন বিরতি নেই। তাই যুগে যুগে মানুষ আপনার অন্তরের অন্তস্তলে আপনার পরম প্রিয়জনকে, শ্রেয় ও প্রেয়কে খুঁজে বের করেছে এবং তার সাথে অন্তরের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পরম সত্তাকে জানার এই প্রয়াস দর্শনের ইতিহাসে মরমিবাদ নামে অভিহিত। ইসলামের দুইটি দিক রয়েছে। একটি তার বাহ্যিক দিক, অন্যটি তার অভ্যন্তরীণ দিক। বাহ্যিক দিকটি হল শরীয়ত আর অভ্যন্তরীণ দিকটি হল তরীকত। শরীরের সাথে রূহের যে সম্পর্ক, শরীয়তের সাথে তরীকতের সেই সম্পর্ক। মানব জীবনে উভয়ই আবশ্যক। রূহের উন্নতির জন্য তরীকত আবশ্যক। যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝতে চায়, যে খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করতে চায়, যে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করতে চায়, যে ইহলোকে পরলোকের স্বাধ গ্রহন করতে চায়, যে ইবাদতে তন্ময়তা লাভ করতে চায়, তার জন্য তরীকত অপরিহার্য। শরী'আতের অভ্যন্তর জুড়েই রয়েছে সূফীবাদের শিক্ষা। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের উপর ভিত্তি করে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকেই শরী'আত বলা হয়। আর ইসলামের বাতেনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচয় সূফীবাদ, যার মূলে রয়েছে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হলেন সূফীসাধকগণ।

আল্লাহ মানুষের জন্য একদিকে যেমন শরী'আতের বিধান দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন মারিফাতের বিশেষ পন্থা তথা সূফীবাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا "আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি একটি শরী'আত ও একটি বিশেষ পন্থা (মিনহাজ)।"[৫] 'মিনহাজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ সরল পথ বা সোজা রাস্তা। এই 'মিনহাজ' দ্বারা মূলত সূফীবাদ বা আধ্যাত্মবাদ শিক্ষার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। শরী'আতের বিধান দেওয়া হয়েছে মানুষের যাহেরী কার্যাবলী সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য। আর বিশেষ পন্থা তথা সূফীবাদ দেওয়া হয়েছে মানুষের বাতেনী দিক তথা আত্মাকে পবিত্র

---

৫. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮।

করার জন্য। মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পবিত্র কুরআনে যাহিরী বিষয়াদির বর্ণনা যেমন রয়েছে, তন্দ্রুপ বাতিনী বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ- "তিনিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত 'মুহকাম' এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ' যা রূপক।"[৬] কাজেই পবিত্র কুরআন শরী'আত ও মারিফাতে পরিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "কুরআন সাত লোগাতে অবতীর্ণ এবং প্রতিটি আয়াতের যাহিরী ও বাতিনী অর্থ আছে।"[৭]

সূফী সাধকগণ অন্তরের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনকে কলুষমুক্ত করে সুন্দর মনোরম করে গড়ে তুলতে ইসলামী জীবন ধারায় আত্মশুদ্ধির এ সাধনা সন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পথ ধরেই সূফীগণ তাঁদের যাহেরী ও বাতিনী উভয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে অগ্রসর হন। রাসুলুল্লাহ (স.) এর তরীকা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করে ইসলামের যাহিরী ও বাতিনি দিকের প্রেমপূর্ণ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম যাতের পূর্ণজ্ঞান অর্জন ও আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ নৈকট্য লাভজনিত রহস্যময় উপলব্ধি সূফীগণের মূল লক্ষ্য।

মূলত সূফীবাদের বীজ ইসলামের সূত্রপাতের সাথেই রোপিত হয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত "আমি রাসূলে কারীম (স.) হতে দু'টি জ্ঞানের পাত্র সংগ্রহ করেছি। একটি আমি প্রকাশ করেছি, অপরটি প্রকাশ করলে আমার গলা কাটা যাবে।"[৮] এ হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবাদেরকে ইলমুল মারেফাত সম্পর্কে অবগত করেছেন। সূফীবাদ আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারার লক্ষ্য হল আল্লাহর গুঢ়

---

৬. আল-কুরআন, ৩ : ৭।

৭. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল খাতীব আত্তিবরিযি, *মিশকাত আল মাসাবীহ* (দিল্লী: কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৯৫৬), পৃ. ৩৫।

৮. আবু আবদুল্লাহ মুহামম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (র.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, বুখারী শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ১২৭।

অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন সাধনই সূফীবাদের মূল কথা। সুতরাং ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এ গবেষণার ফলে মানব জীবণের বাহ্যিক দিকের ন্যায় অভ্যন্তরীণ তথা আধ্যাত্মিক বিষয়ও সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Research)

গবেষণাকার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ :

১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুফীবাদের অবস্থান নির্ণয় করা।

২. ইসলামের এক অন্যতম শিক্ষা হল সূফীবাদ। এর গবেষণার পরিধি বা ব্যাপকতা কতখানি এবং এর সীমাবদ্ধতা কতটুকু তা নির্ণয় করা।

৩. সূফীবাদ বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্র উন্মোচন করা।

৪. জনসাধারণের নিকট সূফীবাদকে তুলে ধারা।

৫. মানব জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করা।

৬. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে ও আত্মশুদ্ধির পন্থা পর্যালোচনায় সহায়তা করা।

৭. ইসলামের সূফীতত্ত্বের একটি সর্বাত্মক রূপসহ তার তথ্যবহুল একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরাই এ গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি (Method of the Research)

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য নিন্মোক্ত পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে :

১. গবেষণা কর্মটি বিশ্লেষনাত্মক ও বর্ণনামূলক।

২. প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. সংগৃহীত তথ্যের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বীকৃত মানসম্পন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লেখকের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

৫. বিক্ষিপ্ত বিষয় সমূহকে একত্রিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. তথ্য-উপাত্ত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে যৌক্তিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণায় গৃহীত উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ (Metrials and Sources of the Data Collection of the Research)

গবেষণাকর্মটিতে যে সকল প্রাসঙ্গিক উপকরণ ও উৎসসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল:

১. পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থসমূহ।

২. সিহাহ সিত্তাহ ও মিশকাত শরীফসহ হাদীসের অন্যান্য মূল গ্রন্থাদী।

৩. সূফীবাদের উপর রচিত গ্রন্থাবলী।

৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল ও বিভিন্ন সাময়িকী।

৫. সূফীবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অনলাইন রিসার্চ সেন্টার।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research)

সূফীবাদ একটি ব্যাপক বিষয়। ফলে এর সকল দিক নিয়ে আলোচনা করার বিষয়টি সময় ও জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু সম্ভবপর নয়। তাছাড়া সূফীদের কর্মকাণ্ড মূলত ব্যবহারিক বিষয়, এটা গ্রন্থ নির্ভর না হওয়ার দরুন অধিকাংশ সূফীগণ তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন কিন্তু বই লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবুও অল্প বিস্তর যে সকল মূল বই পাওয়া যায় সেগুলোর সিংহভাগই বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়নি। যার ফলে গ্রহনযোগ্য বই পেতে সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে উঠেছে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের সমন্বয়ে। আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাই ইসলামি আইন-কানুনের বিরাট একটি অংশ আমাকে বাদ দিয়েই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। তাই শুধু কুরআন ও হাদীস থেকে তথ্য পেতে আমাকে যেমন সমস্যার সম্মুখি হতে হয়েছে, তেমনি সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করাও সম্ভব হয়নি।

গবেষণা কাঠামো (Structure of the Research)

গবেষণাকর্মটি বাংলাভাষায় সম্পন্ন হয়েছে। যা ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও অভিসন্দর্ভটির একটি ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্তির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়েছে।

অধ্যায় : দুই

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পর্যালোচনা

(Review of the Books Related with the Research)

সূফীবাদ ইসলাম ধর্মের মরমিবাদ। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিকাশে সূফীবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সূফী সাধকগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে বিভিন্নভাবে পৃথিবী জুড়েই মানুষকে সৃষ্টির রহস্য ও সৃষ্টিকর্তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য চষে বেড়িয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা পৃথিবীতে ইসলামের অন্যতম মূল লক্ষ্য মানবতাবাদের বিকাশ ও প্রচার ঘটেছে।

সূফী সাধনা ইসলামী শরীয়তের বাইরে কিছু নয়। কুরআন ও হাদিসের যাহেরী ও বাতেনী শিক্ষাই সূফী সাধনার মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদিসের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সূফীতত্ত্বের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। শরীয়ত মূলত কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর আদেশ-নিষেধের নিয়মের নাম। যা ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত করে আর সেই কাজকে সৎ ইচ্ছা ও পূর্ণ নিষ্ঠার অলংকারে সজ্জিত করে শরীয়তের অনুসরণকে ইহসানের স্তরে উন্নীত করার নামই সূফীবাদ।

আধুনিককালে বিভিন্ন গবেষণা সম্পাদনে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন একই গবেষণার পুনরাবৃত্তিরোধ সম্ভব হয়, তেমনি গবেষক স্বীয় গবেষণা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভে সক্ষম হন।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পর্যালোচনার সাধারণ লক্ষ্য হলো পূর্বের প্রাসঙ্গিক কর্ম সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মাধ্যমে গবেষণার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করা। নিম্নে এই প্রস্তাবনার সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু গবেষণা তুলে ধরা হলো।

মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা (২০০৮)[৯] নামক গ্রন্থে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি, সূফী পরিচিতি, সূফীবাদের বিকাশকাল, সূফী মতবাদের উপর বিভ্রান্তির কারণ, সূফী সাধনার নামে ভণ্ডামী ইত্যাদি বিষয়গুলো সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে মাওলানা রুমীর দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে সূফীবাদের বিভিন্ন তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সূফী সাধনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শরীয়ত ও তরীকত যে পরস্পর আলাদা নয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। শরীয়ত ও তরীকত যে একে অন্যের বিরোধী নয় বরং সহায়ক তা প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মনীষীদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এখানে সূফীদের বাইয়াত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণাদিও উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির সব শেষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সমাহিত পীর দরবেশেদের মাযারসমূহের তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন (২০১১)[১০] নামক গ্রন্থে তাসাউফের উৎস, সংজ্ঞা, সূফীদর্শন নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য তুলে ধরা হয়েছে। অনেকে মনে করে ইসলাম যেহেতু সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য মরমী দর্শন ইসলামের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে সেহেতু অন্যান্য মরমী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে সূফী দর্শন জন্মলাভ করেছে এবং এর কোন মৌলিকতা নেই। কিন্তু গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, সূফীদর্শন নিজস্ব স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। কোন ধর্ম বা দর্শন বা মতবাদের অনুকরণে সূফী দর্শন প্রচলিত হয়নি। কুরআনিক দর্শন থেকেই এর উৎপত্তি এবং ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা থেকে এটি প্রচলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সূফীবাদের ক্রমবিকাশ এবং খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির জীবনী ও চিশতিয়া তরিকার বিধি-বিধান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার এখানে সূফী সাধকগণের খানকা শরিফের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আগে

---

৯. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা* (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৮)।

১০. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন* (ঢাকা: সদর প্রকাশনী, ২০১১)।

রাজা-বাদশাগণ সূফী দরবেশদের জীর্ণশীর্ণ খানকায় গিয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। আর এখন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি ও রাজনীতিবিদগণ কোন শায়েখের খানকায় গেলে শায়েখ নিজেকে ধন্য মনে করেন। সূফী দর্শন বা এর শায়েখগণ বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ। শায়েখগণ তাদের মুরিদের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে Vote Bank হিসাবে বিবেচিত। এখানে লেখক সূফীগণের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি।

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, ড. এ.কে.এম. রিয়াজুল হাসান এবং জালাল উদ্দীন, সূফী দর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গে (২০১৩)[১১] গ্রন্থটিতে সূফীবাদ সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সূফী তরিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখক তুরস্কে বিদ্যমান ইসলামী সুফী সম্প্রদায়গুলোর মাঝে আলোচিত একটি সূফী তরিকা হেলভেতি বা খালওয়াতি তরিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খালওয়াতিদের কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি অনুরক্ত মনোভাব বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। মূলত এ তরিকার সূফীগণ নির্জনতা বা একাকী অবস্থান করতে বেশী পছন্দ করেন। এরা সুন্নি সম্প্রদায়ের সকল নিয়ম নীতি মেনে চলেন। বর্তমানে এই তরিকার বহু শাখা নিউইয়র্ক, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ইংল্যাণ্ড, কানাডা, চিলি, জার্মানী, বসনিয়া, ব্রাজিল, স্পেন প্রভৃতি দেশের বহুস্থানে দেখা যায়। বেক্তাশীনামক আর একটি সূফী তরিকা সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বেক্তাশীদের উদ্ভব ঘটে মধ্য এশিয়ায়, পরে তারা বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে তুরস্ক, আলবেনিয়া, আমেরিকাতে এই তরিকা দেখা যায়। ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়টি হল শিয়া। শিয়া গ্রন্থাসমূহ অবলম্বন করে যেসব মতবাদ বা তরিকার জন্ম হয়েছে তন্মধ্যে বেক্তাশী তরিকা অন্যতম। বেক্তাশীরা তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের জাহেরী অর্থের চেয়ে বাতেনী অর্থকে বেশি প্রাধান্য দেন। তারা মনে করেন, এ সকল বাতেনী বা গূঢ় আয়াতের মাধ্যমে বিশ্বজগত ও

---

১১. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাখ প্রমুখ, *সুফি দর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গে* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩)।

মানবাত্মাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে বিশ্বের বিভিন্ন তরিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত তরিকা বা তাদের কাজ সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি।

লাভলী আক্তার ডলি, বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা (২০০১)[১২] গ্রন্থে সূফীদর্শনের স্বরূপ ও এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার সূফীবাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, সংসার ও জীবনের কঠোর বাস্তবতার ভেতরে থেকে আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চ মার্গে পৌছানোই এর উদ্দেশ্য। এখানে সুফীদর্শনের মূলনীতি যেমন আত্মসমর্পণ, যিকির, কাশফ্, সামা, হাল, ফানা, বাকা সম্পর্কে এবং সূফীর জীবনে মূলনীতি সমূহের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সূফীদের চলার পথের পাঁচটি মঞ্জিল শরীয়ত, তরিক, মারিফত, হাকীকত ও ওয়াহদানিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা অতিক্রম করার পর আল্লাহকে লাভ করা সম্ভব। এর যে কোন একটিকে পরিত্যাগ করলে মঞ্জিলে মকসুদ বা লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থে বাংলাদেশে সূফীবাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার মনে করেন মূল সূফীতত্ত্ব থেকে বাংলার সূফীদর্শণ অনেকটা আলাদা। তবে সেটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্ণ নতুন কোন তত্ত্ব বা দর্শণও নয়। তার মতে এই বিষয়টি বুঝতে হলে সূফীতত্ত্বের আদি চরিত্র সম্পর্কেও অবগত হওয়া দরকার। আর সে দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে মূল সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন এবং তারপরে বাংলাদেশে সূফীদর্শণের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালী জাতির ভাব-প্রবণতার অন্যতম বাহন হচ্ছে সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের ভিতরে সুফী ভাবধারার ব্যাপক ও গভীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আর সে কারণেই হয়তো গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব নামে আলাদা একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

---

১২. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: সাফা পাকলিকেশন, ২০০১)।

ড. ফকীর আবদুর রশীদ, সূফী দর্শন (২০০০)[১৩] গ্রন্থে এলমে তাসাউফ সম্পর্কে গভীর, ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করে লেখক বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর অন্যান্য মরমী দর্শনের সাথে এর সম্পর্ক ও পার্থক্য পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। এমনকি অতিশুদ্ধাচারী দল ও মাযহাব সমূহের সাথেও সূফীদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করেছেন। অনেকে বাউল ও সূফী-তত্ত্বকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে বাউল ও সূফী ভিন্ন আদর্শের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। সূফীতত্ত্বের দুই বিখ্যাত প্রতিদ্বন্ধী মত ওয়াহদাতুল ওজুদ ও ওয়াহ্দাতুশ শহুদের মধ্যকার দ্বন্ধ নিরসনের চেস্টা করেছেন তার এই গ্রন্থে। তিনি বলেন এই দুটি মতই অনুভূতির দুটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তর। বাহ্যতঃ এ দুই স্তরের মধ্যে একটা বিরোধ ও প্রতিদ্বন্ধিতা প্রতীয়মান হলেও মূলত এরা একই অভিজ্ঞতার দুটি স্তর, স্থান ও কাল ভেদে একই অনুভূতির দুইটি বিশিষ্ট নাম। গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে সূফী দর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ বিশ্বকে প্রকৃত শান্তি, সৌহার্দ, সাম্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারে একমাত্র সূফী দর্শন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ৩১৩টি সূফী তরিকার বিশাল ভান্ডার নিয়ে আলোচনা করেছেন। সূফী তরিকা সম্পর্কে গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থ দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে।

ড. তাহের আল-কাদেরী, তাসাউফের আসল রূপ (২০১২)[১৪] গ্রন্থটিকেগ্রন্থকার দুটি পরিচ্ছেদ ও ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তিনি পরিচ্ছেদ দুটিতে ইসলামি সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ইসলাম ধর্মের দু'টি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক এখানে ইসলাম ধর্মের দু'টি দিক বলতে বুঝিয়েছেন- প্রথমত উচ্চ মানসম্পন্ন দ্বীন যা বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। দ্বিতীয়ত দ্বীনের রীতিনীতি যা শরী'আত ও তরীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষাকে বুঝায়। এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে তাসাউফের অর্থ ও ভাষ্য সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাসাউফের পরিভাষার

---

১৩. ড. ফকির আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ২০০০)।

১৪. ড. তাহের আল কাদেরী, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ অনূদীত, *তাসাউফের আসল রূপ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২)।

পটভূমি ও তার প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাসাউফ এবং সূফীতাত্ত্বিক পরিভাষাসমূহের সূচনা এবং উৎপত্তি, সর্বোপরি সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এর ব্যাপক প্রচলনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে তাসাউফ শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাসাউফ অধ্যয়ন, আয়ত্ব করা ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং কেন তা জরুরী সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমল ও আখলাক এবং তাসাউফ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের মূলকথা হলো, যখন মানুষ আত্মশুদ্ধির সমূহ মঞ্জিল অতিক্রম করে অনুভূতির ভালোকে বিজয়ী এবং খারাপিকে বিজিত করে নেয়, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তাকে সাধারণ মানুষের মতো মনে হয়, তবে তার অন্তর, ব্যক্তিত্ব, তার যমীন ও আসমান তথা তার জন্য পৃথিবী আরেক পৃথিবী হয়ে যায়। তার মূল তাৎপর্য সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভিন্ন, অনেক উচু ও বহুগুনে মর্যাদাশীল হয়ে যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে তাসাউফ অধ্যয়নের আকীদাগত ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাসাউফ : মৌলিক লক্ষ্যের আলোকে এই শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে তাসাউফের ছয়টি মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার তিনটি উদ্দেশ্য কর্মের সঙ্গে এবং তিনটি অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্মের সাথে সম্পর্কিত তিনটি উদ্দেশ্য হলো– আত্মশুদ্ধি, কলবের পরিশুদ্ধি এবং সত্যের আনুগত্য। অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর মুহাব্বত, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়। এই ছয়টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে তবে বোধগম্য করে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, সূফীবাদ (২০০৪)[১৫] গ্রন্থে গ্রন্থকার আল্লাহর সঙ্গে সূফীগণের মিলিত হওয়ার সুতীব্র আকাঙ্খা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন আল্লাহ প্রেমই সূফী সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ কারণে সূফীর সাধনাকে প্রেমধর্মও বলা হয়। এই গ্রন্থে জগৎ শ্রেষ্ঠ সূফীগণের কথা এবং সূফীবাদ ও তার বিভিন্ন দিকের কথা

১৫. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সুফীবাদ* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৪)।

আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহকে উপলব্ধি করার জন্য সূফীসাধকগণের কিছু মোকাম বা স্তর অতিক্রম করতে হয় এই গ্রন্থে সেই স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির ইহিবৃত্ত সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। মানবদেহে ক্বলব, নফস ও রূহের অবস্থান এবং নফস ও রূহের প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থে আহলে বায়াতের মর্যাদা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মোহাম্মদ (স.) ও আহম্মদ (স.) মোবারক নামদ্বয়ের রহস্য এবং দীদার-ই-ইলাহী অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিষরে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

মোহাম্মদ তফিজ উদ্দিন কাদেরী, সুফীবাদ ও আত্মদর্শন (২০১৩)[১৬] নামক গবেষনা গ্রন্থে গ্রন্থকার ইলম এবং আলেমের পরিচয় এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন, জ্ঞানীরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেম রহস্য বুঝতে পারে এবং অতিন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করতে পারে। জ্ঞানের মধ্যেই আত্মর (রূহ) তৃপ্তি নিহিত। তিনি আলেমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, যিনি জাহিরি ও বাতিনি উভয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সে মতে আমল করে তিনিই প্রকৃত আলেম। গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে ইলম ও আলেমের পরিচয় এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুন্দর, সাবলিল এবং সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মের জাহিরি (শরিয়ত) এবং বাতিনি (তরিকত) সম্পর্কে তিনটি পার্টে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য জাহিরি ও বাতিন দুই ধরনের জ্ঞানই থাকতে হবে। এই দুই ধরনের জ্ঞান কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর আহলে বাইত সম্পর্কে হাস্য কৌতুক, রঙ্গ-তামাসাকারির শাস্তি সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও এই গ্রন্থে নামাজ, রোজা, কোরবানী এর জাহিরী ও বাতিতি নিদর্শন, ওজুর হাকিকত, পরকালের পুনরুত্থান, পরকালে নাজাতের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা নিজেকে জানতে, চিনতে ও বুঝতে চায়,

---

১৬. মোহাম্মদ তফিজ উদ্দিন কাদেরী, সুফিবাদ ও আত্মদর্শন (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৩)।

ইসলামের মর্মবাণী বুঝে সেই অনুযায়ী আমল করতে চায় এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার প্রেমে মশগুল হতে চায় তাদের জন্য এই গ্রন্থ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আলহাজ্জ খান বাহাদুর আহছানউল্লা সুফী (২০১১)[১৭] গ্রন্থটিতে আল্লাহর মহব্বতের শক্তিতে একজন সূফী কিভাবে পরমার্থ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন সেই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, ইর্ষা, অহংকার সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশাসিত হয় এবং কিভাবে একজন সংসারী মানুষ সংসার হতে অনাসক্ত হয়ে মছিবত ও বিপদের মধ্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করে মঙ্গলময়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন গ্রন্থকার। এছাড়াও কিভাবে ইবাদতের সাহায্যে আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে এবং স্বীয় অস্তিত্বের স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে তন্ময়তা হাছিল করতে পারে সে সম্পর্কে এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, সুফীতত্ত্বের ইতিকথা (২০১৩)[১৮] গবেষণা গ্রন্থে গ্রন্থকার সূফী সাধনা কি ও কেন এবং তার অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগে ভারতে সূফী মতবাদ ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে পারস্পারিক যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, সূফীগণ তাঁদের সাম্য-মৈত্রী-প্রেমের মহান বাণী প্রচার করে এবং নিজেদের পূতঃপবিত্র চরিত্র মাহাত্যের বলে মধ্যযুগে ভারতে ঘৃন্য জাতিভেদ ও বিবিধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। গ্রন্থাগার তার চতুর্থ অধ্যায়ে চিশতীয়া ও নিযামিয়া সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত সূফী সাধকগণের কথা এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সূফী ও সুলতানদের সহযোগিতা বাংলাদেশে যেরূপ দেখা গিয়েছিল এমন আর কোথাও দেখা যায়নি। যে সময় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে তদানীন্তন বাংলায় এক উন্নত জীবনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল। ইসলাম ও সূফীতত্ত্বে ইমাম গায্যালীর অবদান এবং সূফী দর্শনে তার চিন্তাধারার বহি:প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। তিনি শরিয়তপন্থী ও মারেফাতে বিশ্বাসী

---

১৭. আলহাজ্জ খান বাহাদুর আহছানউল্লা, *ছুফী* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১১)এ

১৮. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *সূফীতত্ত্বের ইতিকথা* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৩)।

ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান করেন। গ্রন্থকার তার এই গবেষণা গ্রন্থে সূফী চিন্তাবিদ হিসেবে ইমাম গাযালী, রুমী, ইবনুল আরাবী সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য পেশ করেছেন। ইবনুল আরাবীর সূফী দর্শনের অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন এবং রুমীর সূফী দর্শন দ্বারা তার সমাধান দান করেছেন। সূফীবাদ সম্পর্কে খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মতবাদ, আল্লামা ইকবালের ধর্ম দর্শন এসং সূফীবাদে লাল-গীতির অবস্থান তুলে ধরেছেন তার গ্রন্থে।

মাওলানা জুলফিকার আহম্মদ নকশবন্দী, মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত, মারেফাতের ভেদতত্ত্ব (২০১৪)[১৯] আলোচ্য গ্রন্থে কাদেরকের সূফী বলা হয়, সূফী শব্দের বিকাশ এবং সূফী শিরোনামের উপর বিখ্যাত কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে বায়াত হওয়া কতটা যৌক্তিক তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আত্মসংশোধনের জন্য মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে এবং এর দলীল হিসাবে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে খানকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে যিকির, দরূদ পাঠ, ইস্তেগফার করা, কুরআন তেলওয়াত, শায়েখের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের ফাজায়েল, শর্ত, আদবসমূহ এবং বন্ধু কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার তার এই গ্রন্থের একদম শেষ অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তাসাউফ প্রেমিদের জন্য এই গ্রন্থটি মনের খোরাক যোগাতে পারবে বলে আমি মনে করি।

মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, মাওলানা মুতীউর রহমান অনূদিত, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষন (১৪২৫ হি.)[২০] গ্রন্থটি মুলত দুইটি বইয়ের

১৯. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত, *মারেফাতের ভেদতত্ত্ব* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪)।

২০. মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, মাওলানা মুতীউর রহমান অনূদিত, *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৫ হিজরী)।

সমষ্টি একটি তাসাউফের মূলতত্ত্ব অন্যটি তাসাউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা। প্রথম গ্রন্থটিতে চরমপন্থা ও শিথিল পন্থার মোকাবেলায় কুরআন, হাদিসের দৃষ্টিতে তাসাউফের সঠিক শরয়ী হাকীকত, সিলসিলা, যিকির ও ওযীফা ইত্যাদির হাকীকত এবং অন্যান্য পরিভাষাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাসাউফের উপর বেশকিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর কিছু মূল্যবান বাণী এই গ্রন্থের শেষাংশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে পীর মুরীদীর ব্যাপারে শিথিলতা, পীর মুরীদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ, এদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, এদের নেপথ্যে ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতা, শিরকের প্রকারভেদ এবং সমসাময়িক কয়েকজন পীর সাহেব– এই কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের উপর দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনায় কুরআন ও হাদিসের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। তাফসীর ও ব্যাখ্যা স্বরূপ মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামের বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ (২০১৬)[২১] গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমে গ্রন্থকার সংক্ষেপে সূফীদের পরিচয়, রিসালাহ প্রণয়নের কারণ তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি সূফীদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস তুলে ধরেছেন, যা মূলত: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'র আকিদা। মুতাজিলা, কাদরিয়া, খারেজি প্রভৃতি দলের সাথে ইসলামের মূল স্রোতের বিবাদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূফীদের অবস্থান এখানে স্থান পেয়েছে। যেমন তাওহিদের প্রকৃত স্বরূপ, মহান আল্লাহর যাত-সিফাত ও তাঁর অবস্থান, কুরআনের নিত্যতা, ইমান ও কুফরের স্বরূপ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কর্মের স্বরূপ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮৩ জন বিখ্যাত সূফী শায়খের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, তাঁদের শিক্ষা, আকিদা, উপদেশ, শরিয়াহ'র প্রতি গভীর অনুরাগ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। সূফীদের বর্ণনা

---

২১. ইমাম আবুল কাশিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যহ* (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১৬)।

শুরু হয়েছে ইবরাহিম ইবন আদহাম (র.) এর মাধ্যমে, যিনি ইমাম কুশায়রীর জন্মের মাত্র ছয় বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে সুফী সমাজে প্রচলিত মোট ২৮টি দুর্বোধ্য পরিভাষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশেষত সূফীদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অবস্থান (আহওয়াল) ও আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়ের আহওয়াল এবং মাকামাতের আলোচনা রিসালাহকে তাসাউফের মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সুফীদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা (মাকাম) ও অবস্থান (হাল) আলোচিত হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষানবিশ সূফীদের প্রতি ইমাম কুশায়রীর উপদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীকরনে এই বইটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান, শরফুল ইন্সান (২০১২)[২২] গ্রন্থে গ্রন্থকার আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার প্রতিটি পদক্ষেপে যে পীরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি পদক্ষেপ অগ্রসর হওয়ার জন্য পীর কি ধরনের সাহায্য করেন সে বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। মানুষ কি করে শ্রেষ্ঠ জীবের নাম ধারণের উপযুক্ত হতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এখানে খোদা প্রাপ্তির জন্য কি কি আবশ্যক এবং কোন ধরনের সাধনা করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শরিয়তপন্থীরা বলেন শরিয়তের মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব, তারা তরিকতকে অস্বীকর করে। তরিকতের বিরুদ্ধেবাদীদের প্রমান সহকারে তরিকতের প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব (২০০৬)[২৩] গ্রন্থটিতে বিশ্ববিখ্যাত মুসলমান ভাবধারা সুফী মতবাদের বঙ্গ সম্পর্কিত একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি বঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা পরিবর্তনের মূলে সূফী প্রভাবই প্রধান বলে মনে করেন। তার মতে মূল সূফী মতবাদের সাথে বঙ্গীয় সূফীদের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্দ। এখানে

২২. খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান, শরফুল ইন্সান (ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০১২)।

২৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬)।

সূফী মতবাদের উদ্ভব ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে সূফী মতবাদ এবং এর প্রসার নিয়েও এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীকে ভারতের সুফী প্রভাবের প্রাথমিক যুগ বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সেই প্রভাব স্রোতের মত বইতে থাকে। এ সময় ভারতে যে সকল সূফী আগমন করেছিলেন তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার তার গ্রন্থে বলেছেন যে, বঙ্গীয় সূফীমত উত্তর ভারতীয় সুফী মতবাদের একটি শাখা এবং এরাই বাংলায় সুফী প্রভাবের মূল উৎস। এখানে বাংলায় আগমনকৃত বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলায় আগত বেশ কিছু সূফীর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। যারা বাংলায় ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গে সূফীদের আগমনের ফলে সমাজে এবং মানুষের মধ্যে কি কি প্রভাব পড়েছিল তা তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার তার গ্রন্থে বাউলদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে বাউল শব্দের উৎপত্তি, বাউল কারা, এদের প্রকারভেদ, বাউল গান চেনার উপায়, এদের গানকে 'দেহতত্ত্ব' বলা হয় কেন, বাউলদের উপর সূফীদের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গে লৌকিক ইসলামের উদ্ভব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। লৌকিক ইসলাম কি, বঙ্গে লৌকিক ইসলাম উদ্ভবের কারণ, এবং এর প্রভাব, পীর-মুরীদী প্রথা পাঁচপীর ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

জালাল উদ্দীন খন্দকার, দীদারে এলাহী (২০১৩)[২৪] গ্রন্থে গ্রন্থকার আল্লাহতত্ত্ব জ্ঞান, পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও আধ্যাত্মিক আলোচনার ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক। এটা মানবদেহ হতে শুরু করে জান্নাত জাহান্নাম, ইহ-পরলোক সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সম্পর্কিত। তথাপি তিনি এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি রিয়াযতের (আধ্যাত্মিক শ্রমের) দ্বারা কিভাবে অন্তর্দ্বার উন্মুক্ত করে সুক্ষ্মজগতের (পরলোকের) বিশ্বয়কর ঘটনা ও রহস্যময় বিষয়বস্তু দর্শন করা সম্ভব সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ইবাদত, বন্দেগীর ও সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা এবং

২৪. জালাল উদ্দীন খন্দকার, *দীদারে এলাহী* (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৩)।

পরলৌকিক সুখ, শান্তি অর্জন করা যায়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহকে ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্রমনে তন্ময় হয়ে স্মরণ করতে সমর্থ হলেই পরম সৌভাগ্য (চিরসুখ) শান্তির অধিকারী হওয়ার আশা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নিজ গুনে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভিতর আল্লাহ নিজ তরফ হতে 'রুহ' ফুৎকার করে দিয়েছেন বলে মানুষ নিজ আত্মায় আল্লাহকে স্মরণের দ্বারা ঐশীগুন প্রতিফলনে সম্পূর্ণ সমর্থ। এ ঐশীগুনে আত্মা গুনান্বিত হতে পারলেই নিজ কর্মদোষ হতে উদ্ভূত আত্মার কলুষ দূরীভূত হয়ে আত্মা স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে উঠে। এই নির্মল আত্মাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আত্মাকে নির্মল ও স্বচ্ছ করতে হলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারি হতে হয়। আর এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য উস্তাদ (পীরের) প্রয়োজন। পীর ব্যতীত এ শিক্ষালাভ সম্ভব হয়। এটা বাতেনী শিক্ষা। এর শিক্ষা ও এর পদ্ধতি পীরে কামেল (সৎগুরু) ওয়াকেবহাল। তাই পীরের নিকট হতে নিয়ম কানুন জ্ঞাত হয়ে রিয়াযতের (আধ্যাত্মিক শ্রমের) দ্বারা এ শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করতে হয়। এটা তরিকতে ও মারেফতের এলমে সিনা, যা গোপনে সিনায় সিনায় চলে আসছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময় হতেই অলি আওলিয়াগণের মাধ্যমে এ বিদ্যা তারই নির্দেশ ও অভিলাষ অনুযায়ী গোপনে সিনায় সিনায় চলে আসছে। তিনি তাঁর 'আহলে বায়াতকে' (পরিবারবর্গকে) এ গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং আহলে বায়াত হতে এ এলমে সিনার 'বায়াত' প্রচলিত রয়েছে। শরিয়তের ইবাদতের দ্বারা আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং তরিকতের রিয়াযতের দ্বারা আত্ম ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পীর নির্বাচনেও হুশিয়ার হওয়া একান্ত দরকার। ভন্ডপীররা নানা অপকৌশল অবলম্বন করে মানুষকে ধোকা দেয়। এদের সংস্পর্শে এলে নিজের মূল্যবান জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে আত্মমুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। যদিও এ গ্রন্থটিতে বহু তথ্য ও তত্ত্বকথায় ভরপুর তবুও হাজার বছর ধরে চালু ধর্মান্ধতাকে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আরও কিছু জরুরীতথ্যাদি "যা কিছু আড়াল রাখা হয়েছিল" শিরোনামে এবং সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর নিমিত্তে মোহাম্মদী ভাবধারায় রচিত গ্রন্থকারের সামান্য কিছু কুরআনের শব্দ সংজ্ঞা এ গ্রন্থের শেষের দিকে তুলে ধারা হয়েছে।

Elizabeth Sirriyeh-এর লেখা Sufis and Anti-Sufis : The defence, rethinking and rejection of Sufism in the modern world (2014)[২৫] আলোচ্য গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সূফীবাদ বিরোধী বিবর্তন এবং বেঁচে থাকার জন্য সূফী কৌশলগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ক্রমাগত আবেদন সত্ত্বেও সূফীবাদ গত ২৫০ বছরে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রন্থটিতে ঐতিহ্যগত সূফীবাদ ছাড়া ইসলামের একটি রহস্যময় পদ্ধতির ভবিষ্যত চিন্তা করার জন্য কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টাকে বিবেচনায় এনে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আধুনিক বিশ্বে ইসলামের বৃহত্তর ইতিহাসে সূফীবাদকে একটি কেন্দ্রীয় স্থান অর্পণ করে এবং আধুনিক পরিস্থিতিতে সূফীবাদের ভূমিকার পরিবর্তিত উপলব্ধি সকল মুসলিমদেরকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সূফীবাদের অবহেলার প্রতিকার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, ইমাম গাযালীর জীবন ও দর্শন (২০০৩)[২৬] গ্রন্থে লেখক প্রথমে ইমাম গাযালীর (র.) সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর রচনাবলী তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম গাযালী (র.) এর ধর্মচিন্তার স্বরূপ কি ছিল, কি পটভূমির ভিত্তিতে তিনি মুসলিম গবেষকদের জন্য কর্ম সাধনার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিলেন এ সকল প্রশ্নগুলোর সমাধান উপস্থাপন করেছেন। ইমাম গাযালী (র.) দর্শন, মানতেক, কালাম শাস্ত্রে তাঁর সারগর্ভ দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রীকদর্শনের অসারতা প্রমাণ, ইলাহতত্ত্ব, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, পারত্রিক ঘটনাসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষন ইত্যাদি সকল বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মূলত ইমাম গাযালী (র.) একযোগে সৃষ্টিতত্ত্ব, দর্শন, ফেকাহ, হাদীস, কালামশাস্ত্র ও চরিত্রশাস্ত্র নিয়ে গভীর পর্যালোচনা ও দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন। সুস্থ ও সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সূফী তত্ত্বকে তিনি জটিলতার আবরণ হতে

---

২৫. "Elizabeth Sirriyeh-এর লেখা *Sufis and Anti-Sufis*: The defence, rethinking and rejection of Sufism in the modern world (London and Newyork: Routledge, 2014.

২৬. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমান গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন* (ঢাকা: কোহিনূর লাইব্রেরী, ২০০৩)।

এমনভাবে মুক্ত করে এনেছেন যে, তারপর তাতে আর কোন সংযোজনের প্রয়োজন হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ইমাম গাজ্জালী (র.) এর এই সকল বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত, সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ (২০১৪)[২৭] আলোচ্য গ্রন্থটি তাসাউফ শাস্ত্রের এক অনবদ্য সংকলন। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রিয় শিষ্য সহচরদের আত্মশুদ্ধির বিষয়ে যে সকল দীক্ষা দিয়েছেন তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাসাউফ যে ভিত্তিহীন, উদ্ভট, দলীলহীন ও বিদাত নয়; বরং এর প্রকৃতি, উৎস, কর্মকাণ্ড, আমল, ওজিফা সবই হাদীস দ্বারা প্রমাণপুষ্ট তা গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে বিষয়গুলো প্রামাণ্য পুস্তকে বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয় এবং তা খুব একটা সুবোধ্য ও নয়; আর তা সংশয়-সন্দেহ ও ভ্রান্তি নিরসন করতে পারে-এমন বিষয়গুলোই শুধু এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে হাদীস থেকে উৎসারণের চেষ্টা চালানো হয়েছে। হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর ফায়দা (ব্যাখ্যা) শিরোনামে দাবী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে প্রতিটি হাদীসের শুরুতে এগুলোর মূল বক্তব্যের সমর্থনে একটি শিরোনাম দাড় করান হয়েছে, নসের (কুরআন-সুন্নাহ) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থকার তার গ্রন্থে সব শেষে সহীহ হাদীসের আলোকে হাকীকত তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতাগঞ্জে বখ্শ হাজবেরী (র.), মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, কাশফুল মাহজুব (২০১২)[২৮] আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতে হযরত দাতাগঞ্জে বখ্শ (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলার পথে মানুষের নিকট যেসব অন্তরায় বা বাধা বিপত্তি এসে দাঁড়ায় তাসাউফের ভাষায় তাকে

---

২৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত, *সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪)।

২৮. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্শ হাজবেরী (র.), মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, *কাশফুল মাহজুব* (ঢাকা: রশীদ বুক হাউস ২০১২)।

হিজাব বলা হয়। হিজাব দুই প্রকার। এখানে এই দুই প্রকার সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের প্রকারভেদ এবং ইলম ও আমল যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং আমলবিহীন ইলম ও ইলমবিহীন আমল যে কোন কাজে আসবেনা তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাসাউফের বাস্তবতা ও প্রকৃতি, আখলাকের শ্রেণী, প্রকৃত সূফীর গুনাবলী, শ্রেণীবিন্যাস, তাসাউফের আবশ্যকতা, সূফীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন তরিকতের ইমামদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– খোলাফায়ে রাশেদীনের চার ইমাম, নবী পরিবারের পাঁচ জন এবং আসহাবে সুফ্ফা তরিকতের ইমাম, তাবেয়ীনদের মধ্যে চার জন ইমাম, তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে উনপঞ্চাশ জন। ফকিরদের এগারটি সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব ও পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তাসাউফ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এবং এপথের বাধা-বিপত্তি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সূফী সম্প্রদায় তরিকত ও হাকিকত বুঝতে ও বুঝাতে এমন কিছু শব্দ ও পরিভাষার প্রচলন করেছেন; যা দ্বারা উক্ত বিষয় তারা অনায়াসে তাদের অনুগামীদেরকে বুঝাতে পারেন। এ ধরনের কিছু ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কে গ্রন্থকার তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। তাওহীদের ব্যাখ্যায় তরিকতপন্থীরা যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সামার বৈধ অবৈধতা নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.), হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান অনূদিত, দাকায়েকুল আখবার (২০১১)[২৯] আলোচ্য গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টির রহস্য এবং ফেরেশতাকুলের সৃষ্টির বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

---

২৯. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র.), হাফেজ মাওলানা মুহা. রফিকুল ইসলাম খান অনূদিত, *দাকায়েকুল আখবার* (ঢাকা: নেছারিয়া লাইব্রেরী, ২০১১)।

এখানে গ্রন্থকার মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন মানুষের মৃত্যুর স্থান, মৃত্যুর সময় আত্মার সাথে মালাকুল মউতের কথোপকথন, দেহ হতে আত্মা বের করার সময় আত্মার চিৎকার, মোনকার নাকীরের প্রশ্নের বিবরণ, ইত্যাদি। মানুষ মৃত্যুর পর তার আপনজনদের বিলাপ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সময় বিপদে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং মানুষের আমলনামা অনুযায়ী জান্নাত এবং জাহান্নাম দানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে জান্নাতের সুখভোগ এবং জাহান্নামের কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে মাহাত্মা ইমাম গায্যালী (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, কাজী মাওলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী অনূদিত, আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত (২০০৮)[৩০] শীর্ষক গ্রন্থে আওলিয়া কিরামের ওসিলায় যে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্য পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বুজুর্গানে কিরামের অভিমত আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার তার গ্রন্থে ওসীলা নিয়ে বিরোধীতাকারীদের অভিমত উপস্থাপন করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা খণ্ডনের জন্য যুক্তিগত প্রমাণাদিও উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে গ্রন্থকার আল্লাহর ওলীগণের ওসীলা গ্রহনের উপর উত্থাপিত কিছু প্রশ্নসমূহ এবং সেগুলোর জবাব প্রদান করেছেন। সবশেষে একটি ঘটনা বর্ণনা করে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন।

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন বেরলভী (রা.), মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন অনূদিত, পীর, মুরীদ ও বায়আত (তারিখবিহীন)[৩১] আলোচ্য গ্রন্থে পরকলীন মুক্তি ও কল্যাণ বলতে কি বোঝায়, কোন কল্যাণ অর্জনে কোন ধরনের পীর মুর্শিদের শিষ্যত্ব প্রয়োজন, সত্যিকার পীর মুর্শিদের

---

৩০. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, কাজী মাওলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী অনূদিত, *আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী কুতুবখানা, ২০০৮)।

৩১. ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন অনূদিত, *পীর, মুরীদ ও বায়আত* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী কুতুবখানা, তারিখবিহীন)।

মধ্যে কী যোগ্যতা থাকা দরকার এসবের একটা নিখুত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দ্বীনি কল্যাণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটা হলো ফালাহ-ই-নাক্বিস (অসম্পূর্ণ কল্যাণ) বা অসম্পূর্ণ পরিত্রান বা মুক্তি, যা আযাব ভোগ করার পর অর্জন হয়। এ ধরনের মুক্তি কোন বায়আত ও মুরিদ হওয়ার উপর নির্ভর করেনা। এ জন্য শুধু নবীজিকে মুর্শিদ হিসেবে জানাটাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় কল্যাণ হলো ফালাহ-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মুক্তি যা আযাব ভোগ করা ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করা। এ ধরনের কল্যাণের জন্য মানুষের আমল, কর্ম, কথা ও অবস্থা এমন হওয়া যে, যদি এর উপর শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে, তবে আল্লাহর দয়া ও রহমতে আযাব ছাড়াই জান্নাতে যাওয়ার দৃঢ় আশা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে পীর বা মুর্শিদের প্রকার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মুর্শিদকে 'মুর্শিদ-ই-আম' ও 'মুর্শিদ-ই-খাস' এই দুই ভাগে ভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বায়আত ও তার প্রকারভেদ আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বায়আতের দুই ধরনের প্রকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এখানে বায়আত হতে বিমুখ হওয়ার প্রকারভেদ এবং বায়আত অস্বীকারকারীর বিধান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইলমে তাসাউফের পীর, বায়আত, মুরিদ ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.), সুফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূদিত, সিররুল আসরার (২০১০)[৩২] আলোচ্য গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যার প্রথম অধ্যায়ে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মারেফতের বিভিন্ন বিষয় যেমন- শরীয়ত, তরীকত, মারেফত ও হাকীকতের চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মানুষকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, সূফী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যিকির আযকার, যিকিরের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা

৩২. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.), সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূদিত, *সিররুল আসরার* (ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০১০)।

হয়েছে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে শরীয়ত ও তরীকতের সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মারেফাতের পবিত্রতা, ওয়াজদ ও কলবের পরিচ্ছন্নতা, নির্জনতার বর্ণনা এবং নির্জনতায় কি অযীফাসমূহ পড়তে হবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর করামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.), মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, আল-মুনকিজুমিনাদ্দালাল (২০১২)[৩৩] আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনি কিভাবে সূফী সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন, এই পথে আসার আগে তিনি কি কি বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র.) জ্ঞানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং মাজহাব ও তার গভীরতম তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন দল, মত এবং মতানৈক্য ও মতবিরোধ সত্ত্বেও তিনি কিভাবে সত্যের সন্ধ্যান পেলেন এবং এই পথে তিনি কি কি বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কালাম শাস্ত্র থেকে তিনি কি কি উপকার পেয়েছেন, তত্ত্ব ও সত্যানুসন্ধান ও সাধু ইমামদের অন্ধ অনুকরণে নির্ভরশীল হওয়ার দরুণ কাঙ্খিত ফল লাভে ব্যর্থ তালিমিয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কি শিক্ষা পেয়েছেন তা তুলে ধরেছেন। ইমাম গাযালি (র.) এর প্রচুর বিদ্যার্থীর ভীড় থাকা সত্বেও শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহন কেন করলেন, দীর্ঘকাল নির্জন ও নিভৃত অবস্থায় থাকার পরে কেন আবার স্বদেশে ফিরে এলেন তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এই গ্রন্থে। সব শেষে তিনি সূফীবাদ, আনুগত্য, নির্ভরতা, নিষ্ঠা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন এবং চারটি করণীয় ও চারটি বর্জনীয় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

---

৩৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র.), সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূদিত, *আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল* (ঢাকা: ইমাম গাজ্জালী (র.) ও বড়পীর আব্দুল কাদেও জিলানী (র.) ফাউন্ডেশন, ২০১২)।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেশ দেহলবী (র.) এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.), সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, আল-কওলুল জামিল ও ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা (২০১১)[৩৪] গ্রন্থ দ্বয়ের প্রথম গ্রন্থটিতে সূফীবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বায়আত প্রথাকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের বায়আত প্রথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একাধিক পীরের হাতে বায়আত করা জায়েয কিনা তা আলোকপাত করা হয়েছে। মুরিদের শিক্ষা-দীক্ষা, কবিরা গুনাহ, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। এখানে কাদেরিয়া তরিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন- কাদেরিয়া তরিকার ওজীফা, যিকির, যিকিরের নিয়ম, যিকিরের তরতীব, তরিকার লতিফাসমূহ, রহমতের ফায়েজ, বিভিন্ন প্রকারের মোরাকাবা ইত্যাদি। এরপর চিশতিয়া তরিকার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন- সওয়াব রেসানীর নিয়ম, ওজীফা, লতীফাসমূহের স্থান, নফি এছবাতের কায়দা, যিকিরের তরতীব, বিভিন্ন প্রকারের মোরাকাবা, চিল্লার শর্ত ও নিয়ম-কানুন, কুন-কায়াকুনের নামাজ ইত্যাদি। এরপর নকশাবন্দিয়া তরিকার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন- দুরূদ শরীফের ফজিলত, যিকিরের তরতীব, যিকিরের শুগল ও ওজীফা, যিকিরের পদ্ধতি, লতীফাসমূহ, একত্রে ছয় লতিফার নিয়ত, আনওয়ারত ও মুরাকাবা সমূহের আলোচনা, মুরাকাবা পদ্ধতি, ফানার বিভিন্ন স্তরের আলোচনা, বাকাবিল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা, লাতাফিয়ে সিত্তা এবং এগুলোর যিকির পদ্ধতি ইত্যাদি। এরপর এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে মোজদ্দেদিয়া তরিকা সম্পর্কে। গ্রন্থের শেষ দিকে বেশ কিছু সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আমল দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে এমন কিছু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সমাজে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। বিষয়গুলো

৩৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেশ দেহলবী (র.) এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.), সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, *আল-কওলুল জামিল ও ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা* (ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০১১)।

হলো- মওলুদ শরীফ (মিলাদ শরীফ), প্রচলিত ফাতিহা, উরস ও সামা, গায়রুল্লাহকে ডাকা, দ্বিতীয় জামাত, ইমকানে নজির ও ইমকানে কিজব।

উপরোক্ত গবেষণা গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সূফীবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে সূফীবাদের উৎপত্তি, এর ক্রমবিকাশ, সূফীবাদের বিভিন্ন প্রকারের তরিকা, বাংলাদেশে সূফীদের আগমন ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। সূফীবাদের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠান সংঘটিত হলেও এ সম্পর্কে ব্যাপক কোন গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসে সূফীবাদকে কোন অবস্থানে রাখা হয়েছে বা একে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাপক গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে সুফীবাদের অবস্থান –গবেষণা কর্মটি পূর্বোক্ত গবেসণাকর্ম ও গ্রন্থাদির উল্লেখিত ঘাটতি পূরণের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। সুতরাং আলোচ্য গবেষণাটি সূফীবাদ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা রয়েছে তা পূরণে সাহায্য করবে।

অধ্যায় : তিন
সূফী এবং সূফীবাদ
(Sufi and Sufism)

'সূফী' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মুসলিম ধর্মবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, 'সূফী' শব্দটি 'আহলুস সূফ্ফা' থেকে উদ্ভূত। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একদল সাহাবী মসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা 'আহলুস সূফ্ফা' বা 'আসহাবে সূফ্ফা' নামে পরিচিত ছিল। তাদের জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।[৩৬]

কারো কারো মতে, 'সূফী' শব্দটি আরবী 'সাফা' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যাঁরা সাংসারিক নানাবিধ পাপ হতে মুক্ত এবং পবিত্র, তাঁরাই 'সূফী' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আল্লামা নূরউদ্দিন আবদুর রহমান জামী (র.) এ মতের সমর্থক ছিলেন। কারণ সূফীগণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন।[৩৭] কারো কারো মতে, 'সূফী শব্দটি আরবী 'সফ' শব্দ হতে উদ্ভূত। 'সফ' শব্দের অর্থ সারি, পংক্তি, কাতার। সূফীগণ জ্ঞান, পবিত্রতা, সাধনার দিক দিয়ে সাধারণ লোকজনের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন বলে তাদেরকে 'সূফী' বলা হয়।[৩৮] আল্লামা লুৎফী জুময়া তার স্বরচিত গ্রন্থ 'তারিখে ফালাসিফাতে ইসলাম'-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সূফী' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উৎপত্তি। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ- 'প্রভুর জ্ঞান''। সূফীও একজন বিজ্ঞানী। তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সর্বদা মত্ত থাকেন। কেননা যিনি প্রকৃত অর্থেই সূফী, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের গভীরতম রহস্যভেদ উদঘাটনে সর্বদা মশগুল থাকেন। আর এই রহস্য উদঘাটনে তিনি সফল হন। এটিই প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান। যিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই বিজ্ঞানী। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে অন্তরে আত্মসাধনার মাধ্যমে। এটাই সূফী সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য।[৩৯]

---

৩৬. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৩৭. খালীক আহমেদ নিযামী, *তারিখে মাশায়েখে চিশ্‌ত* (দিল্লীঃ নাদওয়াতুল মুসান্নিফিন, উর্দু বাজার, অশোক প্রেস, ১৯৬৩), পৃ. ১৮।

৩৮. মোঃ সোলায়মা আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রুমী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২।

৩৯. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য* (ঢাকাঃ মদিনা বুক হাউস, ২০০৯), পৃ. ৯৮।

অধ্যাপক ড. রেনল্ড এ নিকলসনসহ পাশ্চাত্যের কোন কোন পণ্ডিত 'সূফী' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ 'সোফিষ্ট' থেকে আগত বলে মনে করে থাকেন। কারণ 'সোফিষ্ট' অর্থ জ্ঞান, আর সূফীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর। কাজেই 'সোফিষ্ট' শব্দ থেকেই 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু এটা তাদের ধারণা বা অনুমান মাত্র। যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ তারা পেশ করতে পারেনি।[৪০]

আলী ইবনে উসমান আল-হুজভিরি, ইবনে খালদুন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আরবি 'সওফুন' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[৪১] অধিকাংশ লেখক এ মত সমর্থন করেন। রোনাল্ড, নিকলসন, হুইন ফিল্ড, ব্রাউন, আরবারী, স্মিথ, ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকও এ মতের সমর্থক। 'সওফুন' শব্দের অর্থ পশম এবং 'সূফী' অর্থ হলো পশমী পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি। সূফীগণ মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন বলেই তাদের সূফী বলা হতো। একথা ঠিক যে জাগতিক ঐশ্বর্য ও ধন সম্পদের প্রতি সূফীরা অনাসক্ত।[৪২] উল্লেখ্য যে, পশমী বস্ত্র পরিধানকারী হলেই 'সূফী' হওয়া যায় না, অন্তরের পবিত্রতা 'সূফী' হওয়ার পূর্বশর্ত। 'সূফী' শব্দটি যদি 'সওফ' থেকে হয়ে থাকে তবে এর অন্তর্নিহিত কিছু কারণ থাকতে পারে। যেমন-

১. সওফুন বা পশম অপেক্ষাকৃত নরম হয়। সুতরাং 'সূফী' তাঁরাই হন যারা তাদের অন্তরলোককে নরম ও মোলায়েম করতে চান।
২. পশম সাধারণত সাদা হয়, কাজেই 'সূফী' তাঁরা যারা তাদের হৃদয়/কাল্‌বকে শ্বেত-শুভ্র করার জন্য মেহনত করেন।
৩. পশমী কাপড় সাধারণত রং পরিবর্তন করে না। কাজেই 'সূফীরা' সিবগাতুল্লাহর চুল্লীতে নিজেদের একবার রঙ্গীন করার পর আর অন্য রং কবুল করেন না।[৪৩]

কেউ কেউ 'সূফী' শব্দের প্রতিশব্দ 'তাসাওউফ' নিয়ে বিশ্লেষণ করে ইলমে তাসাউফ তথা সূফীবাদ নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, 'তাসাউফ' আরবী 'সাউফ' থেকে

---

৪০. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৪১. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা* (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ১৯।

৪২. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১।

৪৩. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

উদ্ভূত। এর অর্থ পশমী কাপড় পরিধান করা। আরবী 'তাসাওউফ' শব্দটি চারটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন– 'তা-সোয়াদ-ওয়াও-ফা'। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা রহস্যাবৃত্ত হয়ে আছে। যেমন– 'তা' দিয়ে 'তাওবাহ্‌র' প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় 'তাওবাহ্‌' দ্বারাই। 'সোয়াদ' দ্বারা 'সাফা' বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ আত্মশুদ্ধি লাভ করা। এই আত্মশুদ্ধি লাভ করাই সুফী সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ওয়াও' দ্বারা 'বেলায়েত' বুঝানো হয়েছে। তাসাউফের তৃতীয় স্তর হলো বেলায়েত। সূফী সাধক 'তওবাহ্‌' ও 'সাফা' এর স্তর অতিক্রম করে বেলায়েতের স্তরে পৌছে। এই স্তরে সাধক 'ইলহাম' প্রাপ্ত হয়। 'ফা' দ্বারা 'ফানাফিল্লাহ্‌' বুঝানো হয়েছে। এ স্তর সূফী সাধনার উচ্চতর স্তর। ফানাফিল্লাহ্‌ এর স্তরে পৌছলে সাধক আল্লাহর সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়।[৪৪]

'সূফী' শব্দটি প্রাক-ইসলামি যুগে ও আরব দেশে প্রচলিত ছিল। তৎকালে প্রাচীন আরবে 'মুজারা' নামক এক গোত্র ছিল। সে গোত্রের গাউস ইবন মুর এর উপাধি ছিল 'সূফাহ' এবং তার গোত্রকে বলা হত 'বনু সূফাহ'। 'সূফাহ' নামকরণের প্রেক্ষাপট এই যে, গাউস ইবন মুর জন্মগ্রহণ করলে তার মা মানত অনুযায়ী তার মাথায় উলের কাপড় বেঁধে তাকে কাবা ঘরে খাদিম হিসাবে নিযুক্ত করেন। উলকে আরবীতে সূফ বলে। এভাবে কালের গতি প্রবাহে ওলী দরবেশগণের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং তাদেরকে সূফী পদবাচ্যে আখ্যায়িত করার প্রচলন ঘটে।[৪৫]

'সূফী' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেলেও একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে উল্লেখিত সবগুলো অভিমতই সূফী তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের এবং সূফী জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের কোন না কোন অর্থ বহন করে। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সূফীগণ সার্থক নামকরণের সাথেই বিভূষিত হয়েছেন বলেই ধরে নেয়া যায়।

---

৪৪. Sayeed Abdul Hai, *Muslim Philosopy* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1982), P. 142-143.

৪৫. শাহ সাইয়েদ আহমাদ কবীর আর রেফাঈ (র.), *আল বুরহানুল মুআইয়াদ* (ঢাকা: মজলিসে ইলমী, ১৯৮৯), পৃ. ৩৭-৩৮।

সূফী পরিচিতি (Introuction of Sufi)

ইসলামের পরিভাষায় সূফী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহ ও আল্লাহর প্রেরিত অধিপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য তথা ধন সম্পদ ও মান-সম্মান লাভের মোহ থেকে অনাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং নিখিল সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর আরাধনা-উপাসনা এবং তারই তরফ থেকে প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন আদর্শকেই আপন জীবনের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন, তিনিই প্রকৃত সূফী। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া সুফীর জীবনে আর কোন রকম কামনা বাসনা নেই। তিনি সৃষ্টি জগতের সবকিছুই আল্লাহতে বিলীন করে দেন এবং নিজেও আল্লাহতে বিলীন হয়ে যান।

সূফীবাদ ইসলামের একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর মুসলিম মনীসীগণ তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এর সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন। এখানে প্রধান কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

- সূফী পরিচিতির বিশদ ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত তাপস যুন্নূন মিসরী (র.) বলেন, ‘‘জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে যিনি একমাত্র আল্লাহর আরাধনা উপসনাকেই জীবন ব্রত করে নিয়েছেন তিনিই প্রকৃত সূফী।”[৪৬]
- মহাত্মা হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.) বলেন ‘‘যিনি তাঁর জীবনমরণ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পেই উৎসর্গ করে দিয়েছেন তিনিই প্রকৃত সূফী।” তিনি সূফী পরিচিতির বিশদ ব্যাখ্যায় আরও অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ‘বস্তুজগতের মোহ থেকে আপন প্রবৃত্তিকে প্রভাব মুক্ত রাখা বিশ্ব প্রকৃতির ছলনা থেকে বিরত থাকা, ইতর সুলভ চরিত্রের উৎর্ষ সাধন, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে আত্মাকে পুত-পবিত্র রাখা, মানবিক চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং সমুদয় সৃষ্টি জগতের মহান আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচিতি লাভ এবং

৪৬. শাহ সাইয়েদ আহমাদ কবীর আর রেফাঈ (র.), *আল বুরহানুল মুআইয়াদ* (ঢাকা: মজলিসে ইলমী, ১৯৮৯), পৃ. ২০।

তাঁরই মহান অস্তিত্বে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়ার নামই সুফী ধর্ম।"[৪৭]

- মহাত্মা মাত্বুলী বলেছেন, 'যিনি তার অন্তকরণকে সৃষ্টির আবিলতা থেকে নিষ্কলুষ রেখেছেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহ প্রাপ্তির বাসনায় জনসমাজ থেকে দূরে সরে নির্জনতা অবলম্বন করেছেন তিনিই সূফী।"[৪৮]

- প্রখ্যাত তাপস বশর হাফি বলেছেন, 'আল্লাহর জিকির দ্বারা যিনি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখতে পেরেছেন তিনিই সূফী।[৪৯]

- মহাত্মা মারূফ কার্খী সূফীবাদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'প্রতিটি বস্তুও পরম সত্তা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, গূঢ় রহস্য ও সূক্ষতত্ব বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুর নির্ভরতা থেকে বিমুখ ও বিমুক্ত থাকার নামই সুফীবাদ।'[৫০]

- সহল বিন আবদুল্লাহ তাসতারী বলেছেন, যাঁর অন্তরে সঙ্কোচবোধ ও কুটিলতা নেই, সদা সৎচিন্তায় বিভোর, আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক লোভ-লালসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্বর্ণ ও মৃত্তিকা যাঁর নিকট সমমান, সমমর্যাদা ও সমমূল্যের বলে বিবেচিত, তিনিই প্রকৃত সূফী।' তিনি এ সম্পর্কে আরও অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'যিনি স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও স্বল্প কথায় অভ্যস্ত এবং জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত, তিনিই সুফী।'[৫১]

- তরীকতের অন্যতম ইমাম মহাত্মা শেখ কুশাইরী (র.) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্থান নেই এবং যিনি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাননা, তিনিই প্রকৃত সূফী।'[৫২]

---

৪৭. শাহ সাইয়েদ আহমাদ কবীর আর রেফাঈ (র.), *আল বুরহানুল মুআইয়াদ* (ঢাকাঃ মজলিসে ইলমী, ১৯৮৯), প্রাগুক্ত।

৪৮. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫১. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৫২. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

- হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ বলেছেন, 'খোদা যাকে তার প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন, তিনিই প্রকৃত সুফী।'[৫৩]
- হযরত আবুল হুসাইন নুরী (র.) বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জনই সূফী দর্শনের মূল।'[৫৪]
- হযরত শিবলী (র.) বলেছেন, সৃষ্টি ছেড়ে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক করা সূফীবাদের পরিচয়।'[৫৫]
- হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন, 'জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে পরলৌকিক সুখকে প্রাধান্য দেয়া সংক্রান্ত মতবাদকেই সূফীবাদ বলা হয়।'[৫৬ ৫৫]
- আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'যিনি বিবেক দিয়ে আবেগকে দমান, অন্তর দিয়ে প্রবৃত্তিকে মন্দ থেকে বাঁচান, রিপুর তাড়না থেকে বাঁচার জন্য প্রভূকে আঁকড়ে ধরেন তিনিই প্রকৃত সুফী।'[৫৭]
- সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়জীদ বোস্তামী (র.) বলেন, 'আল্লাহর ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া এবং পার্থিব দুঃখ কষ্ট অনুভূতিহীন হওয়াই সূফীবাদ।'[৫৮]
- শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আনসারী (র.) বলেন, 'সূফীবাদ মানুষের আত্মা বিশোধনের শিক্ষা দেয়, আর নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে মানুষের ভেতর ও বাইরের জীবনকে উন্নতর করে গড়ে তোলে। এর বিষয় বস্তু হলো- চিরন্তন সুখ-শান্তি অর্জন।'[৫৯]
- হযরত মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসাইন বিন আবি তালিব (রহ.), 'সূফীবাদ উৎকৃষ্ট ও মার্জিত চরিত্রকে বলা হয়। অর্থাৎ যার চরিত্রিক মাধুর্য্য যতদূর মার্জিত হবে, তিনি তারই সমান্তরালে, ততদূর সূফীবাদের সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন হবেন।[৬০]

---

৫৩. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৫৫. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৫৬. মোঃ ওমর আজম, *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: নিউ ফর্মূলা পাবলিকেশন, ২০০১), পৃ. ৬২।

৫৭. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *সূফীতত্ত্ব* (ঢাকাঃ মাহাফিল, ২০১৬), পৃ. ৩৪।

৫৮. ড. রশিদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (বগুড়াঃ সাহিত্য সোপান, ২০০০), পৃ. ৩৫৯।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

৬০. খালিক আহমেদ নিযামী, *তারিখে মাশায়েখে চিশ্‌ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

- হযরত আবু বকর জারীরী (রহ.) বলেন, 'এমন ব্যক্তিকেই সূফী বলা হবে যিনি সর্বজ্ঞানের আধার এবং সর্ববিধ গর্হিত আচরণ থেকে মুক্ত।'[৬১]
- হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহ.) বলেন, 'এমন ব্যক্তি সূফী যাকে কেউ পছন্দ করে না এবং যে কাউকে পছন্দ করে না।'[৬২]
- আল্লামা রুয়াইম (রহ.) বলেন, 'যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে সমভাবে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত সূফী।'[৬৩]
- মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন, 'যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে সমভাবে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত সূফী।'[৬৪]

সূফীবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, আত্মশুদ্ধি বা আত্মা-সংশোধন, আত্মসংযম ও আত্মসাধনার মাধ্যমে পরম প্রেমময় আল্লাহতালার প্রেমোপলব্ধিই সূফী সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য আল্লাহ-তে বিলীন, আল্লাহ-তে সমাহিত, আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত বা প্রভাবিত হওয়াই সূফীগণের আসল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যে যিনি সফল হতে পারবেন তিনিই প্রকৃত সূফী।

সূফীবাদের উৎপত্তি (Origings of the Sufism)

সূফীবাদ পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী ও কর্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক এমনসব গভীর অর্থবোধক বাণী প্রকাশ করেছেন, যা স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জীবনে এনেছিল মহাভাবের বন্যা, যা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই দিগ্বিজয়ী সৈন্যদেরকে করেছিল ধ্যানমগ্ন ও মরমিভাবাপন্ন সূফী। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্যে সূফীবাদের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি একথা অস্বীকার করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, সূফী দর্শন অন্যান্য মরমীবাদ বা দর্শনের প্রভাবজাত। তাদের মতে ইসলাম যেহেতু সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য মরমী দর্শন ইসলামের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে সেহেতু অন্যান্য মরমী

---

৬১. আল্লামা শিবলী নোমানী, *ইমাম গাযালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে সূফী দর্শন জন্মলাভ করেছে। তাই সূফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সূফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব মতবাদ

এইচ. মার্টেন, গোল্ডজীহার প্রমুখের মতে মুসলিমগণ ভারতীয় চিন্তা ধারার সংস্পর্শে এসে বেদান্ত দর্শনে প্রভাবিত হয়ে সূফী দর্শন উদ্ভাবন করেছে। এরা মনে করেন যে, বেদান্ত দর্শন অতি প্রাচীন এবং এর অনুসারীগণ ব্রাহ্মণ্য ভাবাপন্ন ছিল ও এদের কিছু সাধু সন্নাসী সর্বদা চিন্তানুশীলনে রত থাকতেন। অপর পক্ষে প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল বিধায় জ্ঞানানুশীলন ও ধ্যান চিন্তায় অধিক অগ্রসর হতে পারেনি। তাদের এ ধারণা নেহায়েত অমূলক। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) হেরা গুহায় ধ্যান-মগ্নতা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র নায়ক, সমাজ সংস্কারক, সেনানায়ক, ধর্ম প্রচারক অর্থাৎ জীবনের এমন কোন পর্যায় নেই যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রাখেননি। তাঁর সাহাবীগণের মধ্যেও এসব গুনের ব্যতিক্রম ছিল না।[৬৫]

সূফীবাদ ইসলামের মতই পুরাতন। ইহা ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকের অভিব্যক্তি। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে মুসলিম চিন্তাধারা ভারতীয় ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তার পূর্বেই সূফীবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। ইমাম হাসান আল বসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.); হযরত আবু হাশিম মক্কী (মৃ. ৭৮০ খ্রি.); হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (মৃ. ৭৭৭ খ্রি.); হযরত রাবেয়া আল-বসরী (মৃ. ৭৪৯ খ্রি.) প্রমুখ সূফীগণের আবির্ভাব ও সাধনা প্রমাণ করে যে, সূফীবাদ ভারতীয় দর্শন নয়, ইসলামের অধ্যাত্ম শিক্ষারই অনির্বার্য পরিণতি।

ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণাদির সাথে মুসলিম সূফীদের জীবন পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলেই এটা প্রমাণ করে না যে, সূফীবাদের উদ্ভব ঘটেছে বৈদান্তিক চিন্তাধারা থেকে। কেননা, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্যকরণ নির্ধারণ সম্পূর্ণ অমূলক। প্রত্যেক ধর্মেরই সাধক ও সাধনারীতি আছে। তাই বলে ইসলামের সূফী সাধকগণের সাধনার সাথে তাদের সাধনার খানিকটা মিল দেখে সূফীবাদ অন্য ধর্মের মতবাদ হতে আগত তা বলা সমীচীন নয়। বেদান্ত দর্শনের 'মায়াবাদ' ও সূফীদের জগত সম্পর্কীয় ধারণা এক নয়। বেদান্তিকরা এজগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু সূফীরা এ জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করেন না। কেননা,

---

৬৫. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩।

জগতকে তাঁরা পরম সুন্দরের প্রকাশ বলে মনে করেন। বেদান্তিকদের নিকট এই জগত অর্থহীন হলেও সূফীদের নিকট এই জগত মূল্যবান। কেননা, এই জীবনের সাধনাই মহাজীবনের ভিত্তি রচনা করে। বেদান্তরা তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন। কিন্তু সূফীরা নৈতিক দিক থেকে জগতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন।[৬৬] এবার সূফীগণের 'ফানা' ও বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। সূফীগণের 'ফানা' এবং বৌদ্ধদের নির্বাণ মতবাদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য বা সমন্বয় থাকলেও মূলত উভয় মতবাদের মধ্যেই মৌলগত বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। মৌলিকত্বের দিক থেকে এই দুইটি মতবাদই স্বতন্ত্রমুখী। কারণ বৌদ্ধগণ নিজেরাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নীতি অনুসারী হয়ে থাকেন। অথচ মুসলিম সূফীরা কেবল সর্বজ্ঞ ও চিরজীবন্ত মহান আল্লাহর নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। কাজেই ভারতীয় বৌদ্ধ মতবাদ থেকে সূফীবাদের উদ্ভব সংক্রান্ত মতবাদটি ঐতিহাসিকভাবেও নির্ভরযোগ্য নয়। যেহেতু সূফীবাদ উদ্ভবের বহু পরে ইসলাম ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছে।[৬৭]

সূফীবাদ স্বাভাবিকভাবে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে আবির্ভুত হয়েছে। সূফীবাদ অন্য কোন মত বা দর্শনের সাথে সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিকাশ লাভ করেনি। সূফী মতবাদে অদ্বৈতবাদ বা একাত্ববাদ অনেক বেশী ব্যাপক। সূফীবাদ বেদান্তের মতো এ জগতকে মায়া বা মিথ্যা বলে স্বীকার করে না। বরং সূফীরা মনে করে সব কিছুই আল্লাহর প্রকাশিত সিফাত। ফলে এ জগত তাঁরই সিফাত হলে তা মিথ্যা হতে পারে না। সূফীগণের লক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহকে লাভ করা; আর বেদান্তবাদীদের লক্ষ্য গভীর জ্ঞান লাভ করা। এতে বোঝা যায় যে, সূফীবাদ বেদান্তের অনুকরণ করেনি। বরং এটা আপন স্বকীয়তায় ভাস্কর ও উজ্জল তাওহিদবাদী মতবাদ।[৬৮]

খ্রিষ্টীয় বা নিওপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ

ভনক্রেমার ও নিকলসন প্রমুখ এই মতবাদের প্রবক্তা। অধ্যাপক নিকলসনের মতে, 'ইসলামে সূফীবাদের উদ্ভব ঘটেছে ঈসায়ী বা খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী চিন্তাধারা থেকে। কারণ মুসলমানরা নিউ প্লেটনিক চিন্তাবিদ খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার ফলেই ইসলামে সূফী মতবাদের

---

৬৬. ড. রশিদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

৬৭. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬৮. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

বিকাশ ঘটেছে। এসব ভাববাদী চিন্তাশীল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা হিজরী সালের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে ঈসায়ী মতবাদ প্রচার কল্পে নবোদ্যোগে সিরিয়া বা আরবের মধ্য প্রাচ্যের সর্বত্রই ঘুরে বেড়ান। অধ্যাপক নিকলসনের এই মতবাদটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মিথ্যা।[৬৯]

খ্রিষ্টান ও নিওপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞানিক বিশ্লেষণের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়। সূফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, সূফীবাদের প্রভাব হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর সাহাবী ও তাকে'ঈগণের মধ্যেই ঘটেছিল। জাগতিক কার্য সমাধা করেও তাঁরা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এছাড়া প্রথম পর্যায়ের সূফী যাঁদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা বাইরের চিন্তার সাথে মিশবার সুযোগ লাভ করেননি।[৭০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নবম শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ও নিওপ্লেটোনিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পূর্বেই সূফীবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। এছাড়া মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এমতবাদটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তদানীন্তন মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জীবনধারা তথা ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান যতক্ষন পর্যন্ত প্রভাবিত হয়ে না উঠেছিল ততক্ষন পর্যন্ত কোন বিজাতীয় প্রভাবই মুসলমানদের মন-প্রাণ অনুরঞ্জিত করে তুলতে পারেনি।[৭১] আবার চিন্তা, কার্য ও দর্শনের ব্যাপারে একজনের সাথে অন্যজনের সাদৃশ্য থাকলেই একজন অন্যজনের নকল করেছে, একথা বলা ঠিক নয়। কোন আত্মসচেতন মানুষই নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অন্যের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয়। কাজেই একথা বলা যায় যে, সূফীবাদের উদ্ভব ইসলামী ভাবধারা হতে এবং মুসলমান জাতির চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি।

পারসিক প্রভাব মতবাদ

ই.জি. ব্রাউন ও তার অনুসারীরা মতে করেন যে, পারস্য সম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিমগণ পারসিকদের সংস্পর্শে আসে এবং তখন থেকে সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে। পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয়ের ফলে তাদের মধ্যে নৈরাশ্য, কঠোর সংযম ও মরমীবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অধিকাংশ সূফী সাধক পারস্য অঞ্চলে জন্মলাভ করেছেন। কাজেই পারসিকগণই সূফীবাদের প্রবর্তক বলে ব্রাউন ও তার মতাদর্শিগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

---

৬৯. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৭০. ড. রশিদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

৭১. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

পারসিক ধর্মমত, চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মিক ভাবধারায় একটা বিশেষ স্বকীয়তা রয়েছে। জাতি হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।[৭২] একথা সত্য যে, সূফীবাদের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কিন্তু তারাই সূফীবাদের জন্ম দিয়েছে একথা ঠিক নয়।

আরবরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমন্ধে দ্বৈতবাদী। তাদের মতে সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে পৃথক এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক হলো প্রভু আর ভৃত্যের। অপরপক্ষে পারসিকরা একাত্ববাদী তাদের মতে সৃষ্টিতে স্রষ্টা বিরাজমান। তাদের এ ভাববাদী দর্শনে বিশ্বের সবকিছুতে আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে। সূফী দর্শনের সাথে দু'একটা দিকে পারসিকদের মিল পরিলক্ষিত হলেও সূফীবাদ তাদের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছে এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৭৩] বরং ইসলামের প্রভাবে পারসিক মুসলিমগণ সূফীবাদের সাগরে অবগাহন করে মুসলিম দর্শনের উন্নতি সাধন করেছে। মূল কথা ইসলামের সাধন-ভজনের পদ্ধতি অন্য সকলের চেয়ে ভিন্নতর হওয়ার কারণে সূফীবাদ কারো কাছ থেকে ধার করা হয়েছে বলা যায় না।

সুতরাং পারস্য হতে সূফীবাদের উৎপত্তি হয়েছে এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমনকি পরবর্তীকালের কয়েকজন প্রভাবশালী সূফী যেমন হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) ও হযরত ইবনুল ফরিদ (র.) আরবী ভাষা-ভাষী লোক ছিলেন। পারসিক রক্ত তাঁদের ধমনীতে ছিল না, কিন্তু সূফী দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পারসিকদের সংস্পর্শে আসার পূর্বেই সূফীবাদের উৎপত্তি হয়।

কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক মতবাদ

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সুফীবাদ বাইরের কোন চিন্তাধারা থেকে কিংবা অন্য কোন ধর্মের সাথে সংঘর্ষ করে সৃষ্টি হয়নি। এটা ইসলামের নিজস্ব সম্পদ এবং ইসলামি শরিয়তের আওতায় আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে যুগে যুগে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে মুসলিম দর্শনকে সারা বিশ্বের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও অনুকরণীয় করে তুলেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অনেক রহস্যাবৃত ঘটনা ও আয়াতে সূফীবাদের বীজ নিহিত আছে। নিম্নে এরূপ কিছু আয়াত ও রাসুল (সা.) এর মহান বাণী উল্লেখ করা হল:

---

৭২. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

৭৩. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ১০৫।

وَ فِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝ وَ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

'বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর মহিমার অসংখ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে জমিনের বুকে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। এর পরেও কি তোমরা সত্য অনুধাবন করবে না?'[৭৪]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ–

'দ্যুলোক–ভূলোক ব্যাপিয়া তাঁর সিংহাসন বিরাজমান।'[৭৫]

وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ –

'আমি (আল্লাহ) তাদের মধ্যে আমার রূহ্ প্রবিষ্ট করেছি।'[৭৬]

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ–

'আল্লাহ ভূলোক, দ্যুলোকও বিশ্বভূবনের নূর জ্যোতি'।[৭৭]

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ* فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ–

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাওনা কেন আল্লাহর মুখ সেদিকেই বিদ্যমান।'[৭৮]

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ–

'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।'[৭৯]

عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ–

'নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটেই আছি। কেউ আমাকে আহ্বান করলে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি।'[৮০]

৭৪. আল-কুরআন, ৫১:২০-২১।

৭৫. আল-কুরআন, ২:২৫৫

৭৬. আল-কুরআন, ১৫:২৯।

৭৭. আল-কুরআন, ২৪:৩৫।

৭৮. আল-কুরআন, ২:১১৫।

৭৯. আল-কুরআন, ২:১৫২।

৮০. আল-কুরআন, ২:১৮৬।

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿﴾

'তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।'[৮১]

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ –

'তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।'[৮২]

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ ﴿﴾

'আমি তাদের ঘাড়ের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটবর্তী।'[৮৩]

اَنِّیْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِیْنَ ﴿﴾

'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক সহস্র ফেরেস্তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।'[৮৪]

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی–

'তোমরা তাদেরকে বধ করনি, আল্লাহ বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি তা করনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।'[৮৫]

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْیَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿﴾

'যারা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারছো না।'[৮৬]

صِبْغَةَ اللّٰهِ –

'আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও।'[৮৭]

---

৮১. আল-কুরআন, ৫৭:৩।

৮২. আল-কুরআন, ৫৭:৪।

৮৩. আল-কুরআন, ৫০:১৬।

৮৪. আল-কুরআন, ৮:৯।

৮৫. আল-কুরআন, ৮:১৭।

৮৬. আল-কুরআন, ২:১৫৪।

৮৭. আল-কুরআন, ২:১৩৮।

এভাবে পবিত্র কুরআনে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে সূফীবাদের তথা দার্শনিক চিন্তাধারার ইঙ্গিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে চিন্তা করার, মনোনিবেশ করার ও গবেষণা করার নির্দেশ কুরআনেই রয়েছে। এছাড়াও রাসুলের (সা.) পবিত্র মুখ নিসৃত অনেক বাণী রয়েছে যাতে সূফী দর্শনের মৌল নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ কিছু বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- শরীয়ত একটি বৃক্ষের ন্যায়, তরীকত উহার শাখা–প্রশাখা, মারেফাত উহার পাতা এবং হাকীকত উহার ফল বিশেষ।[৮৮]
- যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে সক্ষম হয়েছে সে তার প্রভুর পরিচয় জ্ঞান লাভ করেছে এবং তার স্মরণাগত হয়েছে।[৮৯]
- এমন এক ইলম আছে, যা ঝিনুকের মধ্যে গোপন থাকার ন্যায় গুপ্ত।[৯০]
- কুরআন সাত লোগাতে অবতীর্ন এবং প্রতিটি আয়াতের যাহিরী ও বাতিনী অর্থ আছে।[৯১]
- আমি বান্দার প্রতি যা ফরজ করেছি তা আদায় করা ব্যতীত কেউ আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। ফরজ সম্পাদন করার পর নফল দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমিও তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার হাত, পা, চোখ, কান এবং নাকে পরিণত হই।[৯২] (হাদীসে কুদসী)
- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করেন।[৯৩] (হাদীসে কুদসী)

---

৮৮. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.), সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূদিত, *সিরুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৯০. মুল্লা আলী ইবন সুলতান আল হেরাবী আল কারী, *আইনুল ইলম যাইনুল হিলম* (মাকতাবা এহইয়ায়িল উল্লুমিল আরাবিয়া, ১৩৫১ হি.) পৃ. ১৬।

৯১. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল খাতীব আত্তরিযি, *মিশকাত আল-মাসাবীহ* (দিল্লী: কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৯৫৬), পৃ. ৩৫।

৯২. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ হাজবেরী (র.), সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত, *কাশফুল মাহজুব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

- সাবধান! নিশ্চয়ই মানবদেহে এক টুকরা মাংস আছে। যখন তা পবিত্র হয়, সারা দেহ পবিত্র হয়ে যায়। আর যখন তা অপবিত্র হয়, তখন সারা দেহই অপবিত্র হয়ে যায়। আর সেটা হল ক্বালব।[৯৪]
- তিনিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত 'মুহকাম', এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ'।[৯৫]
- শরীয়ত আমার বাক্য, তরীকত আমার কাজ, হাকীকত আমার অবস্থা আর মারিফাত আমার নিগূঢ় রহস্য।[৯৬]
- আপনাকে (রাসূলুল্লাহ (সা.) কে) সৃষ্টি না করলে আমি বিশ্বজগত সৃষ্টি করতাম না।[৯৭] (হাদীসে কুদসী)
- সমস্ত ভুমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল আমার স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু মুমিন বান্দার কলবে আমার স্থানের অভাব হয় না।[৯৮] (হাদীসে কুদসী)
- ইলমের এমন একটি রহস্যময় চিত্র আছে যা আলমে বিল্লাহ (এক কথায় আরেফ বিল্লাহ) ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নহে। যদি তারা এ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তবে দুনিয়াদারগণ তাকে বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আরেফ যাহেরী এলম ব্যতীত আল্লাহর বাতেনী এলম সম্মন্ধে জ্ঞান রাখেন। কেননা, আরেফের জ্ঞান বা ইলম শুধুমাত্র মহান প্রভুর গুপ্ত রহস্য ভেদ এবং তা আরেফ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।[৯৯ ৯৮]

---

৯৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (দেওবন্দ ইউ.পি. ভারতঃ মুখতার এণ্ড নাশের কুরআন মজীদ ও ইসলামী কুতুবখানা, তারিখ বিহীন), কিতাবুল ঈমাম, পৃ. ১৩।

৯৫. শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল খাতীব আত্‌তূরিযি, *মিশকাত আল-মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৯৬. ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (র.). *নূরুল-আসরার (নূর-তত্ত্ব)*, ১ম খণ্ড (ফরিদপুরঃ চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফ, ১৯৭৩), পৃ. ১৫।

৯৭. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.), সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূ., *সিরুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৯৯. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.), সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূ., *সিরুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

- আমি এক গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি পরিচিত হওয়ার ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলাম।[১০০] (হাদীসে কুদসী)
- নিশ্চয়ই আমি আদমকে স্বীয় আকৃতিতে (সুরতে) সৃষ্টি করেছি।[১০১] (হাদীসে কুদসী)
- যদি আল্লাহকে তোমরা জানার মত জানতে, তবে তোমরা সমুদ্রের উপর চলতে এবং দু'আ দ্বারা পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারতে।[১০২]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূফীবাদ নিজস্ব স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত, কোন ধর্ম বা দর্শন বা মতবাদের অনুকরণে সূফীবাদ প্রচলিত হয়নি। পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী থেকেই এর উৎপত্তি। এ সম্পর্কে সুবিখ্যাত হুসায়ন ইবনে মনসুর আল-হাল্লাজের উপর বিস্ময়কর গবেষণাকর্মী ফরাসী পণ্ডিত এল ম্যাসিনন বলেন, Sufism, in its original form, is the result of deep meditation of the truths revealed by the Quran and the deepening of the meaning of some expressions used in the holy book.[১০৩]

সূফীবাদ ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা থেকে প্রচলিত হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যা একটার অনুসরণে আরেকটা নাযিল হয়েছে কিন্তু পবিত্র কুরআন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের অনুসরণে নাযিল হয়নি। বরং কুরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে সত্যায়ন করেছে এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য নবীদের সত্যায়নকারী। কুরআন কোন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠি-সম্প্রদায়ের জন্য নয়। কুরআন ও রাসুল (সা.) সর্বজনীন। এতদসত্ত্বেও যদি অন্যান্য দর্শন ও ধর্মের কোন ভাল বিষয় সূফী দর্শনে এসে থাকে, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ জ্ঞানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি খুবই উদার। তাই সূফী দর্শনে বা অন্য কোন দর্শনের কোন বিষয়ের প্রক্ষেপ হলেও তাতে দোষের কি থাকতে পারে! সত্য-সুন্দর-সঠিক একই বৃত্ত থেকে আগত। কাজেই তাতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। জ্ঞানের বিষয়ে ইসলামের উদার

---

১০০. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.), সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূ., *সিররুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১০১. ইমাম আল-গাযালী, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬, ৪র্থ খণ্ড), পৃ. ৩৫২।

১০২. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, *হযরত দাতাগঞ্জে বখশ (র.) ও তাঁর অমূল্য গ্রন্থ কাশফুল মাহ্জূব* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৬), পৃ. ১২৭।

১০৩. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

নীতি ইসলামি দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে–প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই অনেক দার্শনিকমতবাদ আজ অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সূফী দর্শন বা মুসলিম দর্শন পুরাতন হচ্ছে না। বরং নব উদ্যমে মানুষকে নতুনত্বের দিকে, আলোর দিকে, জীবনের উৎকর্ষ সাধনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।[১০৪]

সূফীবাদের ক্রমবিকাশ (Evolution of Sufism)

পৃথিবীতে আদম (আ.) এর আগমনকালীন সময়ে সূফীবাদের উৎপত্তি ঘটে। প্রায় পোনে চার শতাব্দী অনুশোচনার আগুনে দগ্ধীভূত আদম (আ.) মূলত সূফী সাধনাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বংশ পরম্পরায় হাবিল (আ.) শীষ (আ.) নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.) প্রমুখ নবীদের মাধ্যমে সূফীবাদ বিকশিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। ইসলামের আগমনের সাথে সূফীবাদেরও আগমন। সূফীবাদ ইসলামের মতই পুরাতন। নতুন সৃষ্টি বা পরবর্তীকালের অভিনব সংযোজন বা সংস্করণ নয়। বরং এটা ইসলামের নিজস্ব তত্ত্ব। আর তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১০৫] ইসলাম যেমন পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.) এর কর্ম ও বাণী এবং সাহাবী ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের প্রচেষ্টায় সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে তেমনি সূফীবাদ ও পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.) এর কর্মও বাণী এবং সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিভিন্ন সূফীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগে সূফীবাদ একটি শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করলেও এর নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থাবিষয়ক ভিত্তি তখনই গড়ে ওঠে।রাসুল (সা.) নিজে সূফীবাদের চর্চা করতেন। তিনি চিরদিনই আড়ম্বরহীনতা পছন্দ করতেন; অল্প খাদ্য, অল্প নিদ্রা, অল্প কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি অত্যাধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। দীর্ঘ সময় ধরে মোরাকাবা ও মোশাহাদায় মগ্ন থাকতেন।[১০৬] উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন, ''রাসুল (সা.) জিকিরে মশগুল হলে তাঁকে আমরা চিনতে পারতাম না। তাঁর পবিত্র মুখায়বে এমন একটা পরিবর্তন এসে যেতো যেন তিনি অন্য জগতের মানুষ, কাউকে

১০৪. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ার-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮১-৪৮২।

১০৫. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১০৬. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭।

চেনেন না। এছাড়াও তাঁর পবিত্র শরীর থেকে একটা বিস্ময়কর শব্দ শোনা যেতো। গোশত রান্না করার সময় পাতিলে যে 'ডগ্-বগ' শব্দ হয়–এ শব্দটি অনেকটা সে রকম।"[১০৭] রাসুল (সা.) এর এসব হাল বা অবস্থা সূফীবাদের পরিচায়ক। তিনি তাঁর কর্মপন্থার মাধ্যমে যে ভিত্তি রচনা করেগেছেন তার উপর ভর করেই সূফীবাদ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সূফীবাদের এ ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে কালগত ও গুনগত দিক দিয়ে আটটি স্তরে ভাগ করা যায়। স্তরগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

প্রথম স্তর: আস্হাবে সূফ্ফার পবিত্র সাধনা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণ এ স্তরে সূফীবাদের সূচনা করেন। আল্লাহর পবিত্র ইবাদতে মশগুল থাকাই এ মহান তপস্বীদের একমাত্র প্রধান কর্ম ছিল। আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটেছিল এ স্তরের মহাপুরষ ও সাধকদের মাধ্যমে। সূফী দর্শনের প্রথম স্তর হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনকালে সূফীবাদ বিষয়ে তাঁর শিক্ষা ও প্রয়োগ। নবুয়ত প্রকাশের অনেক পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন এমনকি কোন কোন সময় মাসাধিককাল পর্যন্ত ধ্যান-সাধনা করতেন। দীর্ঘ পনের বছরের বিভিন্ন সময়ে এ নির্জনবাস ইসলামের তথা মুসলিম দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১০৮]

আহাবে সূফফার অধিবাসীগণ সবসময় মসজিদে নববীতে রসুল (সা.) এর সাথে অবস্থান করতেন এবং সদা-সর্বদা নবী করিম (সা.) এর কর্ম, কর্মপদ্ধতি, আদেশ–নিষেধ ও চরিত্র স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করতেন।[১০৯] আস্হাবে সূফ্ফাগণের মধ্যে হযরত আবু বকর (র.) ও হযরত আলী (র.) বিখ্যাত ছিলেন। তবে অধিকাংশ সূফীগণ হযরত আলী (র.)কে সূফী সাধনার ইতিহাসে বেলায়তের সম্রাট বলে অবহিত করেন। আস্হাবে সূফ্ফার বিশিষ্ট সূফীগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)
২. হযরত উমর ফারুক (রা.)
৩. হযরত ওসমান গণি (রা.)

---

১০৭. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১০৮. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪।

১০৯. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৪), পৃ. ৩২।

৪. হযরত আলী (রা.)

৫. হযরত সালমান ফারসী (রা.)

৬. হযরত আবূ জর গিফারী (রা.)

৭. হযরত মায়াজ (রা.)

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ আল-জুল বুজদাইন (রা.)

১০. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

১১. হযরত তালহা (রা.)

১২. হযরত যুবায়ের (রা.)

১৩. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)

১৪. হযরত যায়িদ বিন সাবিত আনসারী (রা.)

১৫. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.)

১৬. হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)

১৭. আম্মার ইবনে ইয়াসির (র.)

১৮. হযরত মিকদাদ (রা.)

১৯. হযরত হুযাইফা (রা.)

২০. হযরত আবু যার্‌র (রা.) প্রমুখ।[১১০]

দ্বিতীয় স্তর : কৃচ্ছ্রতা সাধন

দ্বিতীয় স্তর ছিল– কঠোর সংযম, তাকওয়া ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের যুগ। এ সময় কুরআন ও হাদিসের আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বাণীর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রানিত হয়ে একদল মুসলমান পরহেজগারী ও তাকওয়ার মধ্যে নিজেদের মসগুল রাখতেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করে আল্লাহকে জানার প্রয়াস চালাতেন।[১১১]

---

১১০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ২৮৬।

১১১. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

সূফী কৃচ্ছ্র সাধনার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরের প্রথম সূফী হযরত ইমাম হাসান আল বসরী (রা.) আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা.) এর হস্তমোবারকের মুরীদ ও তাঁর খলিফা। তিনি মদীনা মনোয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত কালে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী কুফায় জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর মাতা ছিলেন রাসুল (সা.) এর বিবি উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর দেখমতগার। তিনি হযরত আয়শা (রা.) ও হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর স্তন্য পান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। শিশু ইমাম এক সময় হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর গৃহে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র পানি পাত্র হতে পানি পান করায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) তা জানার পর এরশাদ করেছিলেন ''সে যে পরিমাণ পানি পান করেছে, সে পরিমান ইল্‌ম ও সে লাভ করেছে।'' হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ়। হযরত আলী (রা.) তাঁকে যাহেরী ও বাতেনী ইল্‌ম প্রদানকরত তরীকতের খিলাফত দান করেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, ইমাম ও মরমী সূফী ছিলেন। তিনি ১১০ হিযরী /৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১১২] প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সূফীসাধক ছিলেন সহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন নামে খ্যাত। তাঁরা মনে প্রাণেও কার্যাবলীতে ছিলেন আল্লাহর প্রতি উৎসর্গকৃত প্রাণ। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের বাতেনী অর্থ, গভীর রহস্যময় হাকীকত পূরণ মরমীভাব এবং পার্থিব জীবনের অনিত্যতা সকল সূফীকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।[১১৩]

এ স্তরের আরেকজন সূফী সাধকের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন হযরত ওয়ায়েস আল করনী (র.)। তিনি ইয়েমেনের করন অঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁকে খায়রুত তাবেঈন বা তাবেঈনকুল শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তিনি রাসুল (সা.) এর একনিষ্ঠ প্রেমিক ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে রাসুল (সা.) এর দুটি মোবারক দাঁত ভেঙ্গে গেলে তিনি তার সমস্ত দাঁত উপড়ে ফেলেছিলেন।[১১৪] আমিরুল মোমেনীন হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুল (সা.) কে এরশাদ করতে শুনেছি, ''নিশ্চয়ই তাবেঈকুল শ্রেষ্ঠ এমন ব্যক্তি যাঁকে লোকে উয়ায়েস বলবে এবং যার মাতা জীবিত থাকবে আর তাঁর শরীরে (কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন) সাদা থাকবে। এতএব তোমরা তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমাদের জন্য

---

১১২. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

১১৪. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯।

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।"[১১৫] হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সিফফিন যাত্রাকালে হযরত ওয়ায়েস করনি (র.) তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ৯ সফর ৩৮ হিজরি সনে সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। সিফফিনের পাশে তার মাজার এখনো 'মাকামে উয়ায়িস' নামে খ্যাত। তাঁর শাহাদাতের রাত এখনো 'লাইলাতুল হারির' (রেশম গৌরব রাত্রি) নামে আউলিয়া কুলে পালিত হয়। তাঁর নামানুসারেই 'উয়ায়সিয়া তরীকা' নামে একটা সূফী তরীকা এখনো জারি আছে।[১১৬] দ্বিতীয় স্তরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. হযরত ইমাম হাসান আল বসরী (রা.)
২. হযরত রাবেয়া বসরী (র.)
৩. হযরত হাব্বি আজমী (র.)
৪. হযরত হারীস মুহাসিবি (র.)
৫. হযরত মারুফ আল কারখী (র.)
৬. হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ (র.)
৭. হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (র.)
৮. হযরত উয়ায়েস আল-করনী (র.)
৯. হযরত দাউদ আততায়ী ফাজিল ইবনে ইয়াজ (র.)
১০. হযরত মালেক দীনার (র.) প্রমুখ।[১১৭]

তৃতীয় স্তর : সূফীবাদের নীতিমালা নির্ধারণ

সূফীবাদের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে হযরত ছাওবান বিন ইবরাহীম যুননুন মিশরী (র.) সুফীবাদকে 'মতবাদ' হিসেবে রূপ দান করেন। শুরু হয় আধ্যাত্মিকতার প্রচলন, আর রচিত হয় সূফীবাদ শিক্ষার উপর পুস্তকাদি এবং আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের (মা'রিফাত) মাধ্যমে কৃচ্ছতা সাধনা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া।[১১৮] হযরত যুননুন মিশরী (র.) ছিলেন একজন সূফী দার্শনিক। তিনিই সূফীবাদকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সুসংহত করেন। তাঁর মতে, "ইল্‌ম ও বুদ্ধিমত্তা আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে অপারগ; পক্ষান্তরে 'হাল' বা ভাবোচ্ছাসের মাধ্যমেই পরম যাতপাক আল্লাহকে উপলব্ধি করা সম্ভব।" তিনিই সূফী সাধনায় হাল বা

১১৫. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১১৬. মোফাখ্‌খারুল ইসলাম, *আদি তরিকাহ* (ঢাকা: সুরাইয়া সুলতান মুফলিহা, ১৯৮৮), পৃ. ১২৬।

১১৭. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১১৮. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত।

ভাবোচ্ছাসের ও মোকামের বা সাধনার স্তরের উদ্ভাবন করেন। তাঁর মতে, "যিনি আল্লাহতে যত বেশী আত্মবিলীন করে আত্মসমাহিত হতে পেরেছেন, তিনিই ততটুকু তাঁকে জেনেছেন।" মিশরের অধিবাসী হযরত যুননুন মিশরী (র.) পথপ্রদর্শকগণের অগ্রনায়ক, তত্ত্বজ্ঞানের সুক্ষদর্শী এবং সাধনার অলৌকিক শাক্তিসম্পন্ন মনীষী ও সূফীদের কুতুব ছিলেন। তিনি ২৪৫ হিজরী মোতাবেক ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ কবরস্থানের দিকে বহন করে নেওয়ার সময় অলৌকিক আযান ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তিনি ঐ সময় শাহাদৎ আঙ্গুল উঠিয়ে আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।[১১৯] এ যুগের আরেকজন বিখ্যাত সূফী হলেন জুনায়েদ বোগদাদী (র.)। তিনি সর্বপ্রথম সূফীবাদের সমস্ত নিয়ম-কানুনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংহতরূপে লিপিবদ্ধ করেন। জুনায়েদ বোগদাদী (র.) এর মতবাদ তার শিষ্য খুরাসানের আবু বকর শিবলী (র.) কর্তৃক পরিবর্ধন ও প্রচারিত হয়। জনসাধারণের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সদর্পে তিনি সূফী মতের গুঢ়তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।[১২০] সূফী সাধনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ তৃতীয় স্তরের সুফীসাধকগণ আল্লাহর সাথে আত্মার মিলনের প্রয়াসী ছিলেন। হযরত যুননুন মিশরী (র.) এর মতে শরীয়ত ও হাকীকত একই পদার্থের দু'টি দিক মাত্র। তাই হযরত যুননুন মিশরী হতে হযরত মহল বিন আব্দুল্লাহ মুস্তারী (র.) এর মাধ্যবর্তী সময়ের সূফী সাধকগণ শরীয়ত ও মারিফাত উভয় দিকের ওপর সমানভাবে গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু এ সময়ে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্ব আল্লাহবাদ মতবাদের সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটেনি। ওয়াহদাতুল ওজুদ মতবাদের সূচনার ইঙ্গিত এ যুগে বর্তমান ছিল। কিন্তু কোন পৃথক মতবাদ হিসেবে সে মতবাদ সূফী সাধনার ইতিহাসে সংযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি।[১২১] সূফীবাদের তৃতীয় স্তরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. হযরত আবু আলী শাকিক বলখী (র.)
২. হযরত ইব্রাহীম বিন আল-নায়জাম (র.)
৩. হযরত বাশার-ই-হাফী (র.)
৪. হযরত ইয়াহিয়া মায়াজ (র.)

---

১১৯. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১২০. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১২১. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৫. হযরত হাতাম আসাম বলখী (র.)

৬. হযরত সহল বিন আব্দুল্লাহ মুস্তারী (র.)

৭. হযরত আবুল হোসাইন নূরী (র.)

৮. হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.)

৯. হযরত আবু বকর শিবলী (র.)

১০. শেখ সিররী আস্-সিকতী (র.) প্রমুখ।[১২২]

চতুর্থ স্তর : ওয়াহদাতুল ওজুদ এর উন্মেষ

এ স্তরে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্ব আল্লাহবাদের উন্মেষ ঘটে। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)–এ মতবাদের প্রবক্তা এবং হযরত হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ (র.) এর সময়ে তা পরিপূর্ণতা পায়। হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) কে কেন্দ্র করেই সর্বখোদাবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তী সূফীগণের উপর এবং এরপর অধিকাংশ সূফীই এই সর্বখোদাবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।[১২৩] ওয়াহদাতুল ওজুদ মতবাদের মূল কথা, "সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব।" এ স্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী হলেন হযরত আবু ইয়াজিদ আল বোস্তামী (র.), যিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) নামে পরিচিত। তিনি পারস্যের অন্তর্গত বুস্তান শহরে জন্মগ্রণ করেন। সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) সূফী সাধনার মলুকে ফানা বা আত্মবিনাশ স্তরের প্রবর্তক। 'ফানা' আল্লাহয় আত্মসমাহিত হওয়ারই নৈয়ামিক পরিণতির হাল। তিনি বলেন, ''যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর মধ্যে নিজেকে ফানা করে আত্মসমাহিত করবে না, ততক্ষন পর্যন্ত সে কখনও আল্লাহ জ্ঞান লাভ করতে পারবে না।" ফানা ও আত্ম বিলুপ্তি সাধককে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে আল্লাহ ও বান্দায় স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে সামান্য নূরের পার্থক্য ব্যতীত আর কোন পার্থক্য থাকে না, যাত ও সিফাতের স্থুল পর্দা উঠে যায়। তিনি এ হালে অবস্থান করেই বলেছিলেন, ''আমিই সে পবিত্র, আমার অবস্থা কতই না মর্যাদাসম্পন্ন।" হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) সূফীবাদ ও নিজের হাল বা ভাবোচ্ছাস সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২৭১ হিজরী মোতাবেক ৮৭৪ খ্রীষ্টব্দে ইন্তেকাল করেন।[১২৪]

---

১২২. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১২৩. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১২৪. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

হযরত হুসাইন মুনসুর আল হাল্লাজ (র.) সূফী সাধনার ওয়াহদাতুল ওজুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর মতে, মানুষ মূলতই আল্লাহময়। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ তাঁর নিজের অনুরূপ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" হযরত হুসাইন মনসুর আল হাল্লাজ (র.) ফানাফিল্লাহর মাকাম অতিক্রম করে বাকা বিল্লাহ এর হালে পৌছে বলেন, ''আনাল হক" বা ''আমিই পরম সত্তা।" তাঁর এ ধরনের উক্তির হাকীকত বুঝতে না পেরে তদানীন্তন শরীআতপন্থী আলেমরা ফতোয়া দিয়ে তাঁকে ৩১০ হিজরী মোতাবেক ৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রানদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[১২৫]

হযরত হুসাইন মনসুর হাল্লাজ (র.)-কে হত্যার পর শরী'আতি উলামাগণ সূফীদের উপর আক্রোশে ফেটে পড়ে। কাজিদের হাত করে বিচারের নামে জেল, বেত্রাঘাত, মুরতাদ ও কাফের ফতোয়া দিতে থাকে। আবু ইসহাক শাসি চিশতি (র.) সে সময়কার একজন নামকরা সূফী সাধক ও প্রচারক ছিলেন। কাজির বিচারে বেত্রাঘাত দণ্ডে তিনি পাঁচদিন অজ্ঞান ছিলেন। এ শক্তিমান আউলিয়া থেকেই আজকের চিশতিয়া তরিকা প্রচলিত হয়ে এসেছে। এমনিভাবে সূফীদের উপর অত্যাচার নেমে আসে।[১২৬] অত্যাচার নিপীড়নের ফলে সূফীগণ প্রায় নিশ্চুপ হয়ে যান। তাঁদের সতর্ক উক্তিতে সাধনার গভীর ও গোপন আনন্দ অভিজ্ঞতার কথা সাধারণের মধ্যে অপ্রকাশ্য হয়ে থাকলো। সূফীসাধকদের ভাষাও হয়ে পড়ল অবগুণ্ঠিত এবং নানা ইঙ্গিত ও হেঁয়ালীপূর্ণ। এদিকে রক্ষণশীল মুসলমানরা সূফীগণকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে।[১২৭] সূফীবাদের চতুর্থ স্তরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. হযরত আবুল হাসান আল-আশারী (র.)
২. হযরত আবু নছর মুহাম্মদ আল-ফারাবী (র.)
৩. হযরত আবু ইসহাক শামী (র.)
৪. হযরত আবু তালিব মক্কী (র.)
৫. হযরত আবু বকর আল-কালাবাদী (র.)
৬. হযরত আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আসসুলামী (র.) প্রমুখ।[১২৮]

---

১২৫. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১২৬. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬।
১২৭. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সূফীদর্শন* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৪৩।
১২৮. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

পঞ্চম স্তর : কঠোর সাধনা, আধ্যাত্মিকতা ও ওয়াহদাতুল ওজুদের সমন্বিত রূপ

সূফীতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে সূফীগণ আধ্যাত্মিকতার সর্বশেষ ধাপ বা ফানাফিল্লাহ পর্যন্ত পৌছলেও সূফী তরীকাসমূহ তখনও সুসংবদ্ধ হয়নি। আর এই কাজটি হযরত আবু নসর আস-সররাজ (র.) থেকে শুরু হয়। তিনি তাঁর 'কিতাবুল লুমা' গ্রন্থে সূফীবাদের বিভিন্ন ধাপ, স্তর, হাল ইত্যাদির উল্লেখ করেন এবং তরীকার নিয়মাবলী সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। সূফী সাধনার ইতিহাসে তরীকতের প্রশিক্ষণের সূচনায় ও বিকাশে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[১২৯] এ স্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী হলেন হযরত ইমাম আবু হামিদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল গাযালী (র.)। তিনি সূফীবাদকে সর্বসাধারণের জনপ্রিয় করে তোলেন এবং একে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য ও অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে প্রমাণ করেন। তিনি শরিয়তের সাথে সূফী দর্শনের সমন্বয় সাধন করে প্রায় চারশত পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'এহ্ইয়া-উল-উলুমিদ্দীন', 'কিমিয়া-ই-সাআদাত', 'মিশকাতুল আনোয়ার' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইমাম গাযালী (র.) এর বলিষ্ঠ রচনাবলী ইসলামকে ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে রক্ষা করে। এ জন্য তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা 'ইসলামের প্রামান্য দলিল' বলা হয়। তিনি সূফীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দান করে শরিয়ত ও মারেফাতের মধ্যকার বিরোধ দূর করে মুসলিম দর্শনের পূর্ণতা সাধন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই সূফীবাদ সুন্নী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে।[১৩০] তাঁর মতে, আল্লাহকে লাভ করার ও মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় শরিয়ত ও মারেফাতের সমন্বিত পথ। তিনি কাশ্‌ফকেই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন এবং সূফীদের হাল বা তন্ময়তার ভাবকে এক ধরনের প্রত্যাদেশ (ওহী) বলে মনে করেন। ইমাম গাযালি (র.) এর অসামান্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সে যুগে বহু সূফী সাধক, পীর, ফকীর ও আউলিয়া আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইসলামের ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয় সূফীতত্ত্ব।[১৩১] পঞ্চম স্তরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. হযরত ইমাম আবুল কাসেম আল কুশাইরী (র.)
২. হযরত আবুল হাসান মখদুম আলী আল হুজাইরী দাতাগঞ্জ বখশ (র.)

---

১২৯. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১৩০. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।
১৩১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩. হযরত শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.)

৪. হযরত আবু বকর কালাবাদী (র.)

৫. হযরত মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী (র.)

৬. হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.)

৭. হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.)

৮. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.)

৯. হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)

১০. নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.) প্রমুখ।[১৩২]

ষষ্ঠ স্তর : ওয়াহদাতুল ওজুদ এর তাত্ত্বিক রূপ

ষষ্ঠ স্তরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত সূফীসাধক হলেন মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.)। স্পেনিয় বিশ্ববিখ্যাত যুক্তিবাদী সূফী দার্শনিক হযরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) সূফী চিন্তাধারাকে পূর্ণতত্ত্ব ও দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) ও হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) এর আভাসে ইঙ্গিতে বলা সর্বেশ্বরবাদকে তিনি তাঁর ‘ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ’ তত্ত্বে বিস্তারিত পর্যলোচনা করে দার্শনিক ভিত্তিতে উপস্থাপন করেন।[১৩৩] ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ মতবাদের মূলকথা হলো, এ বিশ্বজগত আল্লাহর বিকশিত রূপ এবং আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই, সবই আল্লাহর প্রকাশ। বাহ্য এবং অন্তর সকল প্রকাশই হচ্ছে সত্তাস্বরূপ এবং সত্তাই হচ্ছে অস্তিত্ববান। সৃষ্টিকে আলাদা সত্তা হিসেবে ধরলে দুটো সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আর তাই তিনি দ্বিতীয় কোন সত্তার সম্ভাবনাকে নির্মূলের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এ দর্শনের বুনিয়াদ নীতি হচ্ছে আল্লাহই সকল সত্তার ঐক্য। ইবনুল আরাবীর এই মতাদর্শের প্রভাব পরবর্তী প্রায় সকল সূফী সাধকের উপরই কমবেশী প্রভাব ফেলে।[১৩৪] দার্শনিক, নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে তিনি ঐক্য স্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ মতবাদে সত্তার ঐক্যের ধারণা মূলত দার্শনিকদের জ্ঞানমূলক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের ধর্মীয় চেতনার সংমিশ্রনে

---

১৩২. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৩৩. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।

১৩৪. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

গঠিত। তাই 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদ বুঝতে হলে প্রথমেই দার্শনিক চেতনার ঐক্যনীতি এবং ধর্মীয় চেতনার পরম সত্তা বা আল্লাহর প্রকৃতি বুঝতে হবে।

হযরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) গদ্য ও পদ্য উভয়বিদ রচনাতেই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত ২৯০টি গ্রন্থের মধ্যে 'আল-ফতুহাতুল মক্কিয়া' ও 'ফুসুস-উল-হিকাম' গ্রন্থদ্বয় জগৎ বিখ্যাত। এ দুটি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সূফীসাধনার ইতিহাসে তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় এবং একারনেই তাঁকে 'শায়খুল আকবর' বলা হয়। স্পেনের মার্সিয়ায় জন্মগ্রহণকারী এ মহান সূফী ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১৩৫] ষষ্ঠ স্তরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. হযরত শরফুদ্দীন আবূ হারস ওমর ইবনুল ফরিদ (র.)

২. হযরত জালালুদ্দীন রুমী (র.)

৩. হযরত শায়েখ সদরুদ্দীন কোনাভী (র.)

৪. হযরত ফখরুদ্দীন ইরাকী (র.)

৫. হযরত শেখ মুসলেউদ্দীন সাদী (র.)

৬. হযরত সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ শাবিস্তারী (র.)

৭. হযরত শামস তিবরিজী (র.)

৮. হযরত শামছুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ সিরাজী (র.)

৯. হযরত আব্দুল করিম ইবনে ইব্রাহীম আল জিলী (র.)

১০. হযরত নূর উদ্দীন আব্দুর রহমান জামী[১৩৬] প্রমূখ।

সপ্তম স্তর : ওয়াহদাতুশ শহুদ

হযরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) এর 'ওয়াহদাতুল ওজুদ'-এর দৃষ্টিকোণকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন হযরত কাযী রকনুদ্দীন আলাউদৌলা (র.)। তিনি সর্বখোদাবাদকে অনৈসলামিক ভাবধারা বলে অবহিত করেন এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে দ্বৈতসত্তা রূপে প্রচার করেন। এ চিন্তাধারাকে 'ওয়াহদাতুশ শহুদ' বা 'শহুদিয়া' বলা হয়। তাঁর মতে, জগত আল্লাহর চিন্তাস্বরূপ, তাঁর থেকে জগৎ নিঃসৃত নয়। আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের ভেতরে

---

১৩৫. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

১৩৬. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

আছেন। শাহুদিয়া মতাদর্শকে আরো গতিশীল করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ বুখারী (র.)। তিনি শহুদিয়া মতের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শহুদিয়া দৃষ্টিকোণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। পাক-ভারত বাংলাদেশের বিখ্যাত সূফী সাধক হযরত শেখ আহমদ সারহিন্দী (র.) এই চিন্তাধারাকে পূনরুজ্জীবিত করেন। তিনি 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফ–সানী' বা 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক' নামে খ্যাত। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ওয়াহদাতুশ শহুদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন।[১৩৭] তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বের ঘোর সমালোচক ছিলেন। তাঁর সমালোচনার ফলেই সূফী সাধকদের মধ্যে ওজুদিয়া ও শহুদিয়া চিন্তাধারা নিয়ে এক বিরাট কলহের সৃষ্টি হয় এবং একদল অন্য দলকে কাফির, যিন্দিক, ফাসিক প্রভৃতি অকথ্য বাক্যে গালাগালি করতে থাকে যা আজো অব্যাহত আছে। এতে সূফীবাদের সৌম্য শান্ত, ভাব-গম্ভীর ও স্নিগন্ধ পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে পড়ছে।[১৩৮]

অষ্টম স্তর : 'ওজুদিয়া' ও 'শহুদিয়া'-এর সমন্বয়

অষ্টম স্তরের প্রখ্যাত সূফী ছিলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.)। তিনি একজন সমন্বয়পন্থী আলিম ও সূফী। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ (ওজুদিয়া) ও ওয়াহদাতুশ শহুদ (শহুদিয়া) সূফীজগতের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এই দুই বিরোধী চিন্তাধারাকে তিনি একই উপলব্ধির দুটি আবশ্যম্ভাবী অবস্থা (হাল) হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে এ দু'য়ের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, উপলব্ধির গভীরে দুই মিলিত হয়েছে একই বিন্দুতে। একারণেই তিনি যতটা না সূফী হিসেবে পরিচিত তাঁর চেয়ে বেশী পরিচিত হয়েছিলেন সূফীগণের বিতর্কিত সমস্যাবলীর সমাধানকারী বা সমন্বয়কারী হিসেবে। তিনি ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যা সম্বলিত চারটি মাযহাবের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, সেগুলোরও সামঞ্জস্য বিধানকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[১৩৯] এ সময় ভারতীয় উপমাহাদেশে আর একজন মহা চিন্তা নায়কের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল। তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (র.) এর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সূফীসাধকগণ জগত–জীবন–সৃষ্টি–স্রষ্টার এবং আত্মার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা স্বীকার করে

---

১৩৭. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৩৮. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

১৩৯. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

তাঁর ক্ষুরধার কাব্য ও লেখনী রচনা করেছেন। তিনি প্রেমতত্ত্ব স্বীকার করে সর্ব আল্লাহবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ না বলে সর্বধরেশ্বরবাদ বলেছেন। তিনি ফানাতত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁর রচিত 'আসরারে খুদি', 'রুমুজে বেখুদি', 'জাবিদ নামা' গ্রন্থ মুসলিম দর্শনের অমূল্য সম্পদ। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১৪০]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) এর পরবর্তী সূফীগণের প্রায় সকলেই ছিলেন সমন্বয়পন্থী। যেমন হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন ফখরে জাহা (র), হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), হযরত শাহ সাদিক আলী চিশতী (র.) প্রমুখ ওজুদিয়া ও শহুদিয়ার সমন্বয় পন্থী সূফীসাধক হিসেবে কাজ করেছেন।[১৪১]

বিভিন্ন সূফী তরীকা (Variations of Sufism)

'তরীকত' শব্দটি 'তারীক' শব্দ থেকে উদ্ভুত। 'তারীক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'জনপথ' বা 'রাস্তা' এবং 'তরীকত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ পথচলার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়মাবলী, পদ্ধতি, প্রণালী, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, দিশা, দিশারী প্রভৃতি। পথচলার নির্দেশনা অনুযায়ী যে পথ ও মত অবলম্বন করে পরম প্রেমময় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন করা যায়, তাঁরই সন্দর্শন লাভ করা যায়, তাকেই সূফীবাদের পরিভাষায় তরীকত বা তরীকা বলা হয়।[১৪২] ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকেই সমস্ত তরীকার উদ্ভব এবং তিনিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস বলে মনে করা হয়। আজকের মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার তরীকা ও উপ-তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এগুলো মূল তরীকাসমূহ থেকেই উদ্ভুত হয়ে বিভিন্ন ধারা, উপধারা, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। অবশ্য কিছু কিছু তরীকা ইতিমধ্যে অবলুপ্তও হয়ে গেছে। এসব তরীকার বিভিন্ন পীর পরস্পরায় আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত তরিকার সিলসিলা অনুসৃত। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন ধারার তরীকাগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রায়

---

১৪০. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

১৪১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৪২. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

তিন শতাধিক প্রচলিত তরীকার মধ্যে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এবং নকশ-বন্দিয়া তরীকা সমধিক প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত।[১৪৩]

কাদেরিয়া তরীকা

হযরত মহী-উদ-দীন শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (র.) কাদেরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই তরীকার ইমাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুব, তাঁকে গাউসুল আযম বলা হয়ে থাকে। তিনি ১০৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ/৪৭০ হিজরী সালে পারস্যের জিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে ভাষাতত্ত্ব ও মুসলিম আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খাইর মোহাম্মদ বিন মুসলিম দব্বাসের নিকট তাসাউফের শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কাজী আবু সা'দ মোবারক আল-মুখর্‌রমীর নিকট থেকে 'খিরকা' বা সূফীদের বিশিষ্ট পরিধান লাভ করেন। তিনি ধর্ম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে (১) আল-গুলইয়া লি–তালিবি তারীক আল হক্ক (২) আল-ফতহুর রব্বানী (৩) ফুতুহ-উল-গাইব (৪) জলা-উল-খাতির ইত্যাদি বিশেষ প্রশিদ্ধ। এই কিতাবগুলিতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) আইনবিদ হিসেবে বিশেষ সৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি একটি খানকাহ্‌ও প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা ও খানকাহ্ উভয়ই ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়।[১৪৪] তিনি ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ নগরীতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারেই তাঁর উদ্ভাবিত ও প্রচারিত তরীকার নাম হয় কাদেরিয়া তরীকা। স্বয়ং রাসূলে খোদা (সা.) থেকে শুরু করে তরীকাতে খেলাফত প্রাপ্ত সপ্তদশ পুরুষ ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানী (র.)[১৪৫] কাদেরিয়া তরীকা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা এই তরীকা সারা মুসলিম জাহানে বিস্তার করে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং পাক–ভারত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীয়া তরীকা অত্যান্ত জনপ্রিয়।

---

১৪৩. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৪৪. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ* (ঢাকা: নওরোজ বিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৩৮-৩৯।

১৪৫. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

কাদেরিয়া তরীকার সূফীরা বাগদাদে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর দরগাহের খাদেমকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা রূপে মান্য করে।[১৪৬] কাদেরীয়া তরীকার বহু উপ তরীকা রয়েছে। এর মধ্যে কাশনাজানি তরীকা ধারনা করা হয় ইরাকে প্রচলিত তরীকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ তরীকা।[১৪৭]

কাদেরিয়া তরীকামতে সাধনা

এই তরীকার পীর মুর্শিদগণ তাঁদের শিষ্যদের মন-মানসিকতা ও অবস্থাভেদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর কিছু কিছু নির্ধারিত ওযীফা বাতলিয়ে থাকেন। বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দরুদশরীফ পাঠ করারও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। মুরাকাবা–মুশাহিদায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পদ্ধতিও বলে থাকেন। বিশেষ নিয়মে নফী–ইসবাত[১৪৮] এর যিকির এই তরীকায় প্রচলিত আছে। এই যিকিরের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নফী ইসবাতের যিকির করার বিশেষ নিয়ম হলো–উচ্চারণকালে শ্বাসগ্রহণ করা এবং বলার সময় শ্বাস ত্যাগ করা। মুরীদদের মনের অবস্থা অনুযায়ী এবং হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে ও পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা ভেদে যিকরে জলী (সজোরে যিকির) এবং যিকরে খফী (নিঃশব্দ যিকির) উভয় স্বরেই যিকির করার নিয়ম এই তরীকায় প্রচলিত রয়েছে। সম্মিলিত বা সমস্বরেও এই তরীকার মুরিদগণ যিকির করে থাকেন। কাদেরিয়া তরীকাভুক্ত জুনায়েদিয়া উপতরীকা মতে সামার[১৪৯] প্রচলন রয়েছে। এই তরীকামতে চিল্লাকুশীর রেওয়াজও রয়েছে।[১৫০]

এই তরীকার খাস তা'লীম হল কালেমা শরীফ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর **১২**টি হরফ। কেননা এই বার হরফের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। তাওহীদের প্রকৃত রূপও এই কালেমার মধ্যেই নিহিত। যিনি এই কালেমার রহস্য জানেন, তিনি আরিফ-ই-রাব্বানা ও ওলীয়ে কামিল এর মর্যাদায় আসীন হন।[১৫১] হযরত আব্দুর কাদের জিলানী (র.)

---

১৪৬. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৪৭. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৪৮. নফী অর্থ– নিজের ইচ্ছা–অনিচ্ছাকে দূর করে দেওয়া। এছবাত অর্থ– আল্লাহর ইচ্ছাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর যিকিরের ক্ষেত্রে 'লা ইলাহা;কে নফী এবং 'ইল্লাল্লাহ'কে ইসবাত বলে।

১৪৯. সামা– আল্লাহপ্রেমমূলক সঙ্গীতকে সামা বলে।

১৫০. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

১৫১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

রচিত, 'ফুয়ুদত আল-রব্বানীয়া' গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদেরীয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে দিনে রোজা রাখতে এবং রাত্রে আল্লাহর উপাশনায় মশগুল থাকতে আদেশ দেওয়া আছে। এই অবস্থায় তাঁকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময় যদি কেউ এসে তাঁকে বলে, "আমি খোদা" তাকে উত্তর দিতে হবে যে, 'না তুমি আল্লাহর মধ্যে।' যদি শিক্ষানবিশের সত্যতা প্রমাণের জন্যই এ্ই মূর্তি এসে থাকে তাহলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি অদৃশ্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁর শিক্ষানবীসকাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদেরিয়া তরীকার আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন।[১৫২]

চিশতিয়া তরীকা

চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, হয়রত আলী (রা.) এর অধঃস্তন নবম পুরুষ আবু ইসহাক (র:) এশিয়া মাইনর থেকে হিযরত করে খোরাসানের চিশ্‌ত নামক একটি গ্রামে বসবাস করেন। অন্য পণ্ডিতদের মতে বন্দা নওয়াজ কর্তৃক এই তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারো কারো মতে, চিশ্‌তের খাজা আহমদ আবদাল (মৃত ৯৬৫-৬৬ খৃ.) এই তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫৩]

প্রকৃতপক্ষে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র:) ছিলেন চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তরীকার ইমাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুব। তাঁকে গরীবে নেওয়াজ, গাওসে সামদানী, মুহীয়ে সুন্নতি প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। তিনি পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং 'আফতাব-ই-মুলক-ই-হিন্দ' অর্থাৎ 'হিন্দুস্থানের সূর্য' উপাধিতে ভূষিত হন। কাদেরিয়া ও চিশতিয়া–এ উভয় তরীকারই উদ্ভব হযরত আলী (রা.) থেকে। চিশতিয়া তরীকার শাজরা[১৫৪] অনুসারে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা.)–এর মাধ্যমে হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) খেলাফত প্রাপ্তির সপ্তদশ খলিফা।[১৫৫]

---

১৫২. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

১৫৩. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৫৪. শাজরা হল– একজন ত্বরিকত পন্থী যাদের মাধ্যমে ত্বরিকত পেয়েছেন তাদের সিলসিলা বা পরস্পর নামসমূহের ধারাবাহিকতা। এর মূলে রয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং এর শাখায় রয়েছেন নিজ পীর মুর্শিদ।

১৫৫. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

চিশতিয়া তরীকার ইমাম ও কুতুব হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) ৫৩৭ হি./১১৪২ খ্রিষ্টাব্দে[১৫৬] ইরাকের মোসুল নগরীর পশ্চিমে সিন্‌জার নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন।[১৫৭] তাঁর পিতা গিয়াসউদ্দিন চিশতী একজন উঁচু মাপের আলেম ও আরেফ ছিলেন। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) ১৪ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর বংশজাত সৈয়দ।[১৫৮] সংসারে অনাসক্ত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) খোরাসানের কয়েকটি শহর ঘুরে অবশেষে বাগদাদে এসে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি কয়েকজন বিখ্যাত সূফী যেমন, নিজামউদ্দীন কুবরা (র.), শাহীবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) এবং আউহাদউদ্দীন কিরমানীর (র.) সঙ্গে পরিচিত হন ও তাদের সান্নিধ্যে আসেন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী 'তারাইনের যুদ্ধে' জয়লাভ করে দিল্লী অধীকার করেন এবং পাক-ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পাক-ভারতে আগমন করেন। তিনি প্রথমে দিল্লী আসেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আজমীরে গমন করেন। সেখানে খানকাহ স্থাপন করে তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তিনি আজমীরেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেন এবং ১২৩৬ খ্রি. আজমীরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজমীরে তাঁর দরগাহ তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।[১৫৯]

চিশতীয়া তরীকার সাধনা

আনাসির–এ খামসা (পঞ্চভূত) চিশতীয়া তরীকার একটি বিশেষ সাধনা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে হযরত আলী (রা.), হযরত আলী (রা.) থেকে হযরত হাসান বসরী (রা.) এই তালীম লাভ করেন। সিনা-ব-সিনায়[১৬০] চলে আসা এই তালীম হযরত উসমান হারুনী (রহ.)-ও লাভ করেন। এই তালীমগুলো লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেন। এই তরীকা মতে আব, আতশ, খাক,

---

১৫৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০০), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩।

১৫৭. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ার-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

১৫৮. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

১৫৯. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৬০. সিনা-ব-সিনা–সূফী সাধনায় মানবদেহে রয়েছে লতিফা বা ফায়েজ লাভের সূক্ষ্ম স্থানসমূহ। মুর্শিদগণ তাদের শিষ্যদেরকে এ সমস্ত লতিফা জারি করায়ে ফায়েজ লাভের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। লতিফার ও ফায়েজ প্রদানের প্রশিক্ষণকে সিনা-ব-সিনা তালিম বলা হয়।

বাদ যথাক্রমে পানি, আগুন, মাটি, বায়ু এবং নূর (জ্যোতি)-কে আনাসির-এ খামসা বা পঞ্চভূত নামে অভিহিত করা হয়। সমুদয় জগতের মূল উৎস এই পঞ্চভূত। এটাকে 'মান আরাফা নাফসাহু'র তালীম ও বলা হয়। এই তালীমের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত কেউ চিশতিয়া তরীকায় সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। এই তরীকাতেও নোক্তা বিহীন বার হরফ বিশিষ্ট কালিমার যিকর করা হয়। এ তরীকা মতে, যিকরের নিয়ম হলো তাহাজ্জুদ নামাজের পর চারজানু হয়ে বসে অতীত পাপের কথা স্মরন করে ১১ বার ইস্তিগফার পাঠ করতে হয়। অতঃপর ১০ বার দরুদ শরীফ, তারপর ১২ তাসবীহর যিকির করতে হয়।[১৬১] চিশতীয়া তরীকা মতে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর বিভিন্ন রকম ওযীফা এবং মুরাকাবা-মুশাহিদার নিয়ম-কানুনও প্রচলিত রয়েছে। চিশতীয়া তরীকার কোন কোন উপ-তরীকা মতে সামা বা ঐশী প্রেমের গান-গযলের প্রচলন ও রয়েছে। কোন কোন আশেক সামাকে আত্মার খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। এ তরীকায় চিল্লাকুশীর প্রচলন রয়েছে। নির্জনে আল্লাহর প্রেমে ধ্যানমগ্ন থাকার নামই চিল্লাকুশী।[১৬২]

নকশ্‌বন্দীয়া তরীকা

নকশবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত খাজা মুহাম্মদ বাহা-উদ-দীন নকশ্‌বন্দ আল বুখারী (র.)। তিনি এই তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ও কুতুব ছিলেন। তিনি তুর্কীস্থানের অধিবাসী। ৭০৮ মতান্তরে ৭১৮ হিজরী সালে বোখারায় তিনি জন্মগ্রহন করেন। তিনি শহুদিয়া তরীকাপন্থী সাধক ছিলেন। তাঁর তরীকা মতে, তরীকতের চেয়ে শরীয়তের উপরই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। তিনি যখন তরীকত সাধনার উচ্চমার্গে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি যেদিকেই তাকাতেন, সেদিকেই 'আল্লাহ' শব্দটির অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতো। সম্ভবত এই থেকেই তাঁর উদ্ভাবিত তরীকার নাম হয় নকশ্‌বন্দিয়া তরীকা, অথবা তিনি নকশা করা কাপড় বয়ন করতেন বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার নামকরণ করা হয় নকশবন্দিয়া তরীকা। তাঁর বংশগত কারুকার্য পেশা থেকেও এই পদবী আসতে পারে। হযরত খাজা বাহা-উদ-দীন নকশ্‌বন্দ (র.) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুরু করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত সালমান ফার্সী (র.) প্রমুখের মাধ্যমে খেলাফত প্রাপ্তির চতুর্বিংশ বা ২৪

১৬১. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

১৬২. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

তম খলীফা ও ইমাম ছিলেন। তিনি ১৩৮৮ খ্রী. ৭৯২ হি. সালে বোখারায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার বোখারার 'কাসর-এ আরেকান' নামক স্থানে অবস্থিত।[১৬৩]

নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সাধনা
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) যে গুপ্ত ইলম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার মাধ্যমে আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। এই তরীকার গুরুত্বপূর্ণ তালিম হলো, ছয় লতীফা এবং চতুর্ভূত তথা আব-আতশ-খাক-বাদ অর্থাৎ পানি, আগুন, মাটি, ও বাতাশ প্রভৃতির উপর মুরাকাবা করা। ছয় লতিফা হলো, ক্বালব, রূহ, নফস, সির, খফী ও আখফা প্রভৃতির উপরে সাধনার প্রতিক্রিয়া ঘটনো। এছাড়াও রয়েছে পঞ্চহাযরা তথা সায়ের ইলাল্লাহ, সায়ের ফিল্লাহ, সায়ের আনিল্লাহ, আলম–এ মিসাল, আলম–এ শাহাদাত প্রভৃতির উপর মুরাকাবা করার নিয়ম পদ্ধতিও এই তরীকা মতে রয়েছে। এসব তালিম লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না। হযরত বাহা-উদ-দীন নকশ্‌বন্দ তা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এই তরীকার সূফী সাধকগণ মূলতঃ আহাদিয়াত, ওয়াহাদাত ও ওয়াহেদিয়াত এই তিন স্তরে পরিভ্রমন করেন।[১৬৪] নকশ্‌বন্দিয়া তরীকামতে নিম্নস্বরে যিকির স্বীকৃত। এই তরীকার কোন কোন উপ-তরীকায় সামা জাতীয় গান-গজলের প্রচলনও রয়েছে। নকশ্‌বন্দিয়া তরীকামতে নিন্মোক্ত বিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সকল তরীকাপন্থীর জন্য তা গ্রহনীয়। যথা :

১. **হুশ দর-দম :** শ্বাস-প্রশ্বাসের হুশিয়ারী অর্থাৎ কোন একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন আল্লাহর যিকর হতে খালি না যায়। শ্বাস ফেলার সময় 'লা ইলাহা' এবং গ্রহণের সময় 'ইল্লাল্লাহ' খেয়ালের সাথে কলবের উপর যবর করতে হয়। একে পাস্‌-আন্‌ফাস যিকর বলা হয়। হাটতে, উঠতে, বসতে, নির্জনে, জনসমাজে, নীরবে কথায়, অযু ও বে-অযু, শয়নে-বিশ্রামে অথবা কার্যরততায়, সর্বাবস্থায় এ যিকর করতে হয়। নিশ্বাস যেমন বন্ধ থাকবে না তেমিন যিকরও বন্ধ থাকবে না।
২. **নজর বর কদম :** চলাফেরার হুশিয়ারী অর্থাৎ পথ চলবার সময় নজর পায়ের দিকে রাখতে হয় কেননা এদিক-ওদিক তাকালে মনের খেয়াল এদিক-ওদিক চলে যায় এতে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়।

---

১৬৩. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৬৪. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৩. **সফর দর ওয়াতন :** স্বদেশে থেকে বিদেশ ভ্রমণ। যেমন সালিক নিজ পশুপ্রবৃত্তিগুলির কুপ্ররোচনা হতে অব্যাহতি লাভ করে। যাতে স্বীয় কুস্বভাবগুলি পরিত্যাগ করে দুনিয়ার মোহমুক্ত হয়ে এ দুনিয়াতে থেকেও ফেরেশতার স্বভাব অর্জন করে আল্লাহময় রাজ্যে ভ্রমণ করে।

৪. **খালওয়াতে দর আঞ্জুমান :** সবার থেকে নির্জন বাস। যদিও সাধক জনসমাজে বসবাস করে কিন্তু মন থাকবে আল্লাহর দিকে। যেমন কম্পাসের কাঁটা যতই ঘোরানো হউক না কেন সর্বদা উত্তর দিকেই থাকে। সংসারের যাবতীয় কাজের মধ্যেও মনটা সংসার মুক্ত থাকতে হবে।

৫. **ইয়াদ কদর :** যিকরে লিসানির সাথে কলবি-যিকর জারি থাকা। অর্থাৎ আলস্য এবং অমনযোগিতা পরিহার পূর্বক মুখের যিকরের সংগে দিলের যিকরে লিপ্ত থাকা যাতে যিকরের দ্বারা হৃদয়ে শান্তি উৎপন্ন হয়।

৬. **বাযগ্ দাশত :** আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর মকসুদ ত্যাগ করা। অর্থাৎ সাধক যখন যিকরে লিপ্ত হবে তার উদ্দেশ্য হবে 'লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ' (একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অপর কোন উদ্দেশ্য নাই) কামিনী-কাঞ্চনের, আওলাদ সম্পদের ইত্যাদি কোন কিছুর প্রতি মোহ থাকবে না। জাগতিক কোন উদ্দেশ্য বা মোহ যেন আল্লাহর যিকর হতে গাফিল করতে না পারে সালিককে তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭. **ইয়াদ দাশত :** নিঃশব্দে আল্লাহর সাথে দিলের সংযোগ সাধন অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে, পলে-বিপলে প্রত্যেক অবস্থায় আত্মাকে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকা।

৮. **ওকুফে যামানী :** নিজ অবস্থার প্রতি সজাগ থাকা। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ভালমন্দের বিচার করে সাবধানতা অবলম্বন করা। সুখে-দুঃখে, রোগে–শোকে, ধনে-নির্ধনে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর হক আদায়ে সজাগ থাকা।

৯. **ওকুফে আদাদী :** বেজোড় যিকর করা। নফী-ইসবাতের যিকরের সময় বেজোর সংখ্যার প্রতি খেয়াল করা, যেমন– ১০১,১০০১ ইত্যাদি।

১০. **আকুফে কলবী :** দিলে অবিরাম যিকর জারি থাকা অর্থাৎ নিজ দিলের প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন দিলের মধ্যে প্রতিটি স্পন্দনে আল্লাহর যিকর নি:শব্দে জারি থাকে। তাছাড়া বাজে কথাবার্তা বা খেয়াল যেন দিলে না আসে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।[১৬৫]

মুজাদ্দেদিয়া তরীকা

মুজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শেখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ–ই–আলফ-সানী (র.)। তিনি এই তরীকার প্রবর্তক বা সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ও কুতুব। তিনি হিযরী দ্বিতীয় সহস্রের প্রারম্ভে তাঁর সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন বলে তাঁকে ‘মুজাদ্দিদ–ই– আলফ-সানী’ বা ‘দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক’ বলা হয়। তিনি ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তার পুত্র সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মবাদী বিভিন্ন তরীকাসমূহের সংস্কার সাধন করেন। এ সব সংস্কার সাধনের সংগ্রাম থেকেই তাঁকে মুজাদ্দেদ-এ আলফেসানী বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নাকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সংস্কৃত রূপ। এই তরীকার ইমাম হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দ (র.) নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শেখ খাজা মুহাম্মদ বাহা-উদ-দীন মুহাম্মদ নকশবন্দ আল-বুখারী (র.) এরই খলিফা ও মুরীদ ছিলেন। তিনি ১৫৬১ খ্রি./৯৭১ হি. সালে ভারত বর্ষের ‘সিরহিন্দ’ নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা হযরত মাখদুম আবদুল আহাদ (র.) একজন উচ্চস্তরের ওলী ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার পর ১৭ বছর বয়সে চিশতীয়া তরীকার দীক্ষা নেন। কাদেরীয়া তরীকা মতেও তিনি দীক্ষা নেন এবং পরিশেষে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহর নিকট নকশবন্দিয়া তরীকা মতে বাইয়াত গ্রহণ করেন ও খেলাফত লাভ করেন। তিনি ১৬২৪ খ্রী./১০৩৪ হি. সালে ইন্তিকাল করেন। ভারতের সিরহিন্দ নামক স্থানে আজও তার সমাধি রয়েছে। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুরু করে শাজরা পরম্পরায় ৩২তম খলীফা ও ইমাম ছিলেন।[১৬৬]

---

১৬৫. ডা: কাজী আবদুল মোনয়েম, *ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ৬১-৬২।

১৬৬. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০।

মুজাদ্দেদিয়া তরীকার সাধনা

মূলত মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নকশ্‌বন্দিয়া তরীকা থেকেই উদ্ধৃত। তাই উভয় তরীকার সাধন-ভজন প্রায় একই রূপ। যেহেতু উভয় তরীকার উৎসমূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত সালমান ফার্সী থেকে মুজাদ্দেদিয়া তরীকা মতে ছয় লতীফা, আনাসিরে আরবা বা চতুর্ভূজ এবং পাঁচ হাযরার মুরাকাবা বা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। হযরত খাজা আহমদ আলফ–সানী (র.) পঞ্চ হাযরাকে নতুন পদ্ধতি সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন নকশ্‌বন্দিয়া তরীকা মতে সায়ের ইলাল্লাহ, সায়ের ফিল্লাহ এবং সায়ের আনিল্লাহর স্থলে হযরত মুজাদ্দিদ–ই–আলফ–সানী (র.) কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন করেছেন। তিনি সায়ের ইলাল্লাহকে বেলায়তে কুবরা (বৃহত্তম বেলায়ত) নাম দিয়েছে। আহদিয়াতের স্তরকে তিনি পূর্বেকার স্তর থেকে ১৬/১৭টি স্তরের ঊর্ধ্বস্থিত স্তর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বেলায়তে উলিয়া বা ঊর্ধ্বস্থিত বেলায়তকে তিনি নবুয়তের পর্যায়ভুক্ত স্তর বলে মন্তব্য করেছেন। সালেক উপরোক্ত ১৬/১৭টি মকামের মধ্যে দিয়ে ওয়াহদাতের স্তর অতিক্রম করে বাকাবিল্লাহ্ বা কায়মিয়াত হাসিল করেন।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী কর্তৃক নকশ্‌বন্দিয়া তরীকায় এইরূপ সংস্কার সাধনের ফল থেকেই এই তরীকা মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নামে আখ্যায়িত হয়। তাঁর দ্বারা পরিবর্তিত ও প্রচলিত কাদরিয়া এবং চিশতীয়া তরীকাকেও যথাক্রমে ‘কাদরিয়া-মুজাদ্দেদিয়া’ ও ‘চিশতিয়া-মুজাদ্দেদিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ তিনি এই উভয় তরীকাতেও সংস্কার সাধন করেন। এরূপ সংস্কার সাধনের ফল থেকেই তিনি ওয়াহেদাতুশ শুহুদিয়া পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। তিনি যিকরে জলী সমর্থন করেন নি। তিনি যিকরে খফী বা নিম্নস্বরের যিকিরের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐশী প্রেমমূলক সামা-সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মুজাদ্দেদিয়া তরীকা থেকে বিভক্ত কোন কোন উপ-তরীকামতে যিকরে জলীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বাদ্যযন্ত্রহীন হামদ্‌নদকে সমর্থন করা হয়েছে।[১৬৭]

সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকা

হযরত শায়খ নজিব-উদ-দীন আব্দুল কাদির (র.) সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জিবালের অন্তর্গত সোহরাওয়ার্দ নগরে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে

১৬৭. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-২৯৮।

ইন্তেকাল করেন।[১৬৮] তিনি নিজামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হাদিস শাস্ত্রে বিশেষভাবে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপরে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শাহাব-উদ-দীন উমর বিন আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (র.) এই তরীকার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, শাহাব-উদ-দীনই সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। অনেক দূর দূরান্ত থেকে শ্রোতারা তাঁর আলোচনা শোনার জন্য তাঁর খনকাতে আগমন করত। মুসলমান শাসকগণ ও তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তিনি ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা শরীফে গমন করলে সেখানে মিশরের বিখ্যাত সূফী উমর বিন ফরীদ (র.) এর সংস্পর্শে আসেন। শায়খ শাহাব-উদ-দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) সূফীতত্ত্ব বিষয়ে 'আওয়ারিফ-উল-মুআরিফ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬৯]

হযরত শিহাব-উদ-দীন আবু আমর উমর বিন আবদুল্লাহ আল-সোহরাওয়ার্দী (র.) এর পিতা হযরত আবু নাসির (র.) একজন প্রখ্যাত কামেল পীর ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তরীকা মূলত: কাদরিয়া তরীকা থেকে উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকার তালীম অনেকটা কাদরিয়া তরীকার মতই।[১৭০]

কলন্দরিয়া তরীকা

কলন্দরিয়া তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পানিপথ নিবাসী হযরত শাহ-বু-আলী কলন্দর (র.)। তিনি ১৩২৪ খ্রিষ্টব্দে মৃত্যুবরন করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই তরীকার প্রসার সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে সর্বজাতীয় তরীকাপন্থী সূফী দরবেশগণ কলন্দর নামে অভিহিত হতে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, কলন্দরিয়া কোন নতুন তরীকার নাম নয়, বরং এটা চিশতিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভুত একটি উপ-তরীকা। আবার কেউ কেউ এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন স্পেনের হযরত শেখ ইউসূফ (র.)-কে। আবার কেউ কেউ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন পারস্যের হযরত শেখ জালাল উদ-দীন সাওয়াইজী (র.)-কে। তবে ভারতবর্ষে এই তরীকার প্রবক্তা ছিলেন হযরত শরফ উদ-দীন বু-আলী কলন্দর (র.)। এই

---

১৬৮. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১৬৯. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

১৭০. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

তরীকাভুক্ত কোন কোন পীর ফকীর তাঁদের হাতে পায়ে লোহার চুড়ী বা রিং পরিধান করে থাকেন। তাঁরা চুল, দাড়ি ও গোঁফ সব মুড়িয়ে ফেলেন। আবার তাদের কেউ কেউ চুল, দাড়ি-গোঁফ কোন দিনও কাটেন না। তাঁরা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ছাড়া আর কোন রকম ইবাদত-বন্দেগীর পক্ষপাতী নন।[১৭১]

মূলত ভ্রাম্যমান ফকীরদিগকে 'কলন্দর' বলা হয়। অন্যান্য তরীকার মত এই তরীকার কোন বিশেষ নীতি ছিল কিনা সন্দেহ। কলন্দরদের কোন নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না, কোন বিশেষ বিধিব্ধ নীতি ছিল না, ধর্মীয় আইন বা সমাজের সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ সংস্রব ছিল না। কলন্দররা মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই ছিল।[১৭২]

মাদারীয়া তরীকা

হযরত বদী-উদ-দীন শাহ মদার (র.) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা আবু ইসহাক শামী (র.) সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি হযরত মুসা (আ.) এর ভাই হযরত হারুন (আ.) এর বংশধর ছিলেন। হযরত বদী-উদ-দীন শাহা মদার (র.) **১৩১৫** খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন এবং **১৪৩৬** খ্রিষ্টাব্দে কানপুর জেলার মকনপুরে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন। আখবার-উল-আখইয়ারের লেখক শায়ক আবদুল হক দেহলভীর মতে, হযরত বদী-উদ-দীন শাহ মদার (র.) বার বৎসর পর্যন্ত অনাহারে এবং এক বস্ত্রে আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল ছিলেন। তিনি বোরকায় মুখ আবৃত করে চলতেন, কারণ কথিত আছে যে, তিনি এত সুন্দর ছিলেন যে তাঁর চেহারা দেখলে সকলকে তাঁর সামনে ভূলুণ্ঠিত হতে হত।[১৭৩] হযরত বদী-উদ-দীন শাহ মদার (র.) একজন পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমন করেন। ভারতের যে সকল স্থান তাঁর পবিত্র চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছিল, তন্মধ্যে গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, কাল্পী, জৌনপুর, লক্ষ্মৌ ও কানপুরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রামের মদারবাড়ী ও মদারশা এলাকাগুলো হযরত বদী-উদ-দীন শাহ মদার (র.) এর স্মৃতিরই পরিচায়ক। বাংলাদেশের নানাস্থানে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের পাবনা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জেলায় সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ শাহ-ই-মদার বা মদার শাহের স্মৃতিরক্ষার্থে এখনও মদারের

---

১৭১. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২।

১৭২. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৭৩. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

'বাঁশতোলা' নামক একটি বার্ষিক উৎসব করে থাকে।[১৭৪] এই তরীকার অনুসারীগণ হাতে ও পায়ে লোহার বেড়ী পরিধান করে। বাঁশ নাচায় ও মাদারের গান (এক ধরনের মুরর্শিদী) করে। শাহ মাদার (র.)-কে বাংলাদেশে দম মাদার বলা হয়। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে শুন্য পূরাণের 'নিরঞ্জনের রুস্মা' অধ্যায়ে উল্লেখিত দম্বদার (দমমাদার) শব্দ থেকে আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, তিনি বাংলাদেশেও এসিছিলেন এবং বাংলাদেশে তাঁর তরীকা প্রবর্তন করেন।[১৭৫]

শততারিয়া তরীকা

এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শাহ আবদুল্লাহ (র.)। তিনি ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন[১৭৬] এবং ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি পাক-ভারতে শততারিয়া তরীকা আনয়ন করেন। জৌনপুর এবং বিহারে এই তরীকার সূফীদের বেশ প্রভাব ছিল। এই তরীকার সূফীরা তাওহীদের উপর বিশেষ জোর দিতেন।[১৭৭] এই তরীকার মূলনীতিগুলো হলো:

১. ফানাবাদ তথা আত্মবিলোপন নয়, বরং আত্মচেতন ও আত্মস্বীকৃতির উপরই রয়েছে আল্লাহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
২. মুরাকাবা তথা ধ্যানে কখনো দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না, এবং তা দ্বারা পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।
৩. অস্তিত্ববোধ লাভ করার পর তাওহীদের একত্বাধীন নেতৃত্বে বাস করাই প্রকৃত সূফী ধর্ম ও সূফীকর্ম।
৪. তাযকিয়ায়ে নফস তথা পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক।

---

১৭৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব* (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ৮০।

১৭৫. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৭৬. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৭৭. ড. আবদুল করিম, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৫. একাত্মবাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম কখনও দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না। ফানাবাদের প্রেক্ষাপটে বা পরিপ্রেক্ষিতে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করতে হয় বলেই সাত্তারিয়া তরীকায় ফানাবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭৮]

মৌলবীয়া তরীকা

হযরত মাওলানা জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ রূমী (র.) ছিলেন মৌলবীয়া তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা। তুরস্কে এই তরীকার উদ্ভব ঘটে এবং উসমানীয় খলিফাদের শাসন আমলে এই তরীকা একটি শক্তিশালী তরীকায় পরিগণিত হয়েছিল।[১৭৯] মাওলানা জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ রূমী (র.) খোরাসানের বিখ্যাত শহর বর্তমান আফগানিস্তানের বালখে ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বর্তমান তুরস্কের কৌনিয়া শহরে তাঁর সমাধি রয়েছে।[১৮০] মৌলবীয়া তরীকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল- সামাহ অনুশীলন। এ অনুষ্ঠানে সূফীরা নৃত্যের তালে তালে ঘুরতে থাকেন। আর এর মাধ্যমে ভক্ত অনুসারীগণ ক্রমশ শান্তির জগতে প্রবেশ করেন। এ জন্য তাদেরকে ‘ঘূর্ণয়মান দরবেশ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১৮১] এই তরীকার প্রধান প্রধান পীর মুর্শিদগণ কুনিয়ায় অবস্থান করতেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেক সুলতান বা খলিফা শাসিত মুসলিম দেশসমূহের নতুন সুলতান বা খলিফাদের কটিবন্ধে তাঁরা তলোয়ার বেঁধে দিতেন।[১৮২]

সেনুনিয়া তরীকা

হযরত শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-সানুসী (র.) ছিলেন সেনুসিয়া তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকা মূলত কাদেরিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভুত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকার ভক্তগণ মালেকী মাযহাবের অনুসারী। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই এই তরীকার অভিষ্ট লক্ষ্য। এই তরীকা সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত।[১৮৩] সেনুসিয়া তরীকা লিবিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক শাখার মাঝে সানুসিয়া তরীকা ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

---

১৭৮. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৭৯. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

১৮০. মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহম্মদ রূমী (র.), *মসনবী শরীফ*, প্রথম খন্ডের প্রথমার্ধ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ১৯, ২২।

১৮১. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৮২. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৮৩. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত।

একই সাথে এই তরীকা লিবিয়াকে ইতালিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-সানুসী (রহ.) ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১৮৪]

রিফাতিয়া তরীকা

ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে শেখ আহমাদ বিন আলী আর-রিফায়ী (র.) কর্তৃক রিফাতিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। এ তরীকার অনুসারীগণ দীনভাবে চলাফেরা করে, পাপকার্য হতে বিরত থাকে, দৈহিক কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলেন। তাঁদেরকে 'আর্তদানকারী দরবেশ' বলা হয়। কারণ যিকির করার সময় তাঁরা অত্যাধিক জোরে বা উচ্চকণ্ঠে যিকির করেন। এই তরীকায় চমকপ্রদ কিছু অনুষ্ঠান গোঁচরীভূত হয়। তাঁরা একই সাথে উদ্ভট ও কৃতিত্বপূর্ণ কিছু কাজ সম্পাদন করেন। যেমন- আগুন ভক্ষণ, লোহার শিকে শরীর গাঁথা কিংবা একটু একটু করে জীবন্ত সাপ খেয়ে ফেলা ইত্যাদি।[১৮৫]

হাতিমিয়া তরীকা

হযরত শায়খুল আকবর মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) হাতিমিয়া তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকা মূলত কাদেরিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকার মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করে থাকলেও মূলত ইহা পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় সর্বেশ্বরবাদ নয় কখনও; বরং ইহা সর্বধরেশ্বরবাদ নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কেননা, এই তরীকার মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি নেই। এই অর্থেই স্রষ্টা সর্বসৃষ্টির ধরেশ্বর বৈ কিছুই নন।[১৮৬]

ওয়ায়েসিয়া তরীকা

হযরত ওয়াসেস আল করণী (র.) ওয়ায়েসিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইয়েমনের করন অঞ্চলে জন্মগ্রহন করেন। তিনি আধ্যাত্মিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছ থেকে

---

১৮৪. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১৮৫. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত।

১৮৬. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

ইসলামি বিধি-বিধান ও তাসাউফ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরিধানের জুব্বা মোবারক লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত ওয়ায়েস আল করণী (র.) সিফফিনের যুদ্ধে ৩৮ হিজরি সনে শহীদ হন। সিফফিনের পাশে তার মাজার এখনো 'মাকামে উয়ায়িস' নামে খ্যাত। তাঁর শাহাদাতের রাত এখনও 'লাইলাতুল হারির (রেশম গৌরব রাত্রি)' নামে আউলিয়া কুলে পালিত হয়।[১৮৭] বাংলা ১২৯৮ সনে 'মহম্মদী বেদ' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ওয়ায়েসিয়া তরীকার প্রচার শুরু হয় বাংলাদেশে।[১৮৮]

আদহামিয়া তরীকা

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী (র.) আদহামিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকা চিশতীয়া তরীকার অন্যতম শাখা। সিরিয়া, তুর্কীস্থান, সমরখন্দ ও বুখারায় এই তরীকার ব্যপক বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তিতে ভারত ও বাংলাদেশ পর্যন্ত এ তরীকা বিস্তার লাভ করেছিল বলে জানা যায়।[১৮৯] আদহামিয়া তরীকাভুক্ত সূফীরা ভারতে 'খিদ্বরীয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বাংলাদেশেও খিদ্বরের প্রভাব কম নয়। বাংলার বিখ্যাত নদীতটবাসী মুসলমানগণ এখনও অনেক জায়গায় 'খিদ্বরের' প্রতি ভালবাসায় প্রতি বছর 'বেরা ভাসান' উৎসব পালন করে থাকে। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই 'বেরা ভাসান' উৎসব বাংলাদেশে প্রবল ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে 'খিদ্বরীয়া' অর্থাৎ 'আদহামীয়া' সূফী সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল।[১৯০]

জালালিয়া তরীকা

হযরত শাহাজালাল (র.) এর প্রতিষ্ঠিত তরীকা জালালীয়া তরীকা নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় তরীকা সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার শায়খ এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) এর বংশধর। সুতরাং জালালীয়া তরীকা মূলত সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকারই অংশবিশেষ। হযরত শাহ জালাল (র.) এর জীবনের বাস্তব শিক্ষা ছিল : (১) তাওয়াক্কুল (২) সবর (৩) হালাল জীবিকা (৪) দান–খয়রাত (৫) পরামর্শ (৬) সদুপদেশ) (৭) ইবাদত (৮) মুরশিদ বা পীরের খেদমত (৯) খালেস নিয়ত।

---

১৮৭. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), *দিওয়ার-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০।

১৮৮. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১৮৯. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৯০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

হযরত শাহ জালাল (র.) ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলীআল্লাহ। তিনি আরবের ইয়ামন হতে আগমন করেন। তিনি ৩৬০ জন অলী আল্লাহ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সমগ্র বাংলার আনাচে-কানাচে ইসলাম প্রচারিত হয়। সমাজ জীবনে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যসহ এদেশের মানুষের সমগ্র চিন্তা চেতনায় তাঁর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই মহান সাধক সিলেটের আলাপুরে অবস্থান করেন। এখানেই তিনি সমাহিত আছেন। এই বিখ্যাত সূফীর মাজার জিয়ারত করতে দূর-দূরান্ত হতে অনগিত ভক্ত আজও সমবেত হয়।[১৯১]

খাররাজিয়া তরীকা

হযরত আবু সাঈদ আল–খাররাজ (র.) খাররাজিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফানা ও বাকার স্তর পরিবর্তনের নিয়ম-কানুনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেননা তাঁর মতে, মানবাত্মা কেবল আল্লাহর সিফাতী গুন অর্জন করতে সক্ষম, কিন্তু তাঁর পরম সত্তায় পৌছান এবং উহার পরিবর্তন সাধন কখনও সম্ভব নয়।[১৯২]

আহমাদিয়া তরীকা

হযরত আহমাদ আল বাদাত্তী (র.) কর্তৃক আহমাদিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি **১১১৯** খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং **১২৭৬** খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আফ্রিকা মহাদেশ বিশেষ করে মিশরে এই তরীকা প্রভাব বিস্তার করে। এটি 'বাদাত্তীয়া' তরীকা নামেও সুপরিচিত। মামলুক সুলতানদের নিকট এ তরীকা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই তরীকার অনুসারীরা আল বাদাত্তী (র.) এর জন্মদিবসকে প্রতি বছর অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে। 'দুসুকিয়া' বা 'বুরহানিয়া' এ তরীকার অন্তর্গত একই উপ-তরীকা।[১৯৩]

খিজিরিয়া তরীকা

হযরত খাজা খিজির (আ.) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বলে ধারণা করা হয়। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে এই তরীকার বেশ প্রভাব ছিল। শায়েখুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবী (র.)

---

১৯১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৭।

১৯২. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

১৯৩. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

এই তরীকার অনুসারী ছিলেন। এই তরীকার অনুসারীগণ অনেক অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে থাকেন। কলন্দরিয়া তরীকার সাথে এই তরীকার কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। ভারত, পাকিস্তানসহ বাংলাদেশেও খিজিরিয়া তরীকার অস্তিত্ব রয়েছে।[১৯৪]

তিজানীয়া তরীকা

হযরত ফরিদ উদ্দিন শেখ আহমদ আততিজানি (র.) তিজানীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মরক্কোর 'ফেজ' নগরীতে এই তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই পরবর্তীতে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ যেমন- সেনেগাল, নাইজেরিয়া, নাইজার, গাম্বিয়া, মালিতে ছড়িয়ে যায়। এছাড়া পশ্চিম আফ্রিকা, আলজেরিয়া ও ফ্রেঞ্চ গায়ানায় এই তরীকা প্রসার লাভ করে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মাঝে ও তরীকার ব্যাপক অবদান লক্ষ্য করা যায়। কুরআন-হাদীসের তিনটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে এ তরীকা গঠিত, সেগুলো হল:

ক) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

খ) রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর বাস্তবায়ন্

গ) 'তালীল-উল-ইহসান' বা 'লা-ইলাহ-ইল্লাল-ল্লাহ' পাঠ করা।[১৯৫]

খালওয়াতিয়া তরীকা

খালওয়াতিয়া তরীকার উন্মেষ ঘটে খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে। খালওয়াতিদের সূচনা হয়েছিল একজন পরসিক সূফী-সাধক ওমর আল-খালওয়াতি বা ওমর হেলভেতির মাধ্যমে। সতের শতকে হেলভেতি তরীকার মাঝে নতুন কিছু স্রোতধারার সৃষ্টি হয়। খালওয়াতিরা বিশেষ এক ধরনের আধ্যাত্মিক নির্জনবাস বা খালওয়া পালণ করেন যা ৩ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। অন্যান্য সূফী তরীকার মতো খালওয়াতিদের অন্তর্ভূক্ত একজন মুরিদকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জন করতে হয়। এজন্য তার কিছু অবশ্য পালনীয় বিষয় রয়েছে। যেমন তাকে ৭টি পবিত্র নাম জপ বা 'আল আসমা আস

১৯৪. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৯৫. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

সাবআ' পাঠ করতে হয়। এছাড়া চার মাসের কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে তাকে 'কামাল' স্তরে উপনীত হতে হয়।[১৯৬]

মুহাম্মদিয়া তরীকা

মুহাম্মদিয়া তরীকা হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীরেকেই চলে এসেছে বলে অনুমান করা হয। হযরত আলী খাওয়ান (র.) ও হযরত শারানী (র.) কে এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। ষোড়শ শতকে এ তরীকার অস্তিত্ব ছিল। হযরত শামসুদ্দীন মুহম্মদ বিন হাসান হানাফী মিসর (র.) ও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) কেও এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়।[১৯৭]

তাইফুরিয়া তরীকা

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) তাইফুরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এই তরীকায় ফানা বা আত্মবিলোপনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খোরাসান, কুফা প্রভৃতি স্থানে এক সময় এই তরীকার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[১৯৮]

সাধিলিয়া তরীকা

হযরত ইমাম আবুল হাসান আলী আল সাধিল্লি (র.) সাধিলিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিউনেসিয়ায় জন্মগ্রহন করেন এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে এ তরীকা আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত সূফী হযরত আতা উল্লাহ (র.) এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এই তরীকার অনুসারীগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দেয়। এটি লাভ করাই সূফীতত্ত্বে উচ্চ স্তরের মূল কারণ রূপে তাঁরা বিবেচনা করেন। তাঁরা জীবন নির্বাহে ভিক্ষাবৃত্তি সমর্থন করেন না এবং সকল ক্ষেত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেন।[১৯৯]

নিয়ামতুল্লাহিয়া তরীকা

হযরত শাহওয়ালী নিয়ামতুল্লাহ (র.) নিয়ামতুল্লাহিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। শিয়াদের একটি বৃহত্তর শাখা ইসমাইলিয়াদের মধ্য হতে নিয়ামতুল্লাহি তরীকার উদ্ভব ঘটেছে। ইরানকে কেন্দ্র করে

---

১৯৬. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

১৯৭. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

১৯৮. মাওলানা আবদুর রহিম হাযারী, *সূফীতত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৯৯. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

প্রাথমিক সময়ে এই তরীকার বিকাশ ঘটে পরে তা ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে।[২০০]

আহ্সানিয়া তরীকা

হযরত খান বাহাদুর আহ্সান উল্লাহ (র.) আহ্সানিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা হযরত মুনশী মফিজ উদ্দীন (র.) অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত খান বাহাদুর আহ্সান উল্লাহ (র.) অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি হযরত গফুর শাহ (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন।

আহ্সানিয়া তরীকায় জাঁ-নশীনী, সাজ্জাদ-নশীনী বিবর্জিত। তিনি বলতেন ইশকের ক্ষেত্রে খিলাফতি অর্থহীন। ইশক আল্লাহ্ তায়ালার খাস রাজ। যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন সে এর স্বাদ প্রাপ্তে মালামাল হয়ে যায়। তরীকাসমূহের মূলে রয়েছে আল্লাহ্ প্রাপ্তি। মহব্বতই একমাত্র আল্লাহ্ প্রাপ্তির প্রধান সম্পদ। এতে আল্লাহ্ ও বান্দার নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান। মহব্বত এ তরীকার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং নিঃস্বার্থে সকল সৃষ্টির সেবা করা অন্যতম প্রধান বিষয়।[২০১]

আহ্সানিয়া তরীকার সাধনা

হযরত খান বাহাদুর আহ্সান উল্লাহ (র.) আল্লাহ্ প্রাপ্তির সকল তরীকার প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তরীকতের সালিকিনগণের জন্য স্বীয় পীর যে সমস্ত আমল এবং রিয়ামতের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন উহা পূর্ণ ভক্তির সাথে আমল করতে উপদেশ দিতেন।

সৃষ্টের সেবা এবং স্রষ্টার ইবাদত এর উদ্দেশ্য সার্বজনীন আহ্সানিয়া মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যে কোন তরীকার লোক এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যভুক্ত হতে পারে। আহ্সানিয়া তরীকা এবং আহ্সানিয়া মিশনের সভ্যগণের প্রতিপাল্য মূলনীতি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

> অল্প আহার করবে, কম কথা বলবে ও কম নিদ্রা যাবে। কাউকেও হেয় জ্ঞান করবে না। কারও গীবত করবে না এবং কারও অন্তরে ব্যাথা দেবে না। সত্য বলবে, সততা অবলম্বন করবে। শত্রুকে মিত্রতা দ্বারা বশীভূত করবে। রোগে-শোকে সকল অবস্থায় ধৈর্যধারণ

---

২০০. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, প্রমুখ সম্পাদিত, *সূফী দর্শন ও তরীকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২০১. ডাঃ কাজী আবদুল মোনয়েম, *ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

করবে। স্রষ্টার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও মহব্বত রাখবে। স্বীয় ইচ্ছাকে বিলিয়ে দিয়ে ইচ্ছা ময়ের ইচ্ছাতে বিলীন হবে।[২০২]

উপরোল্লিখিত ২৫টি তরীকা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো বহু তরীকার প্রচলন রয়েছে; যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও তা'লিমের বিষয়ে খুব একটা জানা যায় না। নিচে তরীকাগুলোর নাম দেওয়া হলঃ

সাবিনিয়া তরীকা, সাজিনীয়া তরীকা, শামিনী তরীকা, ইয়াফহিয়া তরীকা, শা'বানী তরীকা, ইয়েসেভী তরীকা, বেকতাশী তরীকা, যাহিরীয়া তরীকা, নূরী তরীকা, সাহলীয়া তরীকা, হাকিমিয়া তরীকা, খাফিফিয়া তরীকা সায়ারিয়া তরীকা, যায়েদিয়া তরীকা, আয়াজিয়া তরীকা, আহমদিয়া তরীকা, সিন্নাসিয়া তরীকা, মারাযিকা তরীকা, কান্নাসিয়া তরীকা, আনবারিয়া তরীকা, হামুদিয়া তরীকা, মানাইফিয়া তরীকা, সাল্লামিয়া তরীকা, হামারিয়া তরীকা, যাহিদিয়া তরীকা, শুয়াইবিয়া তরীকা, তাস্কিয়ানিয়া তরীকা, আরাবিয়া তরীকা, সতুহিয়া তরীকা, বুন্দারিয়া তরীকা, মুসলিমিয়া তরীকা, শুরুন বুলামিয়া তরীকা, বাইয়ুমিয়া তরীকা, ইবরাবিয়া বা হিবারিয়া তরকি, আইদারুসিয়া তরীকা, আকবারিয়া তরীকা, আলাইয়া তরীকা, আল্লাইয়া তরীকা, ইসহাকী চিশতীয়া তরীকা, আমির গনিয়া তরীকা, আত্তারিয়া তরীকা, আরুসিয়া তরীকা, আশরাফিয়া তরীকা, ওয়াহিদিয়া তরীকা, আওয়ামিরিয়া তরীকা, আজুজিয়া তরীকা, বাবাইয়া তরীকা, বাদাইয়া তরীকা, বৈরামিয়া তরীকা, হামজারিয়া তরীকা, শাইখিয়া তরীকা, খাওয়াজা হিম্মাতিয়া তরীকা, কামুসিয়া তরীকা, বাক্কাইয়া তরীকা, ফাজালিয়া বা ফাদলিয়া তরীকা, আসদিদিয়া তরীকা, বাকরিয়া তরীকা, বকরিয়া তরীকা, বকারাইয়া তরীকা, বাকরাইয়া তরীকা, বানাওয়া তরীকা, বাইবারিয়া তরীকা, বিস্তামিয়া তরীকা, বুয়ালিয়া তরীকা,

২০২. ডাঃ কাজী আবদুল মোন্‌য়েম, *ইসলামের আলোকে সূফীবাদ ও সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

বুনুহিয়া তরীকা, বুরহানিয়া বা বুরহামিয়া তরীকা, শাহহিয়া তরীকা, শারমিবা তরীকা, দারদিরিয়া তরীকা, দারকোয়া তরীকা, বুজিদিয়া তরীকা, কিওলিয়া তরীকা, দাসুকিয়া তরীকা, হাররাকিয়া তরীকা, ধাহাচিয়া তরীকা, জাহরিয়া তরীকা, জালালীয়া বুখারীয়া তরীকা, জালাওয়াতীয়া তরীকা, হাশিমিয়া তরীকা, রওশনীয়া তরীকা, ফানাইয়া তরীকা, হুদাইয়া তরীকা, জেমালিয়া তরীকা, জামালীয়া তরীকা, জাজুলিয়া তরীকা, হামাদিয়া তরীকা, ইসাইয়া তরীকা, শার্কাওয়া তরীকা, তাইবিয়া তরীকা, জিবাইয়া তরীকা, জিলালা তরীকা, ফিরদৌসীয়া তরীকা, গাউসিয়া তরীকা, গায্যালিয়া তরীকা, গাজিয়া তরীকা, গুলশানিয়া তরীকা, গুর্জমার তরীকা, হাবিবিয়া তরীকা, হাদ্দাওয়া তরীকা, হাফনাওয়াইয়া তরীকা, হায়দারীয়া তরীকা, হায়দারীয়া খাকসার তরীকা, হাল্লাজিয়া তরীকা, হামাধানিয়া তরীকা, সাদ্দাকিয়া তরীকা, রিয়াহিয়া তরীকা, কাসিমিয়া তরীকা, হানসালিয়া তরীকা, হানসেলিয়া তরীকা, হারিরিয়া তরীকা, হুলসালিয়া তরীকা, ইদ্রিসিয়া তরীকা, ইগতিবাশিয়া তরীকা, ইগাতিশাশিয়া তরীকা, ইশরাকিয়া তরীকা, ইসমাইলিয়া তরীকা, মুশারিয়া তরীকা, উরাবিয়া তরীকা, হিনদিয়া তরীকা, খুলুসিয়া তরীকাত, নাবুলুসিয়া তরকিা, রুমীয়া তরীকা, ওয়াম্মাতিয়া তরীকা, ফরিদিয়া তরীকা, হাবিবিয়া তরীকা, কারখিয়া তরীকা, সক্তিয়ায়া তরীকা, গায়র দিদিলিয়া তরীকা, তুরতুসিয়া তরীকা, কারতুসিয়া তরীকা, কাররাইয়া তরীকা, কারজাজিয়া তরীকা, কাজারুনিয়া তরীকা, খাদিরিয়া বা খিদ্রিয়া তরীকা, খফিয়া তরীকা, খলিলিয়া তরীকা, ইশশাকিয়া তরীকা, নিয়াজিয়া তরীকা, সুনবুলিয়া তরীকা, শামসিয়া তরীকা, নুরিয়া সিওয়াসিয়া তরীকা, গুজাইয়া তরীকা, দাইফয়া তরীকা, হাফনাবিয়া তরীকা, সাবাইয়া তরীকা, সাবিয়া দারদিনিয়া তরীকা, মাঘাজিয়া তরীকা, সালিহিয়া তরীকা, রহমানিয়া তরীকা, খাওয়াতিরিয়া তরীকা, খাওয়াযিগান তরীকা, কুবরাইয়া তরীকা, আইদারুসিয়া তরীকা,

নূরবক্সিয়া তরীকা, রুকনিয়া তরীকা, কুনাইবিয়া তরীকা, কুশাইরিয়া তরীকা, মাদাসিয়া তরীকা, মাদানইয়া তরীকা, মাদারিয়া তরীকা, মাগরিরিয়া তরীকা, মালামতিয়া তরীকা, মালামিয়া তরীকা, মানসুরিয়া তরীকা, মাশিশিয়া তরকি, মাতবুলিয়া তরীকা, মিসরিয়া তরীকা, মুরাদিয়া তরীকা, নাসিরিয়া তরীকা, সাকিয়া তরীকা, নুবুরিয়া তরীকা, নুরুদ্দিনীয়া তরীকা, নূরিয়া তরীকা, পীর হাজত তরীকা, রাহালিয়া তরীকা, রাশিদিয়া তরীকা, রাসুলশাহীয়া তরীকা, রাওশানীয়া তরীকা, সাদিয়া তরীকা, সৈয়াদিয়া তরীকা, বাঘিয়া তরীকা, মালিকিয়া তরীকা, রুমিয়া তরীকা, আব্দুস সালামিয়া তরীকা, আবুল ওয়াফাইয়া তরীকা, সাফাইয়া তরীকা, সাকাতিয়া তরীকা, সালামিয়া তরীকা, সালিমিয়া তরীকা, সানামিয়া তরীকা, সাসানিয়া তরীকা, সাইয়ারিয়া তরীকা, শায়েখিয়া তরীকা, সুহাইলিয়া তরীকা, ইউসুফিয়া তরীকা, জারুকিয়া তরকি, জিযানিয়া তরীকা, খাওয়া তিরিয়া তরীকা, ওয়াফাইয়া তরীকা, জওহারীয়া তরীকা, মাককিয়া তরকিবা, হাশিমিয়া তরীকা, আফিফিয়া তরীকা, হামদুশিয়া তরকি, কাউকজিয়া তরীকা, শাহ মাদারিয়া তরীকা, শারকাবিয়া তরীকা, উশাইকিয়া তরকি, গুজিইয়া তরীকা, সিদ্দিকীয়া তরীকা, রওশনানীয়া তরীকা, সাফাইয়া তরীকা, জৈনিয়া তরীকা, সুলতানিয়া তরীকা, তাবাইয়া তরীকা, তালিবিয়া তরীকা, তুহামিয়া তরীকা, উলবানিয়া তরীকা, উন্মি সিনানিয়া তরীকা, ওয়ারিস আলী শাহীয়অ তরীকা, ইয়ামারিয়া তরীকা, ইউনুসিয়া তরীকা, আবুল উলাইয়া তরীকা, নওশাহীয়া তরীকা, মোনায়েমিয়া তরীকা, হোসাইনিয়া তরকি, তাউসিয়া তরীকা, হামদুশিয়া তরীকা,কাউকজিয়া তরীকা, শাহ মাদারিয়া তরীকা, শারকাবিয়া তরীকা, উশাইকিয়া তরীকা, গুজিইয়া তরীকা, সিদ্দিকীয়া তরীকা, রওশানীয়া তরীকা, সাফাইয়া তরীকা, জৈনিয়া তরীকা, সুলতানিয়া তরীকা, তাবাইয়া তরীকা, তালিবিয়া তরীকা, তুহামিয়া তরীকা, উলবানিয়া তরীকা, উন্মি সিনানিয়া তরীকা, ওয়ারিস

আলী শাহীয়া তরীকা, ইয়ামারিয়া তরীকা, ইউনুসিয়া তরীকা, আবুল উলাইয়া তরীকা, নওশাহীয়া তরীকা, মোনায়েমিয়া তরীকা, হোসাইনিয়া তরীকা, তাউসিয়া তরীকা, দারুসিয়া তরীকা, আনোয়ারীয়া তরীকা, রাজ্জাকীয়া তরীকা, মাগরিয়া তরীকা, আয়দারুসিয়া তরীকা, সাঘোরিয়া তরীকা, কাসেমিয়া তরীকা, আনসারিয়া তরীকা, জাহানিয়া তরীকা, হামারিয়া তরীকা, জামিরিয়া তরীকা, সাফারিয়া তরীকা, বাহলুলিয়া তরীকা, খেজরাবিয়া তরীকা, হলবিয়া তরীকা, আত্তারিয়া তরীকা, হামদানিয়া তরীকা, ওকাইয়া তরীকা, নূরী তরীকা ইত্যাদি।[২০৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, সূফীবাদ ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামের আগমনের সাথেই সূফীবাদেরও আগমন। সূফীবাদ ইসলামের মতোই পুরাতন। ইসলাম যেমন রাসূলুল্লাল (সা.) এর মাধ্যমে এসেছে, তেমনি সূফীবাদও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাত ধরেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পরবর্তীতে সূফীসাধকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে সূফীবাদের বিস্তার ঘটে এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য, সহজ নিয়মকানুন ও উপলব্ধির উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়। মূলত কুরআন ও হাদীসের জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষাই সূফীসাধনার মূল ভিত্তি। এ অধ্যায়ে সূফী তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত করার পদ্ধতি বা রাস্তাই হল তরীকা। সূফীসাধকগণ প্রত্যেকেই কোন না কোন তরীকার অনুসারী ছিলেন। তরীকার অনুসারী হওয়া সূফীসাধকদের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরনের তরীকার মধ্যে সূফীসাধকগণ যে কোন একটি সূফী তরীকা অনুসরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হতেন। সুতরাং সূফীতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে এবং মহান আল্লাহর দিদার লাভ করতে হলে এসব সুফী তরীকার মাধ্যমেই তা জানতে হবে। সুফী তরীকার মাধ্যমেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গুপ্ত তালিম ফল্গুধারার মত বয়ে এসেছে।

২০৩. ড. ফকীর আবদুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

অধ্যায় : চার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সূফীবাদের মূলনীতি, বিশ্বাসগত অবস্থান ও আচার-অনুষ্ঠান

(The Principles, beliefs and rituals of the Sufism based of the Quran and Hadith)

সূফীবাদের মূলনীতি (The Principles of the Sufism)

সূফীবাদ আল্লাহর প্রেম-ভিত্তিক একটি অভিনব চিন্তাধারা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই সূফীবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহ জাগতিক সকল প্রকার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে সূফীগণ ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তৎপর। তাই বস্তুজগতে ক্ষণস্থায়ী সুখ ও সম্পদের প্রতি সূফী সাধকের রয়েছে বৃহৎ উদাসীনতা, দারুণ অনীহা। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন ও আপাতমধুর ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় তাঁরা নিয়োজিত হন। সূফীর এ যাত্রাপথ কুসমাস্তীর্ণ ও সুগম নয় বরং যেমনি কন্টাকাকীর্ণ ও দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। এ সাধনায় আকরাবিয়াত লাভ করে ইনসান-ই-কামিল হতে হলে সূফী সাধনার সালেককে কতগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। নীতিগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

তাওবাহ্ (অনুশোচনা)

'তাওবাহ্' শব্দের অর্থ হলো, প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ গুণাহের কারণে বান্দার লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় গুণাহ্ না করার সংকল্প নিয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।[২০৪]বাস্তবিকপক্ষে সচেতন অনুতাপকেই তাওবাহ্ বলে। জ্ঞান এবং ঈমানের নূর তাওবাহ্র উৎস। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মানুষের অন্তকরণ এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে এদেরকে বদলিয়ে দেয়, পাপ এবং অবাধ্যতার দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও সন্তুষ্টির কাজে লিপ্ত রাখে।[২০৫] যুন-নূন আল মিসরী বলেন– "সাধরণ লোকের তাওবাহ্

---

২০৪. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩), পৃ. ২৪।

২০৫. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.) এর জীবন ও কর্ম এবং এলমে তাসাউফ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৫), পৃ. ২৫৩।

পাপ থেকে এবং বিশেষ ব্যক্তিদের তাওবাহ্ উদাসীনতা থেকে।[২০৬] আবুল হুসাইন আন্নূরী বলেন, "তাওবাহ্ হলো তুমি আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে ফিরে আসবে।"[২০৭] পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

وَ اِنِّیۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰی ﴿﴾

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমতাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎ কর্ম করে ও সৎ পথে অবিচলিত থাকে।[২০৮]

وَ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ رَحِیۡمٌ وَّدُوۡدٌ ﴿﴾

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকট তাওবাহ্ কর, তোমার প্রতিপালক পরম দায়ালু ও প্রেমময়।[২০৯]

قَالَ یٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِالسَّیِّئَۃِ قَبۡلَ الۡحَسَنَۃِ ۚ لَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُوۡنَ اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿﴾

কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাথনা করছ না, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রভাজন হতে পার।[২১০]

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰهِ تَوۡبَۃً نَّصُوۡحًا–

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ কর-বিশুদ্ধ তাওবাহ।[২১১]

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیۡنَ وَ یُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِیۡنَ ﴿﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।[২১২]

---

২০৬. ইমাম আবুল কাশিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

২০৭. প্রাগুক্ত।

২০৮. আল-কুরআন, ২০:৮২।

২০৯. আল-কুরআন, ১১:৯০।

২১০. আল-কুরআন, ২৭:৪৬।

২১১. আল-কুরআন, ৬৬:৮।

২১২. আল-কুরআন, ২:২২২।

وَّ اَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ–

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপর তাঁর কাছে তাওবাহ্ কর।[২১৩]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيۡنَ وَ يُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِيۡنَ ﴿﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবাহ্ কর।[২১৪]

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ–

মহান আল্লাহ বান্দার তাওবাহ কবুল করতে থাকেন যে পর্যন্ত তার দম কন্ঠনালীতে এসে না যায় অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ না পায়।[২১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا "–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি পেলে যতখানি খুশি হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একজনের তওবায় সেই অপেক্ষা বেশি আনন্দিত হন।[২১৬]

كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ–

মানুষ মাত্রই পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীই উত্তম।[২১৭]

---

২১৩. আল-কুরআন, ১১:৩।

২১৪. আল-কুরআন, ৬৬:৮।

২১৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, (ঢাকা : তাজ কো. লি., ২০০৮) হাদীস নং- ৩৪৭৯, পৃ. ২৪৮।

২১৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৪৮০, পৃ. ২৪৮।

২১৭. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ২৪৯৯, পৃ. ৬৪।

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا –

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত কর, যারা উত্তম কাজ করলে সন্তোষ লাভ করে, আর যখন তারা মন্দ কাজ করে, তখন তারা ইস্তিগফার করে।[২১৮]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং হাদীসে রাসূল (সা.) থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রহমত ও সফলতা পেতে হলে অবশ্যই তাওবাহ্ করতে হবে। তাওবাহ্ ব্যতীত আল্লাহর রহমত ও জীবনের সফলতা লাভ করা যাবে না।

উলামায়ে কিরামের মতে বিশুদ্ধ তাওবাহ্র তিনটি শর্ত রয়েছে–

১. তাওবাকারীকে গুণাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।
২. তাওবাকারীকে তার কৃত গুণাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।
৩. নিজের জীবনকে সুন্দর ও বিশুদ্ধ করার জন্য বাস্তব তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে।

এই হল প্রকৃত তাওবাহ্ যার দ্বারা তাওবাকারীর সত্যিকার আত্মশুদ্ধি হয়ে থাকে।[২১৯]

সূফীরা বিশ্বাস করেন, আধ্যাত্মিক সাধনার একটি অন্যতম সোপানই হলো পাপ-বর্জিত হৃদয়। হৃদয় পাপ-বর্জিত হলেই সাধনায় স্থিরতা বা একাগ্রতা আসে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যতা লাভ সহজতর হয়। অপরপক্ষে কলুষিত মন নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়। শুধু অমঙ্গল হতে বিরত হওয়াই তাওবাহ্ নয় বরং জগতের সমুদয় বস্তু হতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতাই হলো তাওবাহ্।[২২০]

---

২১৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ (র.), *সুনানে ইবনে মাজাহ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০২), হাদীস নং- ৩৮২০, পৃ. ৩৯৬।

২১৯. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২২০. আফরোজা বেগম, *ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৬), পৃ. ১৯০।

তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা)

তাওয়াক্কুল আরবি শব্দ। এর অর্থ আস্থা স্থাপন করা, ভরসা ও নির্ভর করা। কুরআন ও হাদিসের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোন কাজ করার সাথে তার সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নাই 'তাওয়াক্কুল'।[২২১]ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, 'ওকলাত' ধাতু থেকে 'তাফাউল'এর ওজনে তাওয়াক্কুল শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় নিজের জন্য কাউকে উকিল (দেখাশোনাকারী, সংশোধনকারী ও উন্নয়নকারী) নিয়োগ করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর উপর সর্বোতোভাবে নির্ভর করা অর্থেই তাওয়াক্কুল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[২২২]

সাহল ইবন আব্দুল্লাহকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এটা হলো এমন হৃদয় যে অন্য কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক ছাড়া কেবল আল্লাহর সাথে বাস করে।"[২২৩] পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাওয়াক্কুল এর বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ব্যতীত মু'মিনের কোন কাজ সফলতা লাভ করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَ عَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।[২২৪]

اعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿﴾

২২১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

২২২. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

২২৩. ইমাম আবুল কাশিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

২২৪. আল-কুরআন, ৫:২৩।

যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে; তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন।[২২৫]

وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰہِ فَہُوَ حَسۡبُہٗ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।[২২৬]

وَ عَلَی اللّٰہِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿﴾

আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত।[২২৭]

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُہُمۡ وَ اِذَا تُلِیَتۡ عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتُہٗ زَادَتۡہُمۡ اِیۡمَانًا وَّعَلٰی رَبِّہِمۡ یَتَوَکَّلُوۡنَ ﴿﴾

ঈমানদার তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর উপরই আস্থা ও ভরসা রাখে।[২২৮]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে তবে তিনি পাখিকে রিযিক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখিতো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় তারা ভরা পেটে ফিরে আসে।[২২৯]

তাওয়াক্কুল তাওহিদের ধারণা হতে উদ্ভূত। এর মানে হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া। আল্লাহর ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে সূফীরা তাঁকে পেতে চান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন কাল্পনিক কিংবা প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা

---

২২৫. আল-কুরআন, ৩:১৫৯।

২২৬. আল-কুরআন, ৬৫:৩।

২২৭. আল-কুরআন, ১৪:১১।

২২৮. আল-কুরআন, ৮:২।

২২৯. ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র.), ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা: ভূঁইয়া প্রকাশনী, ২০০৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

ইসলাম বিরোধী। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই সূফীর লক্ষ্য।[২৩০] আমানু, সালেক ও মোত্তাকির পথ অতিক্রম করে মোমিন হতে হলে তাওয়াক্কুল অন্যতম প্রধান শর্ত। আত্মিক ও মানসিক অবস্থার একটা উন্নত স্তরের নাম হলো তাওয়াক্কুল। যে উন্নত অবস্থায় উন্নীত হলে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাওয়াক্কুল তার মধ্যে একটা উচ্চতম অবস্থা।

পরিবর্জন

ইহজাগতিক সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ সূফীবাদের একটি অনন্য মর্মবাণী। পার্থিব ভোগ-বিলাস, সূফীবাদের মতে, মনকে মাশুক তথা আল্লাহ হতে দূরে ঠেলে দেয়। তাই সূফীরা সকল প্রকার পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে থাকেন।[২৩১] এই পরিবর্জন দু'ধরনের বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য পরিবর্জনের মাধ্যমে সূফীগণ তাঁদের দৈহিক প্রয়োজন কমিয়ে ফেলেন আর অন্তর পরিবর্জনের মাধ্যমে সূফীগণ ইন্দ্রিয় বস্তুর আবেদন থেকে আত্মাকে মুক্ত করেন। পরিবর্জনের নীতির ব্যাপারে দেখা যায়, কোন কোন সূফী সাধক পার্থিব সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন, আবার কেউ কেউ জীবনের মামুলি প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সবই পরিবর্জন করতেন।[২৩২] আল্লাহ বলেন :

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ–

> নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে তার বিনিময়ে।[২৩৩]

সবর (ধৈর্য)

সবর আরবী শব্দ। এর অর্থ আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। যে শক্তির প্রভাবে মানুষ নিজ প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমনপূর্বক হৃদয়ে সদ্ভাব ও ধর্মীয় মনোবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে,

---

২৩০. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, (ঢাকা: আয়েশা কিতার ঘর, ২০০২), পৃ. ৩৮।

২৩১. আফরোজা বেগম, *ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

২৩২. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, (ঢাকা: আয়েশা কিতার ঘর, ২০০২), পৃ. ৩৮।

২৩৩. আল-কুরআন, ৯:১১১।

তাকেই সবর বলে।[২৩৪] সবর বা ধৈর্য দু'প্রকার, বান্দার যা অর্জিত তার উপরে ধৈর্য ধরা এবং যা বান্দার অর্জিত নয়, তার উপরও ধৈর্য ধরা। অর্জিত অবস্থার উপর ধৈর্য ধরা দু'ধরনের, যা আল্লাহ পালন করার আদেশ দিয়েছেন, তাতে ধৈর্য ধরা এবং যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাতে ধৈর্য ধরা। বান্দার যা অর্জিত নয়, তার উপর ধৈর্যধারণ করার অর্থ হলো আল্লাহর ফয়সালায় তার উপর যা আপতিত হয়েছে, তার কষ্ট সহ্য করা।[২৩৫] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿﴾

যারা ধৈর্যধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব।[২৩৬]

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿﴾

নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুদা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফসলের লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।[২৩৭]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا ۟ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর। যাতে তোমরা সফল হও।[২৩৮]

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿﴾

ধৈর্যশীলদেকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৩৯]

২৩৪. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.) এর জীবন ও কর্ম এবং এলমে তাসাউফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

২৩৫. ইমাম আবুল কাশিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

২৩৬. আল-কুরআন, ১৬:৯৬।

২৩৭. আল-কুরআন, ২:১৫৫।

২৩৮. আল-কুরআন, ৩:২০০।

২৩৯. আল-কুরআন, ২৯:১০।

وَ لَمَنۡ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِکَ لَمِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ ﴿﴾

অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[২৪০]

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿﴾

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।[২৪১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

يحدث في وقت الضربة الأولى للخطر–

সবর হয়ে থাকে বিপদের প্রথম আঘাতের সময়।[২৪২]

إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ–

আল্লাহ বলেছেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দুটি বস্তু অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে ধৈর্যধারণ করে, এর বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করে থাকি।[২৪৩]

عن ابى موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال ليس احد او ليس شئ اصبر على اذى سمعه من الله انهم لبدعون له ولدا وانه ليعابيهم ويرزقهم –

কষ্ট ও ব্যাথাদায়ক কথা শুনার পরও আল্লাহ তা'আলার ন্যায় এত অধিক ধৈর্যধারণ আর কেউ করতে পারে না। এক শ্রেণীর মানুষ তার সন্তান আছে বলা স্বত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করেন এবং রিযিক প্রদান করেন।[২৪৪]

---

২৪০. আল-কুরআন, ৪২:৪৩।

২৪১. আল-কুরআন, ২:১৫৩।

২৪২. আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র.), হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল অনূদিত, *মিনহাজুস সালেহীন* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ২৯০।

২৪৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী* (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০১৩), খণ্ড ৭–১০ একত্রে, হাদীস নং- ৫২৪৪, পৃ. ৫৫৩।

২৪৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৬৩, পৃ. ৬৫১।

ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار : "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحسبه، إلا دخلت الجنة". فقالت امرأة منهن: أو اثنان؟ ثا رسول الله! قال: "أو اثنان".

রাসুলুল্লাহ (সা.) এক আনসারী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে এবং সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে উপস্থিত মহিলাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুটি সন্তান মারা যায় তাহলে কি বেহেশতে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুটি সন্তান মারা গেলেও।[২৪৫]

উপরে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

সূফী সাধনার অন্যতম শর্ত হলো ধৈর্য বা সবর। সূফী সাধনা একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্রমঅগ্রসরমান সাধনা। অতি অল্প সময়ে স্থির লক্ষ্যে পৌছানো এখানে সম্ভব নয়। তাই ধৈর্যধারণ করে সূফীসাধকগণ স্বীয় লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যান। সূফী সাধকগণ জীবনের মূলনীতি হিসেবে সবরের অনুশীলন করে থাকেন। প্রলোভন জয় করে, বিপদ বাধা অতিক্রম করে আল্লাহ প্রেমের পথে টিকে থাকবার একমাত্র অবলম্বন হলো সবর।

শুক্র (কৃতজ্ঞতা)

শুক্র আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা উপকারীরর উপকার স্বীকার করা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ব্যয় করা, মন, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[২৪৬]আল্লাহর প্রতি বান্দার শুক্র আদায়ের অর্থ, নিজের উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনার মাধ্যমে প্রশংসা করা। মূলত আল্লাহর অনুগ্রহ মুখে বলা এবং অন্তরে স্বীকৃতি দেয়াই বান্দার শুক্র। সাধারণ শুক্র আদায়কারী (শাকির) প্রাপ্ত বস্তুর জন্য শুকরিয়া আদায়

---

২৪৫. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.) মাওলানা আ.স.ম. নুরুজ্জামান প্রমুখ অনূদিত, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১), হাদীস নং ৬৫১০, পৃ. ১৬৩।

২৪৬. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.) এর জীবন ও কর্ম এবং এলমে তাসাউফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

করে। কিন্তু বেশি শুক্র আদায়কারী (শাকুর) হারানো বস্তুর জন্য ও শুকরিয়া করে।[২৪৭] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ﴿﴾

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে অবশ্যই তোমাদের আরো বেশি দান করব।[২৪৮]

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ ﴿﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব। আর তোমরা আমার প্রতি শুক্‌রগুযার হও, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[২৪৯]

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণ ইন্দ্রিয়, দর্শন ইন্দ্রিয় এবং হৃদয়, যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পার।[২৫০]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

الطاعم الشكر كم للهاشكر كم للناس الطاعم الشكر كالصائم الصابر-

আহার করে শুকরিয়া আদায়কারী সিয়াম পালন করে সবরকারীর ন্যায়।[২৫১]

---

২৪৭. ইমাম আবুল কাশিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৮।

২৪৮. আল- কুরআন, ১৪:৭।

২৪৯. আল- কুরআন, ২:১৫২।

২৫০. আল- কুরআন, ১৬:৭৮।

২৫১. আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক (র.), হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল অনূদিত, *মিনহাজুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত, ২৯৩।

اشكر كم لله لشكركم للناس –

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর জন্য সর্বাধিক শুকুর আদায়কারী সে যে তোমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।[২৫২]

من اوتى معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره –

যাকে কোন নিয়ামত দান করা হল সে যেন তার আলোচনা করে। যে আলোচনা করল সে কৃতজ্ঞতা আদায় করল এবং যে গোপন করল সে তাতে অকৃতজ্ঞতা দেখাল।[২৫৩]

সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফী-সাধনার অন্যতম মূলনীতি। সকল কল্যাণ আল্লাহর অসীম করুণা থেকে নি:সৃত হয়। সুতরাং সব ধরণের কল্যাণ তাঁরই দান। এই ঐশি কল্যাণের ধারণাই সূফীকে সর্বোতভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের প্রেরণা দেয়। সূফী তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকেন। তাঁর হৃদয়ের আল্লাহ প্রেমকেও তিনি আল্লাহর দান হিসেবে মনে করেন।[২৫৪]

সর্ব অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মানবকূলের জন্য অপরিহার্য। জগতে যা কিছু ঘটে, তা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যই ঘটে। এখানে শুকরিয়া আদায় আল্লাহর ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম গায্যালী (র.) এর মতে, ঈমানই কৃতজ্ঞতার উৎস।[২৫৫] হযরত মূসা (আ.) মুনাজাতে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি হযরত আদম (আ.)কে নিজ হাতে সৃজন করেছ এবং তাঁর প্রতি অমুক অমুক অনুগ্রহ করেছ। কিভাবে তিনি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন?" আল্লাহ বলেন, "আদম (আ.)

---

২৫২. আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র.), হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল অনূদিত, *মিনহাজুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত।

২৫৩. আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (র.), হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল অনূদিত, *মিনহাজুস সালেহীন*, প্রাগুক্ত।

২৫৪. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, ২০০২), পৃ. ৪০।

২৫৫. হযরত ইমাম গায্যালী (র.), আবদুল খালেক অনূদিত, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫), পৃ. ৬৩-৬৪।

হৃদয়গতভাবে জেনেছিল যে, সমস্ত সম্পদই সে আমার নিকট থেকে পেয়েছে এবং তাঁর এই জ্ঞানই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।[২৫৬]

তাসলীম (আত্মসমর্পণ)

স্বীয় মুরশিদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণই সূফী সাধনার মর্মকথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু আল্লাহর জন্য সমর্পিত। সূফী সাধকের আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার প্রারম্ভে মুর্শিদের প্রতি আত্মসমর্পন করা একান্ত প্রয়োজন। ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশ ব্যতীত যেমন কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে সূফী সাধকের পক্ষেও মুর্শিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত না হলে ইলমে মারেফাত অর্জন সম্ভব নয়।[২৫৭] সূফী সাধনার প্রাথমিক স্তরে মুরীদ মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ফানা ফিশ-শায়খের গুণ অর্জন করে। দ্বিতীয় স্তরে এসে মুরীদ নিজের সমস্ত কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্খাকে হাবিবুল্লাহ অর্থাৎ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আশা-আকাঙ্খা, জীবনাচরণের তথা সুন্নাতের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে ফানা ফির-রাসূলের গুণাবলী অর্জন করে। সূফী সাধনার শেষ স্তরে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার মধ্যে সাধকের নিজের ইচ্ছাকে, কামনা-বাসনাকে, মানবিক সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে তথা সমগ্র সত্তাকে মহান আল্লাহর চাওয়াই সাধকের চাওয়া, আল্লাহর পছন্দই সাধকের পছন্দ। আল্লাহ যেখানে সন্তুষ্ট, সাধকও সেখানে সন্তুষ্ট। এ স্তরে সাধকের নিজের বলে কিছুই থাকে না।[২৫৮]এমনিভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সূফী সাধক আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হয়ে থাকেন।

ইখলাস (পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা)

পবিত্রতা সূফী সাধনার পূর্ব শর্ত। সূফীগণ আন্তরিকতার সাথে ইবাদত করে কলবের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করেন। সূফীদের মতে, একমাত্র পূত:পবিত্র কলবে আল্লাহর নূর প্রতিবিম্ব

---

২৫৬. প্রাগুক্ত।

২৫৭. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, (ঢাকা: আয়েশা কিতার ঘর, ২০০২), পৃ. ৩৮।

২৫৮. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.)-এর জীবন ও কর্ম এবং এলনে তাসাউফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

হয়।[২৫৯]আত্মার পবিত্রতার জন্য সূফীগণ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকেন। কেননা ইহজাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ আত্মাকে কলুষিত করার সম্ভাবনা রাখে। সূফীগণ বিশ্বাস করেন যে, পূত–পবিত্র অন্ত:করণে আল্লাহর ধ্যানে একাগ্রতা অর্জিত হয়।[২৬০] আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত্য প্রদর্শন এবং পার্থিব বস্তুর মোহপাশ এড়ানোর মাধ্যমে সূফী অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করে।

মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই ইখলাস বলে। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁর ইবাদত বন্দেগী করাকেই ইখলাস বলে।[২৬১] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۞

নিশ্চয়ই যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সব সময় প্রতিপালকের স্মরণ করে এবং নামাজ কায়েম করে, সে ব্যক্তিই সুখী ও সফল।[২৬২]

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ–

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য।[২৬৩]

ইশ্‌কে এলাহী (আল্লাহ প্রেম)

একমাত্র আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত মহব্বত। আল্লাহর প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়ে যাওয়া অথবা আল্লাহপাকের ভালবাসায় মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা এবং আল্লাহতায়ালার ভালবাসা ছাড়া আর কারো ভালবাসা হৃদয়ে স্থান না পাওয়ার নামই প্রকৃত মহব্বত বা ইশকে এলাহী। আল্লাহর সাথে বান্দার এরূপ গভীরতম ভালবাসায় আবদ্ধ হওয়ার নামই প্রকৃত

---

২৫৯. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সূফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

২৬০. আফরোজা বেগম, *ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

২৬১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

২৬২. আল-কুরআন, ৮৭:১৪-১৫।

২৬৩. আল-কুরআন, ৩৯:৩।

ইশ্‌ক।[২৬৪]আল্লাহ প্রেমই সূফীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফীবাদের মন সর্বদা আল্লাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই সূফীকে আল্লাহর চিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারে না; এই কারণে সূফীবাদ প্রেমধর্ম নামে পরিচিত।[২৬৫]

সূফী তত্ত্বে এমন এক ধরণের ভালবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই সর্বোচ্চ পর্যায়ে বান্দা তার প্রভুর সাথে একাত্ম হয়ে যান। সূফীবাদীদের মতে, মানবিক ভালবাসার সর্বোচ্চ রূপটি হল স্বর্গীয় সত্তার সাথে মিলবন্ধন। মানুষ এই ভালবাসা অর্জন করতে পারে, যদি সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দেয়। ফলে এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। জীবনের সকল আবেগ, আকাঙ্খা, প্রীতি প্রেম আল্লাহর জন্যই বরাদ্দ। সূফী সাধকগণ বিশ্বাস করেন ভালবাসার মধ্য দিয়ে জগতের সমগ্র সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।[২৬৬] আল্লাহকে ভালাবাসার নির্দেশ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ-

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।[২৬৭]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ-

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে।[২৬৮]

---

২৬৪. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

২৬৫. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

২৬৬. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাখ প্রমুখ, *সুফি দর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২৬৭. আল-কুরআন, ৩:৩১।

২৬৮. আল-কুরআন, ৫:৫৪।

যিকির (স্মরণ)

যিকির আরবী শব্দ। এর আভিধারিক অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। শরী'আতের পরিভাষায় মহান আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামাবলী, গুণাবলী, আদেশ নিষেধ, বিধি বিধান, পুরস্কার ইত্যদি বিষয়গুলো মনের দ্বারা এবং মুখের ভাষা দ্বারা স্মরণ করা এবং করানোর নামই যিকির।[২৬৯]

আল্লাহর স্মরণকে যিকির বলে। সূফীবাদে আল্লাহর নাম বারবার উচ্চরণ করাই হল যিকির। যিকির দু'ভাবে হয়ে থাকে। উচ্চস্বরে ও নীরবে। উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে 'যিকিরে জলী' এবং নীরবে বা মনে মনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে 'যিকিরে খফী' বলা হয়। নিজ সত্তায় বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য লাভ করা হলো যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। এর দ্বারা আল্লাহর ধ্যানে একাগ্রতাও অর্জিত হয়।[২৭০] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

হে ইমানদারগণ! যতবেশী পার আল্লাহর যিকির কর, আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা বর্ণনা কর।[২৭১]

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ–

যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর।[২৭২]

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।[২৭৩]

---

২৬৯. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.)-এর জীবন ও কর্ম এবং এলনে তাসাউফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

২৭০. আফরোজা বেগম, *ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

২৭১. আল-কুরআন, ৩৩:৪১-৪২।

২৭২. আল-কুরআন, ৪:১০৩।

২৭৩. আল-কুরআন, ২০:১৪।

وَ اذۡکُرۡ رَّبَّکَ فِیۡ نَفۡسِکَ تَضَرُّعًا وَّ خِیۡفَۃً وَّ دُوۡنَ الۡجَہۡرِ مِنَ الۡقَوۡلِ بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ وَ لَا تَکُنۡ مِّنَ الۡغٰفِلِیۡنَ ﴿۲۰۵﴾

আর তুমি তোমার প্রভুর যিকির কর মনে মনে সবিনয়ে ও ভীত বিহ্বল চিত্তে অনুচ্চ স্বরে ভোরে ও সন্ধ্যায় এবং অমনোযোগী হয়ো না।[২৭৪]

فَاذۡکُرُوۡنِیۡۤ اَذۡکُرۡکُمۡ وَ اشۡکُرُوۡا لِیۡ وَ لَا تَکۡفُرُوۡنِ ﴿۱۵۲﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[২৭৫]

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُہُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰہِ ؕ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰہِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ﴿۲۸﴾

মুমিন বান্দার অন্ত:করণ আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি অনুভব করে। আল্লাহর যিকির ব্যতীত কিছুই আত্মার শান্তি আনয়ন করতে পারে না।[২৭৬]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ –

মহিমাময় পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার ওষ্ঠদয় আন্দোলিত হয়, তখন আমি তার সাথে থাকি।[২৭৭]

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ–

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার যিকির করে এবং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার যিকির করে না, তাদের উদাহরণ হলো প্রাণময় ও প্রাণহীনের মতো।"[২৭৮]

---

২৭৪. আল-কুরআন, ৭:২০৫।

২৭৫. আল-কুরআন, ২:১৫২।

২৭৬. আল-কুরআন, ১৩:২৮।

২৭৭. ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ্, *কিতাবুল আদাব, বাবু ফাদলিয যিকর*, খণ্ড-১১শ, হাদীস নং- ৩৭৯২, পৃ. ২৩৫।

২৭৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহ *আল-বুখারী*, *কিতাবুদ দা'ওয়াত*, *বাবু ফাদলিয যিকির*, ২০শ খণ্ড, হাদীস নং- ৫৯২৮, পৃ. ২৩।

أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون–

"তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর, যেন তারা বলে, একটা পাগল।"[২৭৯]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলতে পারি যে, মহান আল্লাহ তা'আলাকে শয়নে-স্বপনে, উঠতে-বসতে হরদম স্মরণ করাই আমাদের কর্তব্য। এভাবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর স্মরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সূফী সম্প্রদায়ের ইমামগণ বিভিন্ন সময়ে যিকিরের বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি প্রচলন করেছেন, যা পালন করে সাধকগণ শত ব্যস্ততার মধ্যেও যেন যিকিরে এলাহীতে মগ্ন থাকতে পারে।

কাশ্‌ফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)

সূফীদর্শন অনুযায়ী কাশ্‌ফ বা স্বজ্ঞা নামক অতিন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সাধক আল্লাহকে জানতে পারেন। কাশ্‌ফ এমন এক ধরনের অন্তদৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত–ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্ম, আল্লাহর যাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান।[২৮০] কাশ্‌ফ দুই প্রকার, কাশফে কওনী ও কাশ্‌ফে ইলাহী। ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়াকে কাশ্‌ফে কওনী বলে। সলক বা শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কে যাত ও সিফাত সম্পর্কে ইলম এবং মারিফাতের কোন সূক্ষ্ম বিষয় অন্ত:করণের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা আধ্যাত্মিক জগতের কোন জ্ঞান আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হওয়াকে কাশ্‌ফে ইলাহী বলে।[২৮১]

সূফীদের মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সাধক আল্লাহর সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারেন। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূফীকে আল্লাহর জ্ঞান দিতে পারে না। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আসে সূফীর তন্ময়তা বা ফানাফিল্লাহ অবস্থায়। সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে

---

২৭৯. ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ*, ১৪১৪/১৯৯৩), ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৮১৭, পৃ. ৯৯।

২৮০. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৮১. অধ্যাপক আবদুল মালেক নূরী, *সুফীবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

সূফী যখন কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তখন এক অপরিসীম শক্তির প্রাবল্যের স্পর্শে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি বিস্মৃত হন, অনুভূতির এমন নিবিড় মুহূর্তে তিনি আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সূফী অভিজ্ঞতার এই নিবিড় মুহূর্তের নাম 'হাল'। এই অবস্থায় ঐশী জগতের অপার রহস্যের দ্বার সূফীর অন্তরচক্ষুর সামনে খুলে যায়। চাওয়ার চরম প্রাপ্তি মুহূর্তে সূফী পরম আনন্দে নিজেকে বিস্মৃতি হন, সাময়িকভাবে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়।[২৮২]সূফীদের নিকট কাশ্‌ফলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

সামা (সঙ্গীত)

'সামা' আরবী শব্দ। এর অর্থ শ্রবন করা, ইশ্‌কে এলাহীর বৃদ্ধি করণার্থে সূফীগণ যে যন্ত্রসহ বা বিনা যন্ত্রের সাহায্যে গান করে থাকেন বা গান শুনে থাকেন তাকেই তাসাউফের ভাষায় 'সামা' বলে।[২৮৩]মূলত: আল্লাহর প্রেমমূলক সংগীতকে 'সামা' বলে অভিহিত কর হয়। সঙ্গীত মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। সূফীবাদে যে সঙ্গীতের কথা উল্লেখ রয়েছে তা মানুষের দৈহিক অনুভূতি নয়, মানসিক অনুভূতির সাথে জড়িত। কোন কোন সূফী সঙ্গীতপ্রিয়, তাঁরা মনে করেন যে, সংগীতের মূর্চ্ছনা অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং মনকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। চিশতিয়া তরিকার সূফীগণ সঙ্গীত শ্রবন সমর্থন করেন। তাঁরা তাম্বুরা বাজিয়ে সামা গেয়ে আধ্যাত্মিক তন্ময়তা জাগিয়ে তোলেন। সঙ্গীত তাঁদের 'জজবা'র পর্যায়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য সূফীরা সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, আল্লাহর যিকিরই তন্ময়তা প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট বলে তাঁরা মনে করেন।"[২৮৪]

হাল (ভাবাচ্ছাস)

সূফীদের নিকট হাল হলো এমন একটি তাৎপর্য, যা তাদের হৃদয়ে তাদের ইচ্ছে করা, নিয়ে আসা অথবা অর্জন করা ছাড়াই এসে পড়ে। যেমন প্রফুল্লতা, বিষন্নতা, সঙ্কোচন, সম্প্রসারন, আকাঙ্খা, অস্বস্তি, ভীতি অথবা অস্থিরতা। হালসমূহ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে

---

২৮২. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

২৮৩. খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান, *শরফুল ইন্সান বা খোদা-প্রাপ্তি সোপান* (ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৬৯।

২৮৪. ড. রশীদুল আলম, *সূফী সাধনার ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

আসে।[২৮৫]সূফীর ভাবানুভূতির বা আধ্যাত্মিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থাকে 'হাল' বলা হয়। সালিকের অন্তররাজ্যে যখন আল্লাহর মহব্বতের বিশেষ নূর সৃষ্টি হয়, যা সূফীকে কাশফের মাধ্যমে সত্যের স্বরূপকে জানতে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ গতির সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণত 'হাল' বলা যেতে পারে। 'হাল' কাশফের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা। 'হাল' সূফীমনের এমন এক ভিত্তি, যার উপর হৃদয়ানুভূতি বা অন্তদৃষ্টি গড়ে ওঠে। যা ফানাফিল্লাহ অবস্থা লাভের জন্য বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেউ ইচ্ছা করলেই 'হাল' লাভ করতে পারে না। 'হাল' আল্লাহর অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার উপর নির্ভরশীল। 'হাল' লাভ করার পর তাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা সাধক করতে পারেন। 'হাল' সূফীর আধ্যাত্মিক জীবনের এক চরম প্রাপ্তি। এটা সূফী জীবনের সবচেয়ে নিবিড় অভিজ্ঞতা।[২৮৬]

ফানা

'ফানা' অর্থ আত্মবিনাশ। এই আত্মবিনাশ মানে আত্মার ধ্বংস নয়। কেননা আত্মা অমর, শাশ্বত ও চিরন্তন। আত্মগরিমা, আত্ম-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ লালসা, কামনা, নিন্দা, দুনিয়ার ভালাবাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবিক গুণ ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহর গুণাবলী লাভ করা। অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেওয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহর অসীম যাতের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে লীন করে দিয়ে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়ার অবস্থাকেই 'ফানা' বলে অভিহিত করা যায়।[২৮৭] এ স্তরে সাধক তার যাবতীয় ইচ্ছা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, চিন্তা-চেতনা, বিচার-বুদ্ধি, বোধ-অনুভূতি, এমনকি নিজের অস্তিত্বকেও আল্লাহর সত্তায় লীন করে দেন। এ স্তরে একজন সাধকের আত্মা আধ্যাত্মিক জ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এ সময় সাধক সর্ব হালতে মহান আল্লাহর চিন্তায় বিভোর থাকেন। আধ্যাত্মিক সাধনার এ স্তরে সূফী সাধক জ্ঞান ও

২৮৫. ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২৮৬. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৮৭. প্রাগুক্ত।

প্রেমের আলোকে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেন। শরী'আতের ঐহিত্যগত জ্ঞান, তরীকতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও মারিফাতের বিচার বুদ্ধিগত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে, আত্মিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই স্বজ্ঞার মাধ্যমে সাধক পরম সত্য বা মহান আল্লাহকে চরমভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।[২৮৮]

বাকা

'বাকা' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহতে স্থিতি লাভ করা। ফানাফিল্লাহ অবস্থায় যখন সাধক স্বীয় অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলে তখন তার 'আপনাতে আপনার কিছুই থাকে না।' এ অবস্থায় সেখানে আল্লাহই বিরাজ করেন। সাধক আল্লাহতে ফানা হবার পরই বাকা স্তরে উন্নীত হতে পারে। ফানায় যখন 'শূণ্যত্বের শূন্য' সৃষ্টি হয় তখই বাকা বা সেখানে ফিত্‌রাল্লাহ্‌ (আল্লাহ প্রকৃতি ও স্বভাব) এবং তাঁর অস্তিত্বের অনুরূপ রূপ প্রকাশ পায়।[২৮৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا– "আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিজের ফিতরাতে সৃষ্টি করেছেন।"[২৯০] হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আদমকে স্বীয় আকৃতিতে (সুরতে) সৃষ্টি করেছি।"[২৯১] মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধিকে নিধির মতোই হতে হয়, না হয় প্রতিনিধি হওয়া যায় না। ফানাফিল্লাতে বিনাশন বা ধ্বংস। অপর পক্ষে বাকাবিল্লাতে পুনর্জীবন লাভ। বাকা মানে ঐশী সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করা। এই স্তরে সূফী সাধক আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন। বাকা বিল্লাহ অবস্থায় সাধক ঐশী গুনে গুণান্বিত হন এবং তাঁর সমুদয় ইচ্ছা খোদার ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হয়।[২৯২] প্রকৃতপক্ষে ফানা ও বাকা একই জিনিসের দুটি দিক মাত্র । ফানা বাহ্যিক দিক, বাকা অভ্যন্তরীণ দিক। বাহ্যিক দিকের পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরিণ দিক বা সত্তার দিক সাধক দেখতে পায়। সকল বাধা বা পর্দা উন্মোচিত হলে

---

২৮৮. ড. মোঃ আজম আলী খান, *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র.)-এর জীবন ও কর্ম এবং এলমে তাসাউফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১।

২৮৯. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

২৯০. আল-কুরআন, ৩০:৩০।

২৯১. ইমাম আল-গাযালী, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

২৯২. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

পরমসত্তাকে বিশ্বের অন্তব্যাপী পরম ঐক্য –সত্তারূপে দেখা যায়। অন্য কথায় পর্দা দূর হলে পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে। এটাই বাকাবিল্লাহ সাধকের, সর্বশেষ স্তর। মোটকথা এ স্তরে সাধক আল্লাহর চিরন্তরন, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন।[২৯৩]

সূফীবাদে বিশ্বাসগত অবস্থান (Beliefs in the Sufism)

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার উপায় হিসাবে সূফীসাধকগণ কিছু বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্ম পরিকল্পনা করে থাকেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

বাইয়াত

বাইয়াত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয় শর্তে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়া। কেননা ‘বাইউন’ শব্দ থেকে ‘বাইয়াত’ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। ‘বাইউন’ শব্দের অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা। ক্রয়-বিক্রয় অর্থে যেমন বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি থাকে তদ্রুপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিষয়কেই বাইয়াত বলা হয়।[২৯৪] ইসলামের পারিভাষিক অর্থে মুসলমানগণ জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-ইয্যত, এমনকি প্রয়োজনবোধে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও ইসলাম রক্ষার্থে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক বা আমীরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া তথা শপথ গ্রহণ করাকেও বাইয়াত বলা হয়।[২৯৫] আবার তাসাউফ শাস্ত্রে বা তরীকতের অর্থে তরীকতের উস্তাদ অথবা আধ্যাত্মিক পীর-মুর্শিদের হাতে হাত রেখে আত্মোৎকর্ষ বা আত্মিক উন্নতিকল্পে তথা আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের দৃঢ় সংকল্পে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়াকেও বাইয়াত বলা হয়।[২৯৬]

শরীয়তের কোন বিষয়ের জন্য জনগণ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া, চাই পূর্ণ শরীয়তের আকীদার নেওয়া হোক কিংবা আংশিক একে বাইয়াত বলে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

---

২৯৩. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২৯৪. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

২৯৫. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

২৯৬. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

বেশ কিছু স্থানে বিষয়টির বাস্তবায়ন করেছেন। অনুশীলন করে বুজিয়েছেন এর নাম বাইয়াত। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির কাছে চার প্রকার বাইয়াত করেছেন। যেমন–

১. বাইয়াতে ইসলাম ২. বাইয়াতে জিহাদ

৩. বাইয়াতে হিজরত ৪. বাইয়াতে তওবা বা তরীকত।[২৯৭]

সকল পীর-মাশায়েখ এ বিষয়ে একমত যে, পরিপূর্ণ নাজাতের জন্য আন্তরিকভাবে খাঁটি তওবা এবং স্বীয় আত্মশুদ্ধি লাভ করা একান্ত জরুরী, যা সৎ ও নেককারদের সোহবত, মহব্বত এবং তাঁদের অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমেই হাছিল হতে পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, পীর সাহেবের হাতে হাত রেখে তওবা করত: আত্মশুদ্ধির জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার দ্বারা এ কাজ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে এ বাইয়াতের দ্বারা পীর সাহেবের সুদৃষ্টি ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়। এসব দিক লক্ষ্য করে সকল সিলসিলায় এ বাইয়াত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শাইখ মুরীদের ডান হাত নিজের ডান হাতে নিয়ে বাইয়াত নেন। মজলিসের লোকজন সংখ্যায় অধিক হলে রুমাল বা অন্যকিছুর দ্বারা বাইয়াত নেওয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের বাইয়াত নেওয়া হয় পর্দার আড়াল থেকে, যেখানে তার কোন মাহরাম পুরুষ উপস্থিত থাকবে এবং রুমাল বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বাইয়াত নেওয়া হবে। শাইখের নিকট উপস্থিত হতে না পারলেও বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। এ পদ্ধতির বাইয়াতকে 'বাইয়াতে উসমানী' বলা হয়।[২৯৮] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ

وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا

بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে, কখনো শত্রু নিধন করে, কখনো

২৯৭. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৭।

২৯৮. মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৫ হিজরী), পৃ. ৪০-৪১।

শহিদ হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এই বিশ্বাসীদের জন্য তিনি সুস্পষ্টভাবে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ওয়াদাপালনকারী আর কে হতে পারে? অতএব (হে বিশ্বাসীরা) আল্লাহর সাথে যে লেনদেন করেছ (বাইয়াত হয়েছ) সেজন্য আনন্দে উদ্বেলিত হও। নি:সন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।[২৯৯]

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُبَايِعُوۡنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوۡنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوۡقَ اَيۡدِيۡهِمۡ ۚ فَمَنۡ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنۡكُثُ عَلٰى نَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ اَوۡفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيۡهُ اللّٰهَ فَسَيُؤۡتِيۡهِ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿﴾

হে নবী! যারা আপনার কাছে বাইয়াত অর্থাৎ অনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল, তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল। (তারা যখন আপনার হাতের ওপর হাত রেখেছিল তখন) তাদের হাতের উপর ছিল আল্লাহর হাত। এতএব যে এ শপথ ভাঙ্গবে সে এর পরিণাম ভোগ করবে। আর যে শপথ রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কারে সম্মানিত করবেন।[৩০০]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الۡمُؤۡمِنٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلٰٓى اَنۡ لَّا يُشۡرِكۡنَ بِاللّٰهِ شَيۡـًٔا وَّ لَا يَسۡرِقۡنَ وَ لَا يَزۡنِيۡنَ وَ لَا يَقۡتُلۡنَ اَوۡلَادَهُنَّ وَ لَا يَاۡتِيۡنَ بِبُهۡتَانٍ يَّفۡتَرِيۡنَهٗ بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِنَّ وَاَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِيۡنَكَ فِىۡ مَعۡرُوۡفٍ فَبَايِعۡهُنَّ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿﴾

হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন আপনার কাছে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ করতে এসে ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবেনা, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ঘোষিত ন্যায্য বিষয়ে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[৩০১]

---

২৯৯. আল-কুরআন, ৯:১১১।

৩০০. আল-কুরআন, ৪৮:১০।

৩০১. আল-কুরআন, ৬০:১২।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلاَمِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ–

হযরত জাবীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাতে কতিপয় শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। তার একটি হল, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা।[৩০২]

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ـ رضى الله عنه ـ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا...–

হযরত উবাদাহ ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশাল একদল সাহাবা দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। এ সময় তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা আমার (হাতে) এ কথার উপর বাইয়াত নাও যে, তোমরা শিরক করবেনা এবং চুরি করবে না।[৩০৩]

عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " . فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ " . قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا – وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً – وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ .

হযরত আওফ ইবনে মালেক আল-আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা.) এর খিদমতে হাজির ছিলাম। সংখ্যায় আমরা ৯, ৮

---

৩০২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী* (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০১৩), খণ্ড ৫ম, হাদীস নং- ২৫১৮, পৃ. ৬৪০।

৩০৩. প্রাগুক্ত, *কিতাবুল ঈমান*, খণ্ড-১ম, হাদীস নং- ১৭, প্রাগুক্ত. পৃ. ৪২।

কিংবা ৭ জন। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাইয়াত নিচ্ছ না কেন? আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে বললাম, কোন বিষয়ে আপনার থেকে বাইয়াত নেব হে আল্লাহর রাসূল? তিনি ইরশাদ করলেন, এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, হুকুম-আহকাম মান্য করবে। একটি বিষয় অনুচ্চস্বরে বললেন যে, মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (তাদের) বাইয়াত নেওয়া লোকদের কাউকে কাউকে এমনও দেখেছি যে, ঘটনাক্রমে তাদের কারো হাত থেকে চাকুক পড়ে গেলেও সেটি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে বলেননি।"[৩০৪]

عن ابن عمر قال ان رسول الله قام يعنى يوم بدر فقال ان عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله وانى ابايع له فضرب له رسول الله بسهم ولم يضرب لاحد غاب غيره-

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের দিনে দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত উসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাজে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে আমি বাইয়াত করছি।[৩০৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পেয়েছিলেন। তাঁর মা যায়নাব বিনতে হুমায়দ তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমীপে এসে আরয করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁকে বাইয়াত করে নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছিলেন, ওতো বাচ্চা। পরে তিনি তার মাথায় হস্ত পরশ বুলিয়ে দোয়া করেছিলেন।[৩০৬]

---

৩০৪. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহ.), *সহীহ মুসলিম*, খণ্ড-২য়(বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮) হাদীস নং- ১০৪৩।

৩০৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল-আশআস, *সুনানে আবূ দাউদ*, *কিতাবুল জিহাদ*, (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৯৯৯) হাদীস নং- ২৭২৬।

৩০৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, *কিতাবুল শিরকাহ*, *বাবু ফিশ শিরকাতি ফিত্তায়মী ওয়া গায়রিহি*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২), হাদীস নং- ২৫০১, ২৫০২।

মুর্শিদের আবশ্যিকতা

'মুর্শিদ' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ দিশারী। যিনি তরীকতের পথে তাঁর ভক্ত বা শিষ্যদেরকে দিশা দিয়ে থাকেন, তিনিই দিশারী বা মুর্শিদ নামে অভিহিত হয়ে আসছেন।[৩০৭] মুর্শিদের প্রতিশব্দ পীর। পীর শব্দটি ফার্সী। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ, বয়স্ক, প্রবীণ, পরিপক্ক, অভিজ্ঞ। যিনি ইলমে তাসাউফ ও তরীকতের বিদ্যায় পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, অভিজ্ঞ, পারদর্শী বা আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ, তিনিই মুসলমানদের নিকট পীর নামে পরিচিত।[৩০৮]

যে কোন বিষয়ে পরদর্শিতা বা অভিজ্ঞতা অথবা কোন বিষয়ে কামিয়াবী লাভ করতে হলে সে বিষয়ে যেমন কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তদ্রুপ আল্লাহকে জানা-চেনা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যও একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ তথা মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। পরিপূর্ণ নাজাতের জন্য আন্তরিকভাবে খাঁটি তওবা এবং স্বীয় আত্মশুদ্ধি লাভ করা একান্ত জরুরী, যা সৎ ও নেককারদের সহবত, মহব্বত এবং তাঁদের অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমেই হাছিল হতে পারে। আমলের স্পৃহা, শক্তি এবং কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আলোকে অন্তর পবিত্রকরণ এসব বিষয় সাধারণত শুধু কিতাব দ্বারা হয় না, বরং এসব মহান উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহওয়ালাদের সহবত-সংশ্রব এবং তাদের কাছ থেকে হিম্মতের তরবিয়ত গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। নফ্সের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য একজন মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[৩০৯]

প্রতিটি যুগ ও কালে আল্লাহ মানবতার হেদায়েতের কাজ 'কিতাবুল্লাহ' ও 'রিজালুল্লাহ' দ্বারা নিয়ে আসছেন। বাগ-ই আদমে কতবার এমনও দেখা গেছে যে, নবী প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু কিতাব দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে এমন কখনও দেখা যায়নি যে, কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে অথচ নবী প্রেরণ করা হয়নি। এর দ্বারা 'রিজালুল্লাহ' (আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিবর্গ) এর গুরুত্ব বোঝা যায়। আল্লাহ কোন কওমকে ততক্ষন ধ্বংস করেননি যতক্ষন না কোন রাসূল

৩০৭. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

৩০৮. প্রাগুক্ত।

৩০৯. মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

সেখানে প্রেরণ করেছেন।[৩১০] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿﴾ "সচেতন করার জন্যে রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দেই না।"[৩১১] কুরআন ও হাদীসে দ্বীনী ব্যাপারে হেদায়াতপ্রাপ্ত, সৎ, নেককার, অভিজ্ঞ আলেম, পুন্যবান এবং আল্লাহর রূহের পথিকদের সান্নিধ্য অর্জন করতে তাঁদের শরণাপন্ন হতে এবং তাঁদেরকে অনুকরণ-অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাশ্রয়ীদের সাথে থাকো।[৩১২]

وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ–

'যারা বিশুদ্ধচিত্তে আমার পথে চলে শুধু তাদেরকেই অনুসরণ করবে।[৩১৩]

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿﴾

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা অনুসরণ করবে তারা নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের সঙ্গী হবে। এরাই উত্তম সঙ্গী।[৩১৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ–

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে প্রাজ্ঞ নেতার আনুগত্য কর।[৩১৫]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿﴾

---

৩১০. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৩১১. আল-কুরআন, ১৭:১৫।

৩১২. আল-কুরআন, ৯:১১৯।

৩১৩. আল-কুরআন, ৩১:১৫।

৩১৪. আল-কুরআন, ৪:৬৯।

৩১৫. আল-কুরআন, ৪:৫৯।

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ সচেতন হও! তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় অন্বেষন কর। আল্লাহর পথে নিরলস কাজ কর। তাহলেই তোমরা সফল হবে।[৩১৬]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عن أبي زر رضي الله عنه مرفوعاً: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَق بهم؟ قال :المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ –

হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বললাম, এক লোক কোন দলের সাথে মহব্বত রাখে, কিন্তু তাদের সমান্তরাল আমল-ইবাদত করতে পারে না। তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবু যর! তুমি তার সাথেই থাকবে, যার সাথে মহব্বত রাখ।[৩১৭]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, রূহসমূহ রূহের জগতে দলবদ্ধ অবস্থায় ছিল। এরা পরস্পর পরস্পরকে চিনত। ওখানে যাদের পরিচয় ছিল, এখানে (পৃথিবীতে) তাদের বন্ধুত্ব থাকবে। আর ওখানে যাদের পরিচয় ছিল না তারা এখানে মতানৈক্যপ্রবণ হবে।[৩১৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَن النبيَّ –صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم –قَالَ : الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِل–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ তার বন্ধুর মতাদর্শের উপর থাকে। সুতরাং কিছু দেখভাল করে নিও যে, কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছো।[৩১৯]

روى أبو داود أن نبي صلى الله عليه وسلم قال : إنل العلماء ورثة الأنبياء–

---

৩১৬. আল-কুরআন, ৫:৩৫।

৩১৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদব* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২), হাদীস নং- ৬১৬৭।

৩১৮. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ, *সুনানে আবু দাউদ* (ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, ২০০৮), হাদীস- ৪৭৬১, পৃ. ১০২৩।

৩১৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৭৬০, পৃ. ১০২৩।

> হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ওলামায়ে কেরাম নবীদের উত্তরাধিকারী।[৩২০]
>
> عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ " -
>
> হযরত আনাস ইবন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষ ঐ ব্যক্তির সাথে থাকবে যার সাথে (দুনিয়াতে) সে মহব্বত রাখত। আর সে যাই কামাই করেছে এরই কেবল প্রতিদান পাবে।[৩২১]

উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি থেকে বোঝা যায় যে, পীর-মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আল্লাহপাকের এই রহস্যময় জগত জানতে হলে, বুঝতে হলে, চিনতে হলে তাঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করা অত্যাবশ্যক। কেননা তাদের হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়ে আছে। আমরা বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা যা বুঝতে পেরেছি তার বাইরেও অনেক কিছু জানার ও বোঝার রয়েছে। তাই গুপ্তজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করতে এবং সেই জগতের যাত্রী হতে হলে যাত্রা পথে চাই একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদ।

তাওয়াসসুল (ওছিলা)

তাওয়াসসুল আরবি শব্দ। এটি ওয়াসিলা, উসিলা বা উসীলা ধাতু হতে উদ্ভুত। উসিলা হল একটি উপায় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, এবং তা লাভ

---

৩২০. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশআস, *সুনানে আবু দাউদ*, *কিতাবুল ইলম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৪১, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী, জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০), হাদীস নং- ২৬৮২।

৩২১. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত্‌তিরমিযী, *জামে তিরমিযী*, *কিতাবুল যুহদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০), হাদীস নং- ২৩৮৬।

করা বা অর্জন করা যায়।[৩২২] তাওয়াসসুল বা ওছিলা আরবী শব্দ। এর অর্থ মাধ্যম। পারিভাষিক অর্থে ওছিলা হলো, কোন নেক মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এটি এমন একটি মাধ্যম, যাকে ধরে ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করে।[৩২৩]

ওছিলা শব্দের অর্থ হল- যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওছিলা। ঈমান ও সৎ কর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও সৎ কর্মীদের সৎসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। এ কারণেই তাদেরকে ওছিলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েজ।[৩২৪] মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে মকসুদ পূরণের নিমিত্তে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য নেক আমল, নেককার ব্যক্তি ওছিলা হিসেবে পেশ করা পবিত্র কুরআনও হাদিস দ্বারা স্বীকৃত এবং সমর্থিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য ওছিলা তালাশ কর।[৩২৫]

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿﴾

প্রতিটি জনপদে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য একটাই; আর তা হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করবে। তারা যদি নিজেদের উপর জুলুম করার

---

৩২২. Julian, Millie, "Supplicating, naming, offering: *Tawassul in west java." Jurnal of Southeast Asian studies*, volume 39, Issue 1, February 2008, P. 107-122.

৩২৩. ড. মুফতী মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী, *আত্মার সংশোধন ও পরিচর্যা* (ঢাকা: রিয়াদুল জান্নাহ, ২০১৭), পৃ. ৫১৮।

৩২৪. ড. মুহাম্মদ মুযাম্মিল আলী, *শিরক কী ও কেন?* (সিলেট: এডুকেশন সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ৩৯০।

৩২৫. আল-কুরআন, ৫:৩৫।

পর আপনার কাছে এসে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করত আর আপনিও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালুরূপে পেত।[৩২৬]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই গুণাহগার বান্দাদের হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে যেতে বলেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে বা ওছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَ كَسَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

"আর (হে নবী) আপনি তাদের ধনসম্পত্তি থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির পথে এগিয়ে দিন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন এবং আপনার দোয়া তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।"[৩২৭]

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَ اْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞

আমার (ইউসুফ (আ.)) জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা পিতার মুখের উপর রাখ, এতে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন, আর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমার কাছে আসবে।[৩২৮]

এই আয়াতে ইউসুফ (আ.) যখন জানলেন তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.) এর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে তখন তিনি তাঁর আরোগ্যের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক ওছিলা হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন।

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

৩২৬. আল-কুরআন, ৪:৬৪।

৩২৭. আল-কুরআন, ৯:১০৩।

৩২৮. আল-কুরআন, ১২:৯৩।

> তারপর সুসংবাদ বহনকারীরা যখন ইউসুফের জামা নিয়ে তাঁর মুখের উপর রাখল, তখন সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। তখন ইয়াকুব বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না।[৩২৯]

এই আয়াতে দেখা যায় যে, যখন ওছিলা স্বরূপ জামাটি ইয়াকুব (আ.) এর মুখে রাখা হলো সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরে এলো। সুতরাং দেখা গেল হযরত ইউসুফ (আ.) এর জামাটিই ছিলো আরোগ্যের ওছিলা।

> أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿﴾
>
> নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখি বানাব, তারপর তাতে ফুঁ দেব। আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে উড়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করব, মৃতকে জীবিত করব। তোমাদের বলে দেব, তোমরা ঘরে কি খাও আর কি মজুদ কর। এ সবকিছুর মধ্যেই তোমাদের জন্য লক্ষনীয় নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৩৩০]

উক্ত আয়াতে ঈসা (আ.) এর ফুঁয়ের ওছিলায় মাটি দ্বারা তৈরী পাখি জীবন্ত হয়ে যেত শুধু তাই নয়, তাঁর ওছিলায় কুষ্ঠ রোগী, জন্মান্ধ সুস্থ হতো এবং মৃত ব্যক্তিও জীবন ফিরে পেত।

> قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿﴾
>
> ‘আপনি বলুন, মালাকুল মউত তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, পরে তোমরা রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।[৩৩১]

---

৩২৯. আল-কুরআন, ১২:৯৬।

৩৩০. আল-কুরআন, ৩:৪৯।

৩৩১. আল-কুরআন, ৩২:১১।

সকল জীবন্ত প্রাণীর জীবন হরণ করার জন্য ওছিলা হিসাবে কাজ করছেন মালাকুল মওত বা মৃত্যুর ফেরেশতা।

قَالُوۡا یٰۤاَبَانَا اسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَاۤ اِنَّا کُنَّا خٰطِـِٕیۡنَ ﴿۹۷﴾

তাঁর পুত্ররা তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আল্লাহর কাছে আমাদের পাপমুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা সত্যিই অপরাধী।[৩৩২]

এই আয়াতের ভাষ্যমতে, হযরত ইয়াকুব (আ.) এর পুত্ররা তাদের পিতার ওছিলায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوۃِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۳﴾

হে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ! তোমরা সালাতের মাধ্যমে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[৩৩৩]

এই আয়াতে ধৈর্য এবং সালাতের ওছিলা দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

وَ اَمَّا الۡجِدَارُ فَکَانَ لِغُلٰمَیۡنِ یَتِیۡمَیۡنِ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ وَ کَانَ تَحۡتَهٗ کَنۡزٌ لَّهُمَا وَ کَانَ اَبُوۡهُمَا صَالِحًا-

আর প্রাচীরের ব্যাপার; তা ছিল নগরীর দুটি এতিম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের উভয়ের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা-মাতা ছিলেন নেককার ব্যক্তি।[৩৩৪]

এই আয়াতে পিতা নেককার হওয়ার ওছিলায় মহান আল্লাহ, হযরত খিযির (আ.) এবং মূসা (আ.) এর মাধ্যমে দু'জন নাবালক এতিমের গুপ্তধন হেফাজতের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তেমনি করে আল্লাহ পীর-বুযুর্গদের ওছিলায় মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

---

৩৩২. আল-কুরআন, ১২:৯৭

৩৩৩. আল-কুরআন, ২:১৫৩।

৩৩৪. আল-কুরআন, ১৮:৮২।

وَ اَمَّا الۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَیۡنِ یَتِیۡمَیۡنِ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ وَكَانَ تَحۡتَهٗ كَنۡزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوۡهُمَا صَالِحًا–

(হে নবী) যেহেতু আপনি ওদের মধ্যে ছিলেন, সেজন্য আল্লাহ তখন ওদের শাস্তি দেন নি।[৩৩৫]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ"–

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যামানায় এমন দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে আসত এবং অপর ভাই রুযী-রোযগার করত না। একদিন এ পেশাদার ভাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে ঐ ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, হতে পারে যে, তোমার সেই ভাইয়ের ওসিলায় তোমাকে রিযিক প্রদান করা হচ্ছে।[৩৩৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ ـ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ ـ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا ". فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ،

৩৩৫. আল-কুরআন, ৮:৩৩।

৩৩৬. শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব অনূদিত, *মেশ্‌কাত শরীফ* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০১০), হাদীস নং- ৪৯৫৫, পৃ. ৭৬৩।

وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ-

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যমানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় এক জুমা'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (বৃষ্টি না হওয়ায়) সম্পদ (পশু সমূহ) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অনাহারে মারা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি দু'হাত তুললেন। তখন আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখিনি। তার পর যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ, দোয়ায় তিনি হাত (দু'খানা) তুলেছিলেন মাত্র, এমন সময় পাহাড়ের মত মেঘের বড় বড় বহু খণ্ড এসে একত্র হয়ে গেল। অত:পর তাঁর মিম্বর হতে নামার সাথে সাথেই দেখলাম, তাঁর (পবিত্র) দাড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। ঐদিন আমাদের এলাকায় বৃষ্টি হল। তারপর ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন, (পরবর্তী জুম'আর দিনে) সেই বেদুঈন অথবা সে ছাড়া অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! (বৃষ্টির কারণে) এখনতো আমাদের বাড়ী ঘর পড়ে যাচ্ছে, সম্পদ জলমগ্ন হচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি তখন দু'হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও আমাদের চারদিকের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, আমাদের উপরে নয়। তিনি মেঘের এবং এক এক দিকের প্রতি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করছিলেন আর তথাকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এতে সমগ্র মদীনাই একটি জলাশয়ের রূপ ধারণ করল এবং কানাত উপত্যকায় পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল। (মদীনায় তখন) কোন এলাকা থেকেই এমন কেউ আসেনি যে, এ মুষলধারায় বর্ষিত বৃষ্টির কথা আলোচনা করেনি।[৩৩৭]

৩৩৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, ২০১৩), হাদীস নং- ৮৮০, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

হযরত আসমা (রা.) এর নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জুব্বা শরীফ ছিল এবং তিনি বলতেন এ জুব্বা শরীফ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর নিকট ছিল। তাঁর ওফাতের পর আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এ জুব্বা শরীফ হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরিধান করতেন। আর এখন আমরা এ কাজ করি যে, মদীনা শরীফে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় তাকে এটা ধুয়ে পান করাই। এতে আরোগ্য হয়ে যায়।[৩৩৮]

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জুব্বা শরীফ আরোগ্যের ওসীলা মনে করে এটা ধুয়ে পান করতেন।

عن النبی صل الله علیه وسلم قال یاتی زمان یغزو فئام من الناس فیقال فیکم من صحب الني

صلی الله علیه وسلم فیقال نعم فیفتح –

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, তারা জেহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসিত হবে– তোমাদের মধ্যে রাসুলে করিম (সা.) এর কোন সাহাবী আছে? উত্তর দেয়া হবে, হ্যাঁ। ঐ সাহাবীর ওসীলায় বিজয় লাভ হবে।[৩৩৯]

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের ওসীলায় জেহাদে বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁদের ওসীলা গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ،   أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . رضی الله عنه . كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا:

قَالَ فَيُسْقَوْنَ–

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। খরাপীড়িতের বছর এলে হযরত উমর (রা.) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর উসিলা ধরে দু'আ করতেন। দু'আচ্ছলে

---

৩৩৮. শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব অনূদিত, *মেশ্‌কাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪০১৪, পৃ. ৬৪২।

৩৩৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১-৬ একত্রে, হাদীস নং- ২৬৮৮, পৃ. ৬৮৮।

বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ওসীলা ধরি তোমার নবীর নামে। অতএব আমাদের বর্ষা দাও। ওসীলা ধরি তোমার নবীর চাচার নাম করে। অতএব তুমি বৃষ্টি বর্ষণ কর। এরপর বৃষ্টি হত।[৩৪০]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ-

হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, (কিয়ামত দিবসে) আমাকে গরীবদের মাঝে তালাশ করো। কেননা, (গরীবদের এমন ফযীলত রয়েছে) যদ্দরুন তোমাদের রিযিক দেওয়া হয়। কিংবা তিনি বলেছেন, গরীবদের বদৌলতেই শত্রুর উপর (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের বিজয় সহজসাধ্য করেছেন।[৩৪১]

"আত্মার সংশোধন ও পরিচর্যা বইতে ড. মুফতী মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী, বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ"উদমাতুল-ক্বারী" এর লেখক আইনী (র.) থেকে নিম্নের হাদিসটি উদ্বৃত করেছেন :

হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.) থেকে বর্ণিত। বনী ইসরাইল সম্প্রদায় যখন দুর্ভিক্ষে পড়ত, তখন আহলে বায়াতের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির প্রার্থনা করত।[৩৪২]

"আত্মার সংশোধন ও পরিচর্যা" বাইতে ড. মুফতি মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী, "সুনানে দারেমী" ও "মুসান্নাফে সাহাবা" গ্রন্থ থেকে নিম্নের হাদিসটি উদ্বৃত করেছেন :

عن ابى الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبرا النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين

৩৪০. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইস্তিফা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২), হাদীস নং- ১০১০।

৩৪১. সুলায়মান ইবনুল আশআছ আসসিজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ (র.) কিতাবুল জিহাদ* (কায়রো, ১৯৯৯), হাদীস নং- ২৫৯৪। আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত্তিরমিযী, *জামে তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০), হাদীস নং- ১৭০২।

৩৪২. ড. মুফতী মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী, *আত্মার সংশোধন ও পরিচর্যা* (ঢাকা: রিয়াদুল জান্নাহ, ২০১৭), পৃ. ৫২৫।

السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشهم فسمي عام الفتق قال الشيخ حسين أسد : رجاله ثقات–

হযরত আবুল-জাওযা আউস ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনা শরীফে কঠিন বৃষ্টির সংকট দেখা দিল। লোকেরা হযরত মা আয়েশা (রা.) এর নিকট অভিযোগ করলে মা-আয়েশা (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা নবী কারীম (সা.) এর রওযার দিকে যাও এবং সেখানে ওপরের দিকে একটি খিড়কি খোল, যাতে আসমান ও কবরের মাঝে কোন ছাদ না থাকে। বর্ণনাকারী বললেন, তারা তাই করলেন। এতে এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হল যে, মদীনা মুনাওয়ার ভূমিতে ঘাস জন্ম নিল, উটগুলো মোটাতাজা হয়ে চর্বিপূর্ণ হয়ে উঠল। এই বছরটিকে ‘আ’মুল ফাতাক’ বলা হয়।[৩৪৩]

هل تنصرون وترزقون الا بضعافائكم –

তোমাদের বিজয় লাভ হতো না এবং জীবিকা অর্জিত হতো না কিন্তু অসহায় ঈমানদারদের বরকতে ও ওসীলায়।[৩৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে তিন সম্প্রদায় শাফায়াত করবে (১) আম্বিয়া কেরাম (২) ওলামায়ে কেরাম ও (৩) শহীদগণ।[৩৪৫]

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম ও শহীদগণ সকল মুসলমানের জন্য মুক্তির ওসীলা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার জনৈক উম্মতের সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের মানুষ থেকে অধিক সংখ্যক লোক বেহেস্তে যাবে (আল্লাহর অনুমতিক্রমে)।[৩৪৬]

---

৩৪৩. প্রাগুক্ত।

৩৪৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১-৬ একত্রে, হাদীস নং-২৬৮৭, পৃ. ৬৮৮।

৩৪৫. শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব অনূদিত, *মেশ্‌কাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫২৪৬, পৃ. ৮২২।

৩৪৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫২৩৮, পৃ. ৮২০০০৭ঈ

عن مسى بن عقبة، قال يتحرى اماكن من الطريق فيصلى فيها ويحدث ان اباه كان

ثصلى فيها وانه راى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى تلك الامكنة–

মূসা ইবন উকবা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা.) কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতা ও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।[৩৪৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হজ্জে যাবার পথে ঐ সকল স্থানে নামাজ পড়তেন, যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জের সময় নামাজ পড়েছিলেন। বুখারী শরীফে এসব স্থানের উল্লেখ রয়েছে।[৩৪৮]

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, যে স্থানে বুজুর্গ ব্যক্তি ইবাদাত করেন ঐ স্থানটি কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) ভক্তি ওসীলা হয়ে যায়।

"আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত" বইতে মুফতী আহম্মদ ইয়ার খান নঈমী, 'মসনবী' শরীফ থেকে উদ্বৃত করেছেন – হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (র.) বলেন, কবরে শায়িত অনেক বান্দা হাজার হাজার জীবিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক উপকার করে থাকেন। তাঁদের কবরের মাটি ও মানুষের উপর ছায়াদাতা। লাখো জীবিত ব্যক্তি এ কবরবাসীদের ছায়ায় রয়েছে।[৩৪৯]

এ কথার দ্বারা বোঝা গেল যে, মাওলানা রুমী (র.) আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাগণকে ওফাতের পর জীবিতদের জন্য ওসীলা মানেন।

---

৩৪৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈর বুখারী (র.) *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১–৬ খণ্ড একত্রে, হাদীস নং- ৪৬১, পৃ. ১৪৭।

৩৪৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৬২, পৃ. ১৪৮।

৩৪৯. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, কাজী মাওলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী অনূদিত, *আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী কুতুবখানা, ২০০৮), পৃ. ২৭-২৮।

“আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত” বইতে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, “ফতোয়া শামী শরীফ” এর ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করছেন – “হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আমি হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মাজার শরীফ হতে বরকত অর্জন করি এবং তাঁর মাজার শরীফে আসি। যখন আমি কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হই তখন আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করি এবং ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মাজার শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি, তখন সহসা প্রয়োজন মিটে যায়।[৩৫০]

মাজহাবের এই মাহান ইমাম অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আযম (র.) এর কবর শরীফকে দোয়ার ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করত: সফর করে ঐখানে আসতেন এবং তাঁর ওসীলা নিয়ে দোয়া করতেন।

> سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَىَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم–
>
> হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি অসুখে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) আমার সেবায় এলেন এবং আমাকে বেহুঁশ পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ওযূ করে আমার দেহে ব্যবহৃত পানি ছিটিয়ে দিলেন। আমি হুঁশ ফিরে পেলাম।[৩৫১]

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওযূর পানির ওসিলায় সাহাবী (রা.) হুঁশ ফিরে পেলেন।

মোটকথা, অসংখ্য আয়াত, হাদিস এবং প্রমাণে এ কথাটি প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা ধরা জায়িয।

---

৩৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

৩৫১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ২০০২), হাদীস নং- ৫৬৫১।

শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ দুয়া, সুপারিশ, মধ্যস্থতা ইত্যাদি।[৩৫২] পারিভাষিক অর্থে শাফাআত হল সুপারিশকারীর ওসিলায় পাপমোচন। কেয়ামতের দিন (আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ওসিলায়) পাপমোচন।[৩৫৩] কোন ব্যক্তি যখন তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেকে দুর্বল মনে করে, তখন নিজের চেষ্টার সাথে সাথে অন্য এমন এক ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করে যার সেরূপ যোগ্যতা রয়েছে। আর এই এমন এক ব্যক্তির শা তা'য়ালা কবুল করে থাকেন।[৩৫৪]

কুরআনের আলোকে শাফাআত

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿۱۰۹﴾

সেদিন কোন ব্যক্তির শাফায়াতই ফলপ্রসু হবে না যতক্ষন না আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে শাফাআতের অনুমতি দেন এবং তার কথায় সন্তুষ্ট হন।[৩৫৫]

وَ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ–

আল্লাহর পূর্বানুমতি ছাড়া সেদিন কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।[৩৫৬]

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ–

তাঁর সদয় অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাধ্য কারো নাই।[৩৫৭]

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿۸۷﴾

সেদিন দয়াময়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই সুপারিশ করতে পারবে না।[৩৫৮]

---

৩৫২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৭), পৃ. ৪৭৬।

৩৫৩. উস্তাদ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ কাজাভী, মোঃ সামিউল হক অনূদিত, *শাফাআত* (ইরান: খেদমতে ইসলামী সংস্থা, ২০০৬), পৃ. ২৮-২৯।

৩৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৫৫. আল-কুরআন, ২০:১০৯।

৩৫৬. আল-কুরআন, ৩৪:২৩।

৩৫৭. আল-কুরআন, ২:২৫৫, ১০ : ৩।

৩৫৮. আল-কুরআন, ১৯:৮৭।

وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى–

আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের জন্যই তারা সুপারিশ করে।[৩৫৯]

عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾

(হে নবী) তোমার প্রতিপালক তোমাকে সর্বোচ্চ সম্মানিত মাকামে মাহমুদে (শাফায়াতকারীর পদে) অধিষ্ঠিত করবেন।[৩৬০]

وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ یَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یَرْضٰی ﴿۲۶﴾

মহাকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে, কিন্তু তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট ও যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দেন।[৩৬১]

হাদীসের আলোকে শাফাআত

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي "–

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কবীরা গুণাহকারীদের জন্য আমার শাফাআত হবে।[৩৬২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ "–

হযরত আবু সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ করবে,

৩৫৯. আল-কুরআন, ২১:২৮

৩৬০. আল-কুরআন, ১৭:৭৯।

৩৬১. আল-কুরআন, ৫৩:২৬।

৩৬২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ* (ঢাকা: তাজ কো. লি., ২০০৮), খণ্ড-৪র্থ, হাদীস নং- ২৩৭৭, পৃ. ৩০।

কেউ একটি গোত্রের জন্য, কেউ একটি ছোট দলের জন্য, কেউ একজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে।[৩৬৩]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا "–

আওফ ইবনে মালিক আল-আশজাই (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং দুটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন, (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে অথবা (২) আমার সুপারিশ করার এখতিয়ার থাকবে। আমি সুপারিশকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেইসবলোকের জন্য যারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করে মুত্যুবরণ করেছে।[৩৬৪]

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ " –

হাসান বসরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, উসমান ইবনে আফফান কিয়ামত দিবসে রবীআ ও মুদার গোত্রের সমসংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে।[৩৬৫]

قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ "–

৩৬৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩২৮, পৃ. ৩২।
৩৬৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৮৩, পৃ. ৩২।
৩৬৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৮১, পৃ. ৩২।

ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার শাফাআতে কিছু লোক দোযখ থেকে বের হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের বেহেশতী হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।[৩৬৬]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কিয়ামতের দিন আপনি কোন কোন লোকদের জন্য শাফাআত করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আহলে কাবায়ের,[৩৬৭] আহলে আযায়েম[৩৬৮] এবং যারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে।[৩৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ "-

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত লাভে কে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিশ দিলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে।[৩৭০]

---

৩৬৬. ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.), *আবু দাউদ শরীফ* (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০০৮), হাদীস নং- ৪৬৬৭, পৃ. ১০০৫।

৩৬৭. আহলে কাবায়ের দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বুঝান হয়েছে যারা গুণাহ কবীরা করেছে।

৩৬৮. আযায়েমের অর্থ গুণাহে সগীরা হোক বা কবীরা। অথবা ঐ সমস্ত কবীরা গুণাহ যা নিজের মধ্যে অধিক পরিমানে বিরাজমান।

৩৬৯. ইমাম আবু হানীফা (র.), মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.), মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৩), হাদীস নং- ২৯, পৃ. ৮১।

৩৭০. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বোখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, ইলম অধ্যায় (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০১৩), খণ্ড ১ম, হাদীস নং- ৯৮, পৃ. ৬৪।

হাশরের ময়দানে শাফাআতকারীদের মাঝে রয়েছে মু'মিনদের সেই সব সন্তানাদি যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ " وَاثْنَيْنِ "-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কোন রমনীর তিনটি সন্তান মারা গেল তা তার জন্য জাহান্নামের আগুণ থেকে পর্দাস্বরূপ হবে। (শুনে) একজন মহিলা বলল, যদি দুটি সন্তান হয়? তিনি বললেন, দুটি হলেও।[৩৭১]

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ "-

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের ঐখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম মীযানের ঐখানেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে খুঁজবে। আমি এই তিনটি জায়গার যেকোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব।[৩৭২]

---

৩৭১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০২, পৃ. ৬৪।

৩৭২. ইমাম হাফিয মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *সহীহ আত-তিরিমযী*, খণ্ড-৪র্থ (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১১), হাদীস নং- ২৪৩৩, পৃ. ৪৭৫।

أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ-

আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আমার প্রভু আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যাদের কোন হিসাবও নেওয়া হবে না এবং শাস্তিও প্রদান করা হবে না। আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার। আর আমার পরোয়ারদিগারের দুই হাতের মুঠির তিনমুঠি পরিমাণ।[৩৭৩]

عن ابي سعيد خودري رضي الله عنه قال .... وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত।------------- যখন তারা (ঈমানদাররা) দেখবে যে, তাদের ভাইদের মধ্যে তারাই শুধু মুক্তি পেয়েছে। তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের ভাইরা কোথায় যারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ত,

৩৭৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৪৩৭, পৃ. ৪৮৩।

রোযা রাখত ও সৎকাজ করত? আল্লাহ বলবেন যাও যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে (দোযখ) থেকে মুক্ত করে আন। আল্লাহ তাদের দেহকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। তাদের কারো দুই পা ও পায়ের নলা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে ডুবে থাকবে। তারা (ঈমানদার) যাদেরকে চিনতে পারবে, তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনা হবে। তারপর ফিরে এলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে, তাদেরকেও বের করে আন। সুতরাং তারা যাদের চিনতে পারবে, তাদেরকে মুক্ত করে আনবে এবং তারপর ফিরে এলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, যাও যাদের অন্তরে একবিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে আন। সুতরাং (এবারও) তারা যাদেরকে চিনবে, তাদেরকে বের করে আনবে। এভাবে নবী, ফেরেশতা এবং ঈমানদাররা সুপারিশ করবেন। তারপর পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন শুধু আমার সুপারিশই অবশিষ্ট আছে। তিনি একমুষ্ঠি ভরে জাহান্নাম হতে একদল লোককে বের করবেন যারা কখনও ভাল কাজ করেনি।[৩৭৪]

نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ: أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ" -

নিমরান ইবন উত্‌বা আল যিমারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন ইয়াতীম ছেলে উম্মে দারদা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, আমি (আমার স্বামী) আবু দারদা (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তরজন লোকের জন্য (আল্লাহ তা'আলার নিকট হাশরে) সুপারিশ করবেন (তার সুপারিশ গৃহীত হবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে)।[৩৭৫]

---

৩৭৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বোখারী (র.), *সহীহ বোখারী শরীফ*, তাওহীদ অধ্যায়, খণ্ড-১০ম (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০১৩), হাদীস নং- ৬৯২৪, পৃ. ৯৮২-৯৮৩।

৩৭৫. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী (রা.), *আবূ দাউদ শরীফ*, জিহাদ অধ্যায়, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬), খণ্ড-৩য়, হাদীস নং- ২৫১৪, পৃ. ৩০৮।

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ–

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, লোকদের বেহেশতে প্রবেশের জন্য আমিই তাদের সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অধিক।[৩৭৬]

ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فاريد ان شاء الله ان اختبى دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة–

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার রয়েছে (যা তাঁদের উম্মতের জন্য কবুল করা হবে)। কিন্তু তাঁরা সে দোয়া দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। আর আমি আশা রাখি যে, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের উদ্দেশ্যেই আমি আমার সে বিশেষ দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখব।[৩৭৭]

عَنْ اناس رضي الله عنه قال سمعت انبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب ادخل اجنة من كان فى قلبه خردلة فيدخلون ثم اقول ادخل الجنة من كان فى قلبه ادنى شئ فقال اناس كانى انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم–

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি বলব, হে রব! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমানও রয়েছে তাকেও জান্নাত দান করুন,

৩৭৬. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রা.), *সহীহ মুসলিম*, খণ্ড-১ম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তা বি), হাদীস নং- ৩৯০, পৃ. ৩৪১।

৩৭৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৯৪, পৃ. ৩৪২; ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বোখারী (র.), *সহীহ বুখারী শরীফ*, তাওহীদ অধ্যায়, খণ্ড-১০ম (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০১৩), হাদীস নং- ৬৯৬১, পৃ. ৯৯৫।

সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এরপর আমি পুনরায় বলব, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকেও জান্নাত দান করুন। আনাস (রা.) বলেন, (এ সময় নবী করীম (সা.) হাত দ্বারা ইশারা করেছিলেন) আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাতের আঙ্গুলসমূহ অবলোকন করছি।[৩৭৮]

আহলে বাইত

"আহলে বাইত" শব্দটি আরবী। 'আহল' অর্থ হল পরিবার বা সদস্য এবং 'বাইত' অর্থ ঘর। সুতরাং আহলে বাইত অর্থ ঘরের সদস্য।[৩৭৯] আহলে বাইত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিবার অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদেরকে বুঝান হয়েছে। শীয়াগণ আহলে বাইত দ্বারা সীমিত অর্থ শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিবারকে বুঝে থাকে।[৩৮০] "আহলে বাইত" শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘরের বাসিন্দা বা পরিবার।[৩৮১] 'আহলে বাইত' অর্থ গৃহটির অধিবাসী বা বিশিষ্ট গৃহের অধিবাসী।

আহলে বাইত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধর। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর আহলে বাইতকে তার উম্মতের মাঝে চিরদিনের জন্য স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে রেখে গেছেন এবং কুরআনের সাথে স্থান দিয়েছেন।

زايد ابن ارقام رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى تارك فيكم الثقلين:

كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي

الحوض فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا-

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– আমি তোমাদের কাছে এমন কিছু বস্তু রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি সেই

---

৩৭৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭০০২, পৃ. ১০০৪।

৩৭৯. *৯০ তালিমে আত্মদর্শন বা সাধনা-সিদ্ধি*, (ঢাকা: জামালচর ছায়েদিয়া পাক দরবার শরীফ, তা বি), পৃ. ৪।

৩৮০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ২০০০), পৃ. ২৭৮।

৩৮১. বজলুর রহমান জুলকার নাইন, *ঈমানের ইশারা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মাহমুদা শিরীন উয়ায়েছী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৫।

সব ধারণ করে রাখ, তবে আমার পরে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি আরেকটি অপেক্ষা মহান – তাহল আল্লাহর কিতাব। আকাশ হতে যমিন পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদৃঢ় রজ্জু; আর আমার পরিবার আমার আহলে বাইত। হাওযে কাওছারে আমার কাছে আগমন করা পর্যন্ত আর বিচ্ছিন্ন হবেনা কখনও। তোমরা লক্ষ্য রাখবে এদুয়ের ব্যাপারে তোমরা আমার পর কিরূপ ব্যবহার করছো।[৩৮২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসটি 'হাদীসে সাকালাইন বা দু'টি মূল্যবান জিনিসের হাদীস নামে প্রসিদ্ধ।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে বাইত

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿﴾

তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এ নিয়ে কেউ তর্ক করতে এলে তাকে বলো, এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের। আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারদিের। আমাদের সত্তাদের ও তোমাদের সত্তাদের। তারপর এসো আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়ুক।[৩৮৩]

উপরোক্ত আয়াতটি আয়াতে মোবাহেলা বলা হয় যা নাজরানের খৃষ্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। মোফাস্‌সেরীন ও মোহাদ্দেসগণ বর্ণনা করেছেন যে, পুত্র দ্বারা হযরত হাসান ও হোসাইন (আ.) আর নারী দ্বারা হযরত ফাতেম (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। সত্তাদের দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আলী (রা.) কে বোঝান হয়েছে।[৩৮৪]

---

৩৮২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ২০০৮), হাদীস নং- ৩৭৪০, পৃ. ৩৭০।

৩৮৩. আল-কুরআন, ৩:৬১।

৩৮৪. মোহাম্মাদ হাদী আমীনী, মোহাম্মাদ জামাল উদ্দিন অনূদিত, *পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত (আ.)*, (ঢাকা: নরুসসাকলায়েন জনকল্যাণ সংস্থা, ১৯৯৯), পৃ. ৪০।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَنْ أَسُبَّهُ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِعَلِيٍّ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِي " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ " ادْعُ لِي عَلِيًّا " . فَأَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : (قلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) الآيَةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي–

সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাছ (রা.) বলেন যে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) সা'দ (রা.) কে আমীর বানিয়ে বললেন, আপনি আলী (রা.) কে কেন মন্দ বলছেন না? সা'দ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, সে কারণেই আমি তাকে মন্দ বলবনা। ----------- একটু পরেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.) কে ডাকতে বললেন। আলী (রা.) আসলেন, তিনি তখন চক্ষুরোগাক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মুসলমানদিগকে খায়বার বিজয়ের সৌভাগ্য দান করলেন। আর যখন এই আয়াত "এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের পুরুষদের ও তোমাদের পুরুষদের। তারপর এসো আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়ুক" (৩ঃ৬১)। অবতীর্ণ হল, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.), ফাতিমা (রা.) এবং হাসান ও হোসাইন (র.) কে ডাকলেন। তাপর বললেন, হে মাবুদ! এরাই আমার পরিবার।[৩৮৫]

৩৮৫. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ২০০৩), হাদীস নং- ৬০০৪, পৃ. ৩৮২।

عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (قلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) الآيَةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ" اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي–

'আমির ইবনে সা'দ তার পিতা সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত, আস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের পুরুষদের ও তোমাদের পুরুষদের। তারপর এসো, আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়ুক" (সূরা আল ইমরান, ৬১)- আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান ও হুসাই (রা.) কে ডাকলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! তারা আমার পরিবার পরিজন।[৩৮৬]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ سَعِيدٍ، - وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا . لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " أَلاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ " . وَفِيهِ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ–

মুহাম্মদ ইবনে বাক্কার ইবনে রাইয়্যান (র.) বর্ণনা করেছেন, যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন, আমরা তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আপনিতো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্য্য লাভ করেছেন। তাঁর পিছনে নামাজ পড়েছেন। এরপর আবু হাইয়্যানের হাদীসের মত হাদীস রেওয়ায়েত

৩৮৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ২০০৮), হাদীস নং- ২৯৩৯, পৃ. ৩২৭।

করেছেন। তবে এই হাদীসে রয়েছে হুযুর পাক রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহ পাকের রশি সদৃশ। যে এর অনুসরণ করবে সে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে, একে ছেড়ে দেবে সে গোমরাহীতে লিপ্ত হবে। এই রেওয়াতে আরও রয়েছে যে, আমরা বললাম, হুজুর পাক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আহলে বাইতের মধ্যে কি তাঁর স্ত্রীগণও শামিল? যায়েদ (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীগণ একটি সময় পুরুষদের সাথে অবস্থান করে। তারপর তাকে স্বামী তালাক দিলে সে তার পিতা এবং জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং আহলে বাই হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মূল বংশ এবং তাঁর স্বগোত্রীয়গণ। যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পর যাকাত গ্রহণ করা (হারাম) নিষিদ্ধ।[৩৮৭]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ، بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ" . فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

৩৮৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.), *মুসলিম শরীফ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০১২, পৃ. ৩৮৬।

وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ " وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي–

যুবাইর ইবনে হরব এবং শুজা ইবনে মুখাল্লাদ (র.) বর্ণনা করেছেন, ইয়াজিদ ইবনে হাইয়্যান (র.) বলেন, আমি হোছায়েন ইবনে ছাবরাহ এবং ওমর ইবনে মুসলিম, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এর নিকট গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বসার পর হোছায়েন বললেন, হে যায়েদ! আপনিতো বহু কল্যাণ দেখেছেন। হুযুরে পাক (সা.) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর হাদীস শুনেছেন। তাঁর পাশে দাড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর ইমামতে নামায পড়েছেন। আপনি যে বহু কল্যাণ লাভ করেছেন হে যায়েদ! আপনি হুযুরে পাক (সা.) হতে যা শুনেছেন তা আমাদের কিছু বলুন। যায়েদ (রা.) বললেন, হে ভাতিজা! আমার তো অনেক বয়স হয়েছে; সুতরাং হুযুরে পাক (সা.) হতে শুনে যা সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম তার অনেক কিছুই ভুলে গেছি; সুতরাং আমি যা বলতে পারি তা গ্রহণ কর আর যা না পারি সে ব্যাপারে কোন অনুযোগ করোনা। তারপর তিনি বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা এবং মদিনার মধ্যস্থলে খুম নাম স্থানে দাড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের পরে ওয়াজ নসীহত করলেন। তারপর বললেন, হে লোকগণ! আমি একজন মানুষ। আল্লাহর তরফ হতে ফিরেশতা আসবে এবং তার ডাকে (অন্যান্য মানুষের ন্যায়) আমিও সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর; সুতরাং তোমরা একে মজবুতভাবে ধরে রাখবে। এছাড়া আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে পাকের প্রতি তিনি আরও আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণামূলক কথা বললেন। তারপর বললেন, আর দ্বিতীয় বস্তু হল আমার আহলে বাইত অর্থাৎ পরিবারবর্গ। আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি – কথাটি তিনবার বললেন।[৩৮৮]

৩৮৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬০০৯, পৃ. ৩৮৫।

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ-

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.), আলী (রা.), ফাতিমা (রা.) ও হাসান-হোসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, যে কেউ তাদের প্রতি শত্রুতা পোষন করে, আমি তাদের শত্রু। পক্ষান্তরে যে তাদের সাথে আপনজনের মত সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করব।[৩৮৯]

وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ. فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا-

হযরত জুমাই ইবনে ওমায়র (রা.) বলেন, একদিন আমি আমার ফুফুর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে কোন মানুষটি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত ফাতিমা (রা.)। এবার জিজ্ঞাসা করা হল, পুরুষের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী।[৩৯০]

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَي بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ» وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ» فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ-

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি আপনার আহলে বাইতের মধ্যে কাকে সর্বাধিক ভালবাসেন? তিনি বললেন, হাসান ও হোসাইনকে এবং তিনি ফাতিমা (রা.) এর উদ্দেশ্যে বলতেন, আমার

---

৩৮৯. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খাতীব তাবরেযী (র.), আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব অনূদিত, *মেশ্‌কাত শরীফ* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০১০), হাদীস নং- ৫৭৬৯, পৃ. ৯২৩।

৩৯০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭৭০, পৃ. ৯২৩।

পুত্রদ্বয়কে ডেকে দাও! তারা আসলে তিনি তাদেরকে শুঁকতেন এবং উভয়কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরতেন।[৩৯১]

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿﴾

হে নবী পরিবার! আল্লাহতো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[৩৯২]

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، رَبِيبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمَّ : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ"-

উমর ইবনে আবূ সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা.) এর ঘরে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন নবী করীম (সা.) ফাতিমা (রা.) এবং হাসান-হুসাইন (রা.) কে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে একটি চাদরে আবৃত করলেন। আলী (রা.) ছিলেন তাদের পিছনে। তাকেও চাদরে আবৃত করে নিলেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। এদের হতে তুমি অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং এদেরকে তুমি পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দাও। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমিও তাঁদের সঙ্গে আছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তোমার স্থানে আছই। তুমিও আমার কাছে উত্তম।[৩৯৩]

---

৩৯১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭৮২, পৃ. ৯২৫। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭২৪, পৃ. ৩৬৩।

৩৯২. আল-কুরআন, ৩৩:৩৩।

৩৯৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭৩৯, পৃ. ৩৬৯।

ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করছেন "তোমরা আল্লাহকে ভালবাস। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আমাকে এজন্য ভালবাস যে, আমি আল্লাহর হাবীব। আর আমার আহলে বাইতকে আমার ভালবাসার কারণে ভালবাস।[৩৯৪]

عن أبى ذر رضي الله عنه أمسك بباب الكعبة الشريف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح، في قوم نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك–

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বাইত হল তোমাদের জন্য নূহ (আ.) এর নৌকার ন্যায়। যে এতে আরোহণ করবে, সে রক্ষা পাবে। আর যে এটা হতে পিছনে পড়ে যাবে সে ধ্বংস হবে।[৩৯৫]

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا]–

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ভোরে হুযুর পাক (সা.) একটা কালো বর্ণের পশমী নকশীদার কম্বল গায়ে দিয়ে বাহির হলেন। এমন সময় হাসান ইবনে আলী ঐ স্থানে আসলেন। তিনি তাকে নিজ কম্বলের

---

৩৯৪. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খাতীব তাবরেযী (র.), *মেশ্‌কাত শরীফ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: তাজ কোম্পানী লি:, ২০০৫), হাদীস নং- ৫৯২২, পৃ. ৪০৩। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), তিরমিযী শরীফ, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭৪১, পৃ. ৩৭০।

৩৯৫. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খাতীব তাবরেযী (র.), *মেশ্‌কাত শরীফ*, ৫ম খণ্ড,প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৯২৩, পৃ. ৪০৩।

মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হোসাইন আসলেন তাকেও হাসানের সাথে ঢুকিয়ে নিলেন। এরপর ফাতেমা আসলে তাকেও এতে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর আলী আসলে তাকেও ঐ কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হুযুরে পাক (সা.) কুরআনে পাকের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "হে আহলে বাইত! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পাপের অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চান (আল-কুরআন-৩৩ : ৩৩)।"[৩৯৬]

عي أنس بن مالك قال لم يكن منهم أحد أشبة برسول الله من الحسين بن علي-

আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে বাইতের মাঝে হুসাইন ইবনে আলী (রা.) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অধিক সদৃশ আর কেউ নাই।[৩৯৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সূফীবাদ ভিত্তিহীন, উদ্ভট, দলীলহীন, বিদ'আত নয়; বরং এর প্রকৃতি, উৎস, কর্মকাণ্ড সব কিছুই কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণপুষ্ট। বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দেওয়ার জন্য এ আলোচনাই যথেষ্ট। মূলত: সূফীবাদ ইসলামের আধ্যাত্মিক ও অভ্যন্তরীণ দর্শন বা তত্ত্ব। সূফী দর্শন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী, এটি কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুধাবনে পরিপূর্ণতা আনয়ন করে।

সূফী সমর্থিত কিছু আচার অনুষ্ঠান (Authorized Sufi Rituals)

ইসলামের মূল আচার-অনুষ্ঠানের বাইরেও নফল কিছু আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সূফীদেরও পালন করতে দেখা যায়। এরকম কিছু আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

---

৩৯৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮৭৬।

৩৯৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭২৮, পৃ. ৩৬৫।

মীলাদ শরীফ

মীলাদ শব্দের অর্থ– জন্ম, জন্মকাল, জন্মদিন। পরিভাষায় মীলাদ বা মীলাদ শরীফ বলতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত, জন্ম কাহিনী ও তদসম্বলিত ঘটনাবলীর আলোচনা করাকে বুঝায়।[৩৯৮] অলীদ, মওলুদ শব্দের অর্থ নবজাতক শিশু। মওলুদুর রেজাল অর্থ মানুষের জন্মকাল ও জন্মদিন ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং মীলাদুন্নবী, মাওলেদুন্নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আলোচনা করা। এই মজলিসটি ঈদে মীলাদুন্নবী নামে খ্যাতি অর্জন করেছে।[৩৯৯]

ঈদ আরবী শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। শাব্দিক দিক দিয়ে ঈদ বলতে বোঝানো হয় আনন্দ বা খুশি। আরবী ভাষায় সেই দিনকে ঈদ বলা হয় যে দিন মানুষ আনন্দ ও খুশী উদযাপন করে বা সেই দিনটি যখন মানুষের জীবনে ফিরে আসে।[৪০০] হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জন্ম এবং জীবন–কর্ম উম্মতের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ কারণে পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই পৃথিবীতে শুভাগমন সম্পর্কিত আলোচনা, তাঁর রিসালাতসহ জীবনের প্রতিটি মুবারক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা, মাহফিল করা শুধু জায়িজই নয় বরং অনেক বড় মাপের উত্তম কাজ। তাই এসব একাকী বর্ণনা করা হোক বা মাহফিলের আয়োজন বারে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন তাকেই মীলাদ শরীফ বলা হয়।

---

৩৯৮. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা* (কুমিল্লাঃ সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ, ২০০৭), পৃ. ৪২।

৩৯৯. মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদী সংকলিত, *কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে মীলাদ ও কিয়াম* (পিরোজপুরঃ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ২০০৬), পৃ. ৭।

৪০০. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাওয়ান নোমানী এবং সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী সংকলিত, *ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল* (ঢাকাঃ বারকাতী পাবলিকেশন্স, ২০১২), পৃ. ৪১।

মীলাদ শরীফের মর্যাদা

মীলাদ শরীফের শরয়ী মর্যাদা হল মুস্তাহাব। মীলাদ উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা অর্থাৎ মাহফিল করা, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম গ্রহণের ফলে আনন্দ প্রকাশ করা, মীলাদের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, গোলাপ জল ছিটানো, শিরনী বিতরণ মোটকথা বৈধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করা সবই মুস্তাহাব। শুধু তাই নয় বরং মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম।[৪০১] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

> لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿﴾
>
> তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও দয়ালু।[৪০২]

আলোচ্য আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে :

> وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿﴾
>
> স্মরণ করো! যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, তিনি বলেন, আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমা দিয়েছি। অতঃপর তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবেন, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। একথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার সাথে অঙ্গীকার করছ এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তাঁরা বললেন, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন,

---

৪০১. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান অনূদিত, *জা'আল হক* (চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী কুতুবখানা, ২০১০), খণ্ড. ২য়, পৃ. ২৫।

৪০২. *আল-কুরআন, ৯ : ১২৮।*

> তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। এরপর যারা এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তারা সত্যধর্মত্যাগী।[৪০৩]

আলোচ্য আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণের তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে :

رَبَّنَا وَ ابۡعَثۡ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ ؕ

اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿﴾

> হে আমার পালনকর্তা! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি, আপনার আয়াত সমূহকে তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪০৪]

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহর নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণের আবেদন করেছিলেন; যা তাঁর পবিত্র বেলাদাত শরীফার প্রতি পরিস্কারভাবে ইঙ্গিত করে।

وَ اِذۡ قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ

وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوۡلٍ یَّاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِی اسۡمُهٗۤ اَحۡمَدُ–

> স্মরণ করো! যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) বলেছিলেন, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রাসূল আগমন করবেন, আমি তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী।[৪০৫]

আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র আগমন বার্তা আগেই বলে গেছেন। পার্থক্য শুধু এটুকু তিনি তাঁর কওমের সমাবেশে বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাশরীফ আনবেন। আর আমরা মীলাদ মাহফিলে বলি তিনি তাশরীফ এনেছেন।

---

৪০৩. *আল-কুরআন, ৩ : ৮১-৮২।*

৪০৪. *আল-কুরআন, ২ : ১২৯।*

৪০৫. *আল-কুরআন, ৬১ : ৬।*

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের পাঠ করে শোনান, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদের কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।[৪০৬]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ–

হে মানব সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্যবাণী নিয়ে আগমন করেছেন একজন রাসূল।[৪০৭]

পবিত্র কুরআনে শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম বিবরণের কথাই উল্লেখ করা হয়নি। বরং হযরত মুসা (আ.), হযরত মারিয়াম (আ.), তার পুত্র হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইয়াহিয়া (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত নূহ (আ.) হযরত সালেহ (আ.), হযরত হুদ (আ.) হযরত শোয়াইব (আ.), হযরত আদম (আ.) প্রমুখ নবীগণের জীবনী ও উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকজনের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত তুলে ধরা হলো। হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً–

নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।[৪০৮]

হযরত ইয়াহিয়া (আ.) এর জন্ম সম্পর্কে বলা আছে :

يٰزَكَرِيَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

---

৪০৬. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪।

৪০৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৭০।

৪০৮. আল-কুরআন, ২ : ৩০।

হে জাকারিয়া! তোমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তার নাম হবে ইয়াহিয়া। এর আগে এই নামে আমি কারো নামকরণ করিনি।[৪০৯]

হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَ اذۡكُرۡ فِی الۡكِتٰبِ اِبۡرٰهِیۡمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیۡقًا نَّبِیًّا ﴿۴۱﴾

(হে নবী!) এই কিতাবে উল্লেখিত নবী ও সত্যনিষ্ঠ ইবরাহীমের কথা ওদেরকে বলুন।[৪১০]

হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَ اذۡكُرۡ فِی الۡكِتٰبِ مُوۡسٰۤی ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخۡلَصًا وَّ كَانَ رَسُوۡلًا نَّبِیًّا ﴿۵۱﴾

(হে নেবী!) এই কিতাবে উল্লেখিত মুসার ঘটনা ওদের কাছে বর্ণনা করুন। মুসা ছিল বিশেষভাবে মনোনীত নবী ও রাসূল।[৪১১]

হযরত ইসমাইল (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَ اذۡكُرۡ فِی الۡكِتٰبِ اِسۡمٰعِیۡلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ وَ كَانَ رَسُوۡلًا نَّبِیًّا ﴿۵۴﴾

(হে নবী!) এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাইলের কথা ওদের বলুন। ইসমাইল ছিল সত্যাশ্রয়ী, প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং রাসূল ও নবী।[৪১২]

এইভাবে কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন নবী রাসূলগণের জন্মসহ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম-পূর্ব হতে বেলাদত (জন্ম), নবুওয়ত এবং নবুওয়ত পরবর্তী সময় সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা বা আলোচনা অনুষ্ঠান করা অবশ্যই উত্তম কাজ।

৪০৯. আল-কুরআন, ১৯ : ৭।

৪১০. আল-কুরআন, ১৯ : ৪১।

৪১১. আল-কুরআন, ১৯ : ৫১।

৪১২. আল-কুরআন, ১৯ : ৫৪।

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো :

وَ مَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿﴾

আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, তবে অনেকেই তা জানে না।[৪১৩]

وَ مَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿﴾

আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।[৪১৪]

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیۡرًا ﴿﴾ لِّتُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ تُعَزِّرُوۡهُ وَ تُوَقِّرُوۡهُ –

আমি রাসূলকে সত্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো, রাসূলকে সহযোগিতা ও সম্মান করো।[৪১৫]

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِکَتَهٗ یُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ ؕ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَیۡهِ وَ سَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا ﴿﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করছেন, অতএব হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরা ও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো।[৪১৬]

قُلۡ بِفَضۡلِ اللّٰهِ وَ بِرَحۡمَتِهٖ فَبِذٰلِکَ فَلۡیَفۡرَحُوۡا ؕ هُوَ خَیۡرٌ مِّمَّا یَجۡمَعُوۡنَ ﴿﴾

হে নবী! বলুন, আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও রহমতের জন্যে তোমরা সবাই আনন্দ প্রকাশ করো। তোমাদের পুঞ্জীভূত ধনসম্পত্তির চেয়ে এ অনেক শ্রেয়।[৪১৭]

৪১৩. আল-কুরআন, ৩৪ : ২৮।
৪১৪. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭।
৪১৫. আল-কুরআন, ৪৮ : ৮-৯।
৪১৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৬।
৪১৭. আল-কুরআন, ১০ : ৫৮।

পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তার নেয়মত ও রহমতের কথা স্মরণ ও আলোচনা করার কথা বলেছেন। সেই সাথে আল্লাহর এ সকল অনুগ্রহের জন্য আনন্দ প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। মানব জাতির জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়মত হলো আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাই নবীজি সম্পর্কে আলোচনা করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা। বস্তুতঃ নিয়ামতের স্মরণ ও তার ব্যাপক আলোচনা করা কুরআনেরই নির্দেশ। অতএব মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা হল পবিত্র কুরআনের এ সব আয়াতের হুকুমকে পালন করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ".

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের যুগসমূহের উত্তম যুগে জন্মগ্রহণ করেছি। অতঃপর যুগের পর যুগ এসেছে, অবশেষে সে যুগে আমার আবির্ভাব ঘটল, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি।[৪১৮]

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا مَثَلَكَ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا "–

আল-আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কুরাইশগণ একসাথে বসে একে অপরে তাদের বংশ মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনা করে এবং মাটিতে আবর্জনার স্তুপেরর উপরের খেজুর গাছের সাথে আপনাকে তুলনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে তাদের

৪১৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), *সহীহ বোখারী শরীফ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩), খণ্ড. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং- ৩৩০৫, পৃ. ১৯৬।

সবচেয়ে ভাল গোত্রে সৃষ্টি করেছেন এবং দুই দলকে তিনি বেছে নেন, তারপর গোত্র ও বংশ গুলোকে তিনি বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভাল বংশে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ঘর সমূহ বাছাই করেছেন এবং আমাকে সেই ঘর গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আমি ব্যক্তি সত্তায় তাদের সবচেয়ে উত্তম বংশ খান্দানেও সবার চেয়ে উত্তম।[৪১৯]

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ " مَنْ أَنَا". قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ. قَالَ" أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا " –

আল মুত্তালিব ইবনু আবু ওয়াদাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এলেন। মনে হয় তিনি কিছু (কুরাইশদের মন্তব্য) শুনে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাড়িয়ে বললেন। আমি কে? সাহাবিগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুতালিব। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি কুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল লোকদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তারপর তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম দলে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদেরকে কিছু গোত্রে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার ভাল গোত্র হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদেরকে কিছু পরিবারে ভাগ করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার সবচাইতে ভাল পরিবারে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি।[৪২০]

---

৪১৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৭), খণ্ড. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং- ৩৬০৭, পৃ. ২৩৮।

৪২০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬০৮, পৃ. ২৩৯।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ "–

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিন লোকদেরকে উঠানো হবে (কবর হতে কিয়ামতের মাঠে) সেদিন আমিই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ তায়ালার আদালতে একত্র হবে, তখন আমি তাদের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশগ্রস্থ হবে তখন আমিই তাদের সুখবর প্রদানকারী হব। সেদিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রতিপালকের নিকট আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সবচাইতে সম্মানিত, এতে গর্বের কিছু নেই।[৪২১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَأُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يقومُ ذلكَ المقامَ غَيْرِي–

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার জন্য জমিন ফাঁকা করা হবে (সবার আগে আমিই কবর হতে উঠবো)। তারপর আমাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে। তারপর আমি আরশের ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমি ছাড়া সৃষ্টিকুলের কেউই সেই জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না।[৪২২]

عَنْ أَبِي هريرة، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ".

৪২১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬১০, পৃ. ২৪০।

৪২২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬১১, পৃ. ২৪০।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের সরদার হব। আমিই সবার আগে কবর থেকে উত্থিত হব। সবার পূর্বে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার সাফায়াত কবুল করা হবে।[৪২৩]

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجنةِ-«

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশি। আর আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজা খুলে দেব।[৪২৪]

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ «

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আপনার জন্য নবুওয়াত কখন থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে সময় হতে, যখন আদম (আ.) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন।[৪২৫]

وَعَن العِرْبَاض بن سارية عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ: خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ»

হযরত ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি তখন খাতামুন নাবীয়্যীনরূপে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন আদম ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদের আরো বলছি যে, আমার নবুয়্যতের

৪২৩. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), *মেশকাত শরীফ* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস ২০১০), খণ্ড. ১–১১ একত্রে, হাদীস নং- ৫৩৭১, পৃ. ৮৪৩।

৪২৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৩৭২, পৃ. ৮৪৩।

৪২৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং- ৩৬০৯, পৃ. ২৩৯।

প্রথম প্রকাশ হল হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আ.) এর ভবিষ্যতবাণী, আর আমার মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেছিলেন যে, তাঁর সামনে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোতে তিনি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান।[৪২৬]

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় বংশ পরিচয়, মর্যাদা গুণাবলী ও পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ সবই মীলাদ শরীফে আলোচিত হয়।

قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل قال وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بنن يعمر ابن ليث أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : رسول الله صلى عليه وسلم أكبر منى وأنا أقدم منه فى الميلاد قال ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا-

কায়স ইবন মাখরামা (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি পিতামহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) উভয়েরই জন্ম হয়েছে আমুল ফীলে (হস্তী বাহিনী কাবা ঘর আক্রমনের সাল)। উসমান ইবন আফফান (রা.) একবার ইয়ামার ইবন লায়ছ গোত্রের কুবাছ ইবন আশরাম (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ (সা.) বড়? তিনি বললেন, বড়তো রাসূলুল্লাহ (সা.), তবে জন্মের তারিখ আমারটা আগে। তিনি আরো বললেন, আমি (আবাবীল) পাখির সবুজ রংয়ের পরিবর্তিত বিষ্ঠা দেখেছি।[৪২৭]

এই হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবিগণ একে অপরের সাথে নবীজির বেলাদত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

---

৪২৬. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), *মেশকাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১–১১ একত্রে, হাদীস নং- ৫৩৮৮, পৃ. ৮৪৬।

৪২৭. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং- ৩৬১৯, পৃ. ২৪৫।

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন সম্প্রদায় যখন কোন মজলিসে বসে কিন্তু সেখানে তারা যদি আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবীর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে তা তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাদের তিনি মাফ করে দিবেন।[৪২৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ ". قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي "–

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন পাঠ কর। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে ভালবাসি।[৪২৯]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ«–

হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সোমবার রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এ এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং (এ দিনই) আমায় নবুয়্যত দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছে।[৪৩০]

---

৪২৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৩৮০, পৃ. ৯৩।

৪২৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), *সহীহ বোখারী শরীফ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০০), খণ্ড. ৮ম, হাদীস নং- ৪৬৮০, পৃ. ৩৭২।

৪৩০. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র.), হাফেয মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮), খণ্ড. ১-৪ একত্রে, হাদীস নং- ১২৫৫, পৃ. ৫৭১।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "–

আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে হাসসান (রা.) এর জন্য মিম্বর স্থাপন করেন। এতে তিনি দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গৌরব গাঁথা পাঠ করতেন (বা আয়শা (রা.) বলেন,) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে (মুশরিকদের) প্রতিবাদ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, রূহুল কুদস (জিবরাইল (আ.)) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হাসসানকে মদদ যোগান, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তরফ থেকে গৌরব প্রকাশ করে বা (মুশরিকদের) প্রতি উত্তর দেয়।[৪৩১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ–

জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত বারের অধিক আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মজলিসে বসেছি। অনেক সময় তাঁর সাহাবিগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহেলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি চুপ করে শুনতেন। কোন কোন সময় তাদের সাথে স্মিথ হাসতেন।[৪৩২]

উপরোক্ত হাদীসের প্রতিটি বিষয় মীলাদ শরীফের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। মীলাদে নবীজির জীবনী আলোচনার সাথে সাথে কুরআন তেলওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ, হামদ-নাতেরও আয়োজন করা হয়। এই দিন মুসলমানরা নফল রোজাও রাখেন। আর এর প্রতিটি বিষয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

৪৩১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৫ম, হাদীস নং- ২৮৪৬, পৃ. ২২২।

৪৩২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৮৫০, পৃ. ২২৪।

কিয়াম

কিয়াম শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, স্থির থাকা, সোজা হওয়া ইত্যাদি।[৪৩৩] পরিভাষায় কিয়াম অর্থ হল, কোন উচ্চ পদস্থ বুযুর্গ, সম্মানিত বা স্নেহভাজন লোক আসলে উপবিষ্ট লোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে কিয়াম বলা হয়।[৪৩৪] পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা ছয় প্রকার কিয়াম সাব্যস্ত হয়েছে।[৪৩৫] যেমন :

১) ফরজ কিয়াম	২) ওয়াজিব কিয়াম	৩) সুন্নত কিয়াম
৪) মুস্তাহাব কিয়াম	৫) মুবাহ কিয়াম	৬) মাকরূহ কিয়াম

মীলাদ শরীফের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাজিম ও সম্মানে কিয়াম করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বেলাদত তথা জন্ম কাহিনী, দুনিয়াতে আগমনের বর্ণনা যখন করা হয় তখনই দাঁড়িয়ে শুভাগমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব।[৪৩৬] নবীজির সম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দলীল সাব্যস্ত রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ–

স্মরণ করো! মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.) বলেছিল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমার পরে ‘আহমদ’ নামে একজন রাসূল আসবেন।[৪৩৭]

---

৪৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

৪৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৪৩৫. মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদী, *কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে মীলাদ ও কিয়াম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৮।

৪৩৬. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৪৩৭. আল-কুরআন, ৬১ : ৬।

প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে "মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা" বইতে মাওলানা মুহাম্মাদ হামিদুর রহমান, "আল বিদায়া ও নেহায়া" গ্রন্থ থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর উক্ত বেলাদত শরীফ ভাষণের পরিবেশ অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে কাসিরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন :

> হযরত ঈসা (আ.) তাঁর উম্মত হাওয়ারিদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শানে বেলাদতের যে, বয়ান দিয়েছিলেন তা ছিল কিয়াম অবস্থায়।[৪৩৮]

> رَبَّنَا وَ ابۡعَثۡ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۱۲۹﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, পবিত্র করবেন। আপনিতো মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[৪৩৯]

প্রিয় নবী (সা.)-এর স্মরণে "মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা" বইতে মাওলানা মুহাম্মাদ হামিদুর রহমান "আল বিদায়া ও নেহায়া" গ্রন্থ থেকে ইবনে কাসিরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে কাসির (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "এই অনুষ্ঠানটি ছিল পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফের উদ্বোধন উপলক্ষে মীলাদ ও কিয়ামের মাধ্যমে। এই মহা অনুষ্ঠানে পিতা পুত্র উভয়ই কিয়ামরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর উদ্বোধনকালে মীলাদের দোয়া করার সময় ইবরাহিম (আ.) কিয়াম অবস্থায় ছিলেন।"[৪৪০]

> وَ اِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِیۡثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیۡتُکُمۡ مِّنۡ کِتٰبٍ وَّ حِکۡمَۃٍ ثُمَّ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنۡصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقۡرَرۡتُمۡ وَ اَخَذۡتُمۡ عَلٰی ذٰلِکُمۡ اِصۡرِیۡ ؕ قَالُوۡۤا اَقۡرَرۡنَا ؕ قَالَ فَاشۡهَدُوۡا وَ اَنَا مَعَکُمۡ مِّنَ الشّٰهِدِیۡنَ ﴿۸۱﴾

---

৪৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৪৩৯. আল-কুরআন, ২ : ১২৯।

৪৪০. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

> স্মরণ করো! যখন আল্লাহ নবীদের (মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীদের কাছ থেকে) অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমা দিয়েছি, এরপর তোমাদের কাছে যে বিধি–বিধান আছে তার সত্যায়নকারী কোন রাসূল এলে অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। একথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার সাথে অঙ্গীকার করছ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম! তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।[৪৪১]

উল্লেখিত আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আম্বিয়ানে কেরামকে নিয়ে রোজে আজলে পবিত্র মিলাদ ও কিয়ামের আয়োজন করেছিলেন। ঐদিন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে একত্রিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দুনিয়াতে আগমনের ঘোষণা দেন। সেই দিনের মীলাদ তথা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত ও আগমন বার্তা এবং তার মর্যাদার আলোচনা বা বর্ণনাকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আম্বিয়ায়ে কেরাম সেই দিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে কিয়ামের মাধ্যমে নবীজির আগমন বার্তা শুনেন এবং তাঁকে সাদরে বরণ করে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।[৪৪২]

ইকতিজাউন নস (নসের চাহিদাকে দলীল হিসাবে পেশ করা) দ্বারা প্রমাণিত হয় ঐ সমাবেশে নবীগণ কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় ছিলেন। কারণ আল্লাহর দরবারে বসার কেন অবকাশ নেই এবং উক্ত পরিবেশটি ছিল আদবের।[৪৪৩]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে মীলাদ শরীফে কিয়াম করা কুরআন সমর্থিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

---

৪৪১. আল- কুরআন, ৩:৮১।

৪৪২. মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, *প্রিয় নবী (সা.) এর স্মরণে মিলাদ শরীফে কিয়ামের বাস্তবতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

৪৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ـ أَوْ ـ خَيْرِكُمْ "–

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে মুয়াজ (রা.) এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বণী কুরায়যা গোত্রের লোকেরা দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাড়িয়ে যাও।[৪৪৪]

বর্ণিত হাদীস দ্বারা সম্মানী ব্যক্তির আগমনে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা বৈধ। এ ধরনের কিয়াম করাকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেছেন।

عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت احدا كان اسبه سمنا وهديا ودلا او قال بالحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمن والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها وقبلها واجلسها فى مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته فى مجلسها–

আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বভাব-প্রকৃতি, গঠন-গাঠন, চাল-চলন এমনকি উঠা-বসায়ও নবী করিম (সা.) এর তনয়া ফাতিমা (রা.) এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আয়শা (রা.) বলেন, ফাতিমা (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসতেন তখন তিনি তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন।

৪৪৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), *সহীহ বোখারী শরীফ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩), খণ্ড. ৭ম, হাদীস নং- ৩৮২১, পৃ. ৬২।

তাকে চুমো খেতেন এবং তাকে স্বীয় স্থানে বসাতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁর কাছে যেতেন, তিনি বসা থেকে উঠে যেতেন। তাকে চুমো খেতেন এবং তাঁকে স্বীয় স্থানে বসাতেন।[৪৪৫] (সংক্ষিপ্ত)

عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ –

আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা অভিযান শেষে মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরেই ছিলেন। যায়েদ এসে ঘরের দরজায় টোকা দিতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার উদ্দেশ্যে উঠে দাড়ালেন। হযরত আয়শা (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এর আগে বা পরে আমি আর কোন দিন তাঁকে এভাবে খালি গায়ে দেখিনি। অতপর তিনি হারেসার সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে চুম্বন দিলেন।[৪৪৬]

عن ابي هريرى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فى المسجد يحدثنا فاذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت ازواجه–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে মসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি যখন উঠে যেতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, যে পর্যন্ত না আমরা দেখতে পেতাম যে, তিনি তার স্ত্রীদের কারও ঘরে প্রবেশ করেছেন।[৪৪৭]

---

৪৪৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং-৩৮৭২, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

৪৪৬. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী (র.), *মেশকাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১–১১ একত্রে, হাদীস নং- ৪৩৫৮, পৃ. ৬৮৭।

৪৪৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৩৮১, পৃ. ৬৮৯।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো শরীয়তের দৃষ্টিতে একে অপরের প্রতি সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো তথা কিয়াম করা জায়েজ। প্রিয় নবী (সা.) এর সম্মান ও আদব প্রদর্শনের জন্য অনেক ওলামায়ে কেরাম মীলাদে কিয়াম করাকে জায়েয, উত্তম বা মুস্তাহাব বলেছেন।

মাজার জিয়ারত

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত দেহের অবস্থান স্থলকে আরবী ভাষায় কবর বলা হয়। আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গগণের কবরকে ফার্সী ভাষায় 'মাজার' বা 'দরগাহ' বলা হয়। আর নবী ও রাসূলগণের কবরকে 'রওযা' বা 'বেহেশতের বাগান' বলা হয়।[৪৪৮] জিয়ারত শব্দের অর্থ সাক্ষাত।[৪৪৯] কবর জিয়ারতের মাধ্যমে জীবিত ব্যক্তিদের মনে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। যার ফলে তারা আত্মশুদ্ধির পথ খুজে পায়। মুসলিম জীবনে করব জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় আমল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহুবার জান্নাতুল বাকীসহ বিভিন্ন কবর জিয়ারত করেছেন এবং উম্মতকে কবর জিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। নিম্নে কবর জিয়ারতের দলিল উপস্থাপন কর হল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً "–

ইবন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইতিপূর্বে আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করবে। কেননা কবর জিয়ারতের ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।[৪৫০]

---

৪৪৮. অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *আহকামুল মাযার* (ঢাকা: সূচনা প্রিন্টিং, ২০০৯), পৃ. ৩৩।

৪৪৯. মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারউল্লাহ, *আল-কোরআন ও হাদীসের আলোকে মিলাদ, কিয়াম ও জিয়ারত* (ঢাকা: আহছানিয়া মিশন, ২০০৬), পৃ. ১২২।

৪৫০. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস সিজিস্তানী (র.), আবূ দাউদ শরীফ (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬), খণ্ড. ৪র্থ, হাদীস নং- ৩২২১, পৃ. ৩১১।

عَن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها ». رواه مسلم . وفي رواية: فَمَنْ أرَادَ أنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ ؛ فإنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ–

বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মদকে তাঁর মাতার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত করতে পার। কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করায়।[৪৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ –

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার অনুমতি চাইলে আমার প্রভু আমাকে অনুমতি দান করেননি। আর তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।[৪৫২]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ«–

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত! তিনি বলেন, তাঁরা যখন কবরস্থানে যেতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিতেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (আবু বকরের বর্ণনানুযায়ী) বলত, হে কবরবাসী ঈমানদার মুসলমানগণ! তোমাদের

---

৪৫১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬), খণ্ড. ৩য়, হাদীস নং- ১০৫৪, পৃ. ৩৪৪।

৪৫২. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০), খণ্ড. ৩য়, হাদীস নং- ২১৩০, পৃ. ৩৩৯।

প্রতি সালাম। খোদা চাহেতো আমরাও তোমাদর সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি।[৪৫৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ تَعْنِي فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ: قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ للاحقون–

আবদুল্লাহ ইবনে কাসির ইবনে মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত! হযরত আয়শা (রা.) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! কবর জিয়ারতকালে আমি কিভাবে দোয়া করব? তিনি বললেন, এরূপ বলবে এই বাসস্থানের অধিবাসী ইমানদার মুসলমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহেতো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।[৪৫৪]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কবর জিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও কবর জিয়ারত করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ . قَالَ فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ –

আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (মক্কার নিকটবর্তী স্থানে) হুবাশীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তাঁকে বহন করে এনে মক্কায় দাফন করা হয়েছে। হযরত আয়শা (রা.) যখন আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরের পাশে আসলেন তখন তিনি বললেন,

৪৫৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১২৯, পৃ. ৩৩৯।

৪৫৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১২৮, পৃ. ৩৩৮।

আমরা দুইজন ছিলাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমনি যেমন জাযীমা সম্রাটের পার্শ্বচর দুই সাথী। যার ফলে লোকজন বলত, তারা কখনও পৃথক হবে না। অতঃপর যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি এবং মালিক দীর্ঘদিন একসাথে থাকা সত্ত্বেও এমন মনে হলো যেন একরাতও আমরা এক সাথে কাটাই নাই। এরপর তিনি বললেন আল্লাহর কসম, আমি যদি হাযির থাকতাম তবে তুমি যেখানে মারা গিয়েছিলে সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম। আর তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাছে আমি উপস্থিত থাকলে এখন আর তোমার যিয়ারত করতে আসতাম না।[৪৫৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ : " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ" –

আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আম্মাজানের কবর জিয়ারত করার জন্য গমন করেন। এ সময় তিনি কাঁদেন এবং তাঁর সাথীরাও কাঁদেন। এরপর তিনি বলেন, আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের জন্য ইস্তগফার করতে চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমি তাঁর কবর জিয়ারত করতে চাইলে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই তোমরা কবর জিয়ারত করবে। কেননা, এ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪৫৬]

“মাজার যিয়ারত পূজা নয় সুন্নত ও কদমবুছির বৈধতা” বইতে মুফতী মাওলানা আল্লাউদ্দিন জেহাদী, “তারিখুল ইসলাম” এর লেখক যাহাবী, “সুবুলুল হুদাওয়ার রাশাদ” এর লেখক ইবনু ছালেহীসহ আরো বেশ কিছু বইয়ের থেকে নিম্নের হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন :

৪৫৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৩য়, হাদীস নং- ১০৫৫, পৃ. ৩৪৫।

৪৫৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস সিজিস্তানী (র.), আবূ দাউদ শরীফ, প্রাগুক্ত, খণ্ড. ৪র্থ, হাদীস নং- ৩২২০, পৃ. ৩১১।

عن أم الدرداء قال، إن بلالا رأؤ النبى صلى الله عليه وسلم فى منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى عنده ويمرغ وجهه عليه–

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, নিশ্চয়ই হযরত বিলাল (রা.) স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখলেন এবং প্রিয় নবীজি (সা.) তাঁকে বললেন, হে বিলাল! এটা কিরূপ নির্দয় আচরণ করছো? এখনও কি তোমার রাসূলের জিয়ারতের সময় হয়নি? অতঃপর তিনি জাগ্রত হয়েই মদিনার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়লেন। তারপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকে আসলেন ও তিনি কাঁদলেন এবং রওজা পাকের সাথে তাঁর চেহারা ঘষালেন।[৪৫৭]

"আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে মিলাদ, কিয়াম ও জিয়ারত" বইতে মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারউল্লাহ "তিবরানীর মোজামে কবীর" গ্রন্থ থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন :

"যে ব্যক্তি কেবল আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওজা মোবারকে আসবে এবং এই আগমনের মধ্যে কেবল আমার জিয়ারতই তাকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাহলে পরকালে তার জন্য শাফায়াতকারী হওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়বে।"[৪৫৮]

উপরে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা এটা বোঝা যায় যে, কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ইসলাম সম্মত। হযরত আয়শা (রা.) তাঁর ভাইয়ের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা সফর করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারতের জন্য 'আবওয়া' নামক স্থানে সফর করেন, যা মদীনা থেকে বহুদূরে অবস্থিত। হযরত বিলাল (রা.) সিরিয়া থেকে মদীনায় সফর করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওজা মুবারক জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে।

৪৫৭. মুফতী মাওলানা আলাউদ্দিন জেহাদী, *মাজার যিয়ারত পূজা নয় সুন্নত ও কদমবুছির বৈধতা* (ঢাকা: ঢাকা প্রিন্টার্স, ২০২২), পৃ. ২২।

৪৫৮. মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারউল্লাহ, *আল-কোরআন ও হাদীসের আলোকে মিলাদ, কিয়াম ও জিয়ারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা অতি উত্তম আমল। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাফায়ত বা সুপারিশ নছিব হবে। তাই কবর জিয়ারত এবং জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়ত সম্মত উত্তম কাজ।

তবে কবর বা মাজারকে ঘিরে সিজদা করা, কবর পূজা, শিরক করা এবং এদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে খুব অল্প সংখ্যক মাজার ছাড়া বাকী সবগুলোতে শিরক ও বিদ'আতী কাজ অহরহ হচ্ছে। সুতরাং মিলাদে, কিয়ামে এবং মাজার জিয়ারতের নামে সকল ধরনের শিরক ও অপসংস্কৃতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

অধ্যায় : পাঁচ

বাংলাদেশে সূফীবাদ

(Sufism In Bangladesh)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সমষ্টিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে এক বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর।"[৪৫৯] হযরত মুহাম্মদ (স.) এর এই নির্দেশ সাহাবায়েকিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তী অনুসারিগণ পালন করার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও আলিমগণের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সূফী ও আলিমগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকে একাকী এ দূরদেশে পাড়ি দিয়েছেন আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিস পত্রের মূল্য কম দেখে বিস্মায়াভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "দেশটি ভিজা ও অন্ধকার এবং খোরাসানবাসীদের মতে ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণ দোযখ।" শুধু আবহাওয়াই প্রতিকুল ছিল তা নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ইসলাম প্রচারকদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম

---

৪৫৯. শায়খ আলী–উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খাতীব আত্ তিরমিযি, *মিশকাত আল-মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম* (দিল্লী: কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৯৫৬), পৃ. ১১৯।

প্রচারকদেরকে সুনজরে দেখতে পারেননি। তারা প্রচারকগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কার্যধারা ব্যাহত করার প্রয়াস পায়। ফলে ইসলাম প্রচারক সূফী ও আলিমদের অনেককে এদেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে কেউ কেউ শহীদও হয়েছেন। কিন্তু তাদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুস্পার্শ্বস্থ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের ধারা ও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।[৪৬০] মি. এলফিন ষ্টোন সাহেবের লেখা থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) এর সমসাময়িককালে আরব ও ভারতবর্ষের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যান্ত নিবিড় ছিল। বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই দু'অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলবর্তী অঞ্চল মালাবার, কালিকট, চেরব, চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানেই আরবদের বাসস্থান পরিলক্ষিত হয়।[৪৬১] এ সম্পর্কে খালিক আহমদ নিযামী লিখেছেন : India's relation with the Arab world go back to hoary past long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between Indian and Arabia and the Arab traders carried India goods to the European markets by way of Egypt and Syria. Elphinstone has rightly observed that from the days of Joseph to the days of Marco Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. Ubulla, for instance, was known as Arz-ul-Hind on account of the large number of Indians who inhibited that region.

---

৪৬০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০২), পৃ. ৭২-৭৩।

৪৬১. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা* (রাজশাহী: অরোরা কম্পিউটার, ২০১২), পৃ. ৬৩।

> When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonics continued to flourish as before. The Indian rajas appointed Muslim judges, known as honourman, to decide their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians, Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia. Philologists have traced three sanskrit words misk (Musk), Zanjbil (ginger) and kafur (Camphor) in the Quran.[৪৬২]

মি. জেমস্ টেলর বলেন :

> হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের অনেক আগে দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের লোকেরা পালতোলা নৌকায় চড়ে উপমহাদেশের পূর্বাঙ্গলে এসেছিলেন। ঢাকার নিকটবর্তী সাভার বন্দরে নিদর্শন রয়েছে। সাভার নামটিও ঐ সাবা কওমের নাম থেকেই হয়েছে। সাবাদের উর নগর সাবাউর। এখন সাবাউরের উচ্চারণ সাভার।[৪৬৩]

কেবল সাভার নয়, বাংলাদেশের অনেক স্থানের নাম আরবদের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে। যেমন আরব বণিকরা নদীপথে যাবার সময় উত্তর বাংলার লালমাটি দেখে চিৎকার করে বলেছিলেন ‘বাররিহিন্দ’। এই বাররি হিন্দ বা বাররিন্দ শব্দ থেকে বরিন্দ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যা বর্তমানে বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। মিনহাজ উদ্দিন মিরাজও তার গ্রন্থে এই অঞ্চলকে বররিন্দ নামে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের একটি নদী বন্দরকে আরবরা বহর-ই-আব নামে উল্লেখ করেছেন যা অধুনা ভৈরব নামে পরিচিত বলে অনেকে মনে করেন।[৪৬৪]

---

৪৬২. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (ঢাকা: সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৩৭।

৪৬৩. James Tailor, Remarks on the sequel to peripulus of the erithrean sea, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol.16.1847.P.76.

৪৬৪. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরবগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিলেন। কারণ ব্যবসা ছিল তাদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। যার কারণে তাদের ছিল শক্তিশালী বাণিজ্যিক বহর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই তাই হিমালায়ন উপমহাদেশের সাথে গড়ে উঠেছিল তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তাদের বাণিজ্য বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্মি ও মালয়েশিয়ার উপকূলে পাড়ি জমাতো এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙ্গর করতো, অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেও ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোতে একমাত্র এই পথেই ইসলামের দাওয়াত শিকড় গেঁড়ে বসে এবং বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঙ্গলের এ পথেই অষ্টম শতকে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো অনুপ্রবেশ করে বলে অনুমান করা হয়।[৪৬৫]

মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমানে কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমল পেরুমল একরাতে লক্ষ্য করেন যে, আকাশের চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। রাজা এই ঘটনা দেখে রাজ জ্যোতিষীকে আহ্বান জানান এবং চন্দ্র বিভক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাজ জ্যোতিষী অনেক চিন্তার পর বলেন আরব দেশে মুহাম্মদ (স.) নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরই হাতের ইশারায় চাঁদ বিভক্ত হয়েছে। জ্যোতিসীর মুখে একথা শুনে রাজা কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গসাথী এবং কিছু উপঢৌকনসহ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমীপে হাজির হন। রাজা স্বদলবলে নবী করিম (স.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে কিছুদিন কাটান। এরপর দেশে ফিরে আসার পথে রাজা চেরুমল পেরুমল

---

৪৬৫. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

ইন্তেকাল করেন। তার সাথীরা চেরর রাজ্যে ফিরে আসেন। তারা দেশে ফিরে ইসলামের বাণী প্রচার করেন।[৪৬৬]

হিন্দুদের বিভিন্ন গ্রন্থ, পুরাণ ও তাদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে জানা যায় যে, আরব বণিকদের দ্বারা ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে পশ্চিম উপকূলবর্তী মালাবার রাজ্যে এক বিপ্লব ঘটে যায়। মালাবারে যেসব আরব মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা 'মোপ্লা' নামে পরিচিত। 'মোপলা' বা 'মোপালা' ইসলামের প্রথম যুগের অনুসারীদেরই উত্তর পুরুষ।[৪৬৭] আজও বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ছেলেদেরকে 'পোলা' বলে সম্বোধন করা হয়। এটি যে 'মোপলা' শব্দেরই অপভ্রংশ, এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। এ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, বৃহত্তর বরিশালসহ সন্নিহিত সমুদ্র উপকূলীয় সমস্ত এলাকায় আদি অধিবাসীদের রক্তধারার সাথে মোপলা আরব রক্তধারার একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।[৪৬৮]

মালাবারে মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এটা প্রমাণিত সত্য। তাহলে দেখা যায়, হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই তথা খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইসলামের সত্যবাণী প্রচারিত হয়। এভাবেই বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে প্রথম যুগেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে ইসলামের সত্যবাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের অভাবে এ যুগকে চিহ্নিত করা যায় না। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবল ভারতের উপকূলে এসে থেমে যায়নি। কারণ, তৎকালে আরবদের ব্যবসা–বাণিজ্য পূর্ব দিকে চীন উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট তাইসুঙ্গ এর নিকট রাসূলুল্লাহ (স.) যে পত্র প্রেরণ করেন, তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রটির কথা N.G. Wells এভাবে উল্লেখ করেছেন, "To the Monarch (Tai-Sung) also came (in A.D. 628)

---

৪৬৬. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৪৬৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৪৬৮. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম*, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯০৪) পৃ. ৯৪।

messeges from Mohammad. They came to canton on a tradingship. They have sailed the whole way from Arabia along the Indian coast. Unlike Heracleus and Kavadh, Tai Sung gave there envoys a courteous hearing. He expressed his interest is their theological ideas and practices and assisted them to build a masque in Canton, a masque survives, it is said, to this day the oldest mosque in the world." [৪৬৯]

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের সাথে ও আরবদের সুপ্রাচীনকালের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দিতেই আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম চট্টগ্রাম ও তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রিচার্ড সাইমণ্ড বলেছেন :

> The culture that developed in Bengal was entirely different from that of Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of Arab voyegers and traders had left a permanent impress upon the area, Islam,, therefore, took root vary early in this respective sail. [৪৭০]

ব্যবসা–বাণিজ্যই এসব বণিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে ইসলামের আদর্শ ও নবীর সুন্নাহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষত জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সুদূর চীন দেশে। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বাংলাদেশের দিকে। তাঁরা মনে করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও আপনা-

---

৪৬৯. S.M. Taifor, *Glimpses of old Dacca* (Dacca: 1965), Introduction.

৪৭০. Richard Saymonds, *The Making of Pakistan* (Dacca: Pakistan Historical Society, 1951), P. 197.

আপনি ছড়িয়ে পড়বে। এরূপ অবস্থায় অষ্টম শতাব্দির গোড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন।[৪৭১]

মুহাদ্দিস ইমাম আবাদন মারওয়াযীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মামা বিশিষ্ট সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা.) নবুওয়াতের পঞ্চম সনে (অর্থাৎ ৬১৫ খ্রি.) হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে (অর্থাৎ ৬১৭ খ্রি.) তিনি কায়েস ইবনু হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইবনু আছাছা (রা.), আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন। তিনি দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন। চেরর রাজা চেরুমল পেরুমল তাঁর কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। চীন যাওয়ার পথে তাঁকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙ্গর করতে হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। চীনের মুসলিমদের বই পুস্তক থেকে জানা যায় যে, আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা.) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে খ্রিষ্টীয় ৬২৬ সনে চীনে পৌছেন। তিনি ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন। মসজিদের নিকটেই রয়েছে তাঁর কবর।[৪৭২]

বাংলাদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটেছে এবং এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী রেখে গেছেন। চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণ অংশগ্রহণ করেছিল বলে অনুমিত হয়। কারণ সুদীর্ঘ সময়ে প্রতিটি বিরতি স্থল থেকেই পরবর্তী মঞ্জিল পর্যন্ত যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদপত্র লোকজন সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল। এ বিবরণ রয়েছে চীন দেশীয় বই পুস্তকে। আরও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, মালাবার হতে রওনা হবার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল।

---

৪৭১. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯), পৃ. ২০–২১।

৪৭২. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।

ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজকদের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আবু ওয়াক্কাস (র.)-এর জামায়াত বাংলার বিভিন্ন বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিল এবং একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত এখানেও অবস্থান করে তাদের কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে গিয়েছিলেন। কামাল আতাতুর্কের দেশে গ্রন্থের লেখক জনাব মোহাম্মদ গোলাম রহমান বলেন, আমরা দেখতে পাই হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা জীবনেই তাঁর মামা হযরত আবি ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (র.) বঙ্গদেশের সামান্দার অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন এবং বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করেন।[৪৭৩]

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয় বলে ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসক হিসাবে ভারতীয়রা সে যুগেও আরবে সমাদৃত ছিল, এটা তারাই প্রমাণ। ইবনে খাল্লিকান বলেন, হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর পুত্র জয়নুল আবেদীন ভারতীয় মায়ের সন্তান ছিলেন।[৪৭৪] এছাড়া এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য লাভ করেছেন এবং ভারতীয় কুঞ্জের রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন।[৪৭৫]

মালাবারের পরে হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) পরবর্তী মঞ্জিল কোথায় ছিল এ সম্পর্কে আরব ভূগোলবিদ ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের বর্ণনায় জানা যায় যে, এটি ছিল বাংলার দক্ষিণ–পূর্ব উপকূলের ‘সমন্দর’ নামক একটি বন্দর। সমন্দর সম্পর্কে তাদের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইবনে খুরদাবা তার ‘আল্ মাসালিক ওয়াল মামালিক’ গ্রন্থে লিখেছেন, “কামরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদী পথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।” আ ইদ্রিসী তার ‘নুযহাতুল মুশতাক’ গ্রন্থে লিখেছেন, সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে

---

৪৭৩. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৪৭৪. Mohammad Nurul Haq, *Arab Relation with Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2005), P. 5.

৪৭৫. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

(ব্যবসায়–বাণিজ্যে) অনেক লাবভান হওয়া যায়।[৪৭৬] ইতিহাসবিদ ড. আব্দুল করিম তার 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৪৭৭]

ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গবেষনা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত' এর সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, "আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপ-মহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উড়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত: দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করত। ফলে, বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হত তেমনি সংবাদাদিরও আদান-প্রদান চলত।"[৪৭৮] বছরে যখন দু'বার বাংলাদেশের উপকূলে আরব বণিকদের জাহাজের বহর নোঙর করত তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ইসলামের আগমণের সাথে সাথেই তা এদেশের জনগণের কাছে পৌছেছিল।

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও এ উপমহাদেশের মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তারা এদেশে আগমন করেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে হিজরী ১৪/৬৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরীর 'ফুতুহুলবুলদান' গ্রন্থের সূত্র ধরে আব্দুল গফুর বলেছেন-"উসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী তাঁর ভ্রাতা মুগিরা সাকাফী, হারেস বিন মুররি আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধুর সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বানা' ও 'আহওয়াজ' নামক স্থানে পৌছেন। মুহাল্লাবের পরে আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদাদী, সিনান ইবনে সালামাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনজির ইবনে জারুদ আবদী কয়েকবার

---

৪৭৬. ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮২), পৃ. ১৫।

৪৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম* : কয়েকটি তথ্য সূত্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল–জুন সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪৫।

৪৭৮. আব্দুল গফুর, 'মহানবীর যুগে উপমহাদেশ', *আগ্রপথিক*, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯–৫৫।

সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।"[৪৭৯] অবশেষে খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরানের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তরুণ ও সুদক্ষ যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে একটি অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সিন্ধু জয় করেন এবং মুলতান ও সিন্ধুকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর অভিযান সমাপ্ত করেন। এ অভিযানে তিনি চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যের সাহায্য পান। তিনি যখন পুরনো ব্রাক্ষ্মণ্যবাদ জয় করেন তখন তাঁর পক্ষে 'সারওয়ান্দর' মুসলিম অধিবাসীগণ যোগ দিয়েছিলেন।[৪৮০] অষ্টম শতক থেকেই স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। অষ্টম শতকের বাংলার বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রি.) সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সমগ্র উত্তর ভারত জয় করার পর তিনি তৎকালীন ভারতের রাজধানী হিসেবে বিবেচিত কান্যকুঞ্জে বিরাট রাজ্যাভিষেখ দরবার করেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিসপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তার এ রাজ্যাভিষেক দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি দেশের রাজা উপস্থিত ছিলেন। এ রাজ্যগুলোর মধ্যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন মুসলমান অধিকৃত রাজ্য বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় অষ্টম শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকে সিন্ধুর মুসলিম রাজ্যের সাথে বঙ্গরাজ তথা বাংলার যোগাযোগ ছিল।[৪৮১]

হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে অনেক সাহাবী ভারত ও বাংলাদেশে এসেছেন বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ রকম একটি প্রচারক দলের নেতৃত্ব দেন হযরত মামুন (রা.) ও হযরত মুহায়মিন (রা.)। তাদের পর সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার ইসলাম প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদ উদ্দিন (রা.), হযরত হুসেন উদ্দিন (রা.), হযরত মুর্তাযা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) ও হযরত আবু তালিব (রা.)। এর রকম পাঁচটি দল পরপর বাংলাদেশে আসেন। তারা প্রথমত এদেশীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ

৪৭৯. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত, ইবনে বতুতার সফর নামার (উর্দু) অনুবাদ *আযায়েবুল আসফার*, (২য় খণ্ড) (দিল্লীঃ ১৯১৩), পৃ. ৫২।

৪৮০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

৪৮১. ড. হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০), পৃ. ২১২।

করতেন এবং এদেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করতেন। তারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও সত্যিকার মুসলিম তৈরী করা তাদের লক্ষ্য ছিল। তারা নিভৃত পল্লীতে বাস করতে বেশী পছন্দ করতেন এবং বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমন করে ইসলাম প্রচার করে দিনাতিপাত করতেন। তারা ধর্ম প্রচার করতে বিভিন্ন অঞ্চলে খানকাহ্ বা দ্বীন প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন।[৪৮২]

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আরব, পারস্য, বুখারা, বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সূফীদর্শন এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম প্রচারকল্পে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সূফীদর্শনের সূচনা হয়। বাংলাদেশে ঠিক কোন সময়ে বিদেশী সূফী দরবেশদের আগমন ঘটে তা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির অভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও এটুকু অনুমান করা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকের দিকেই আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলার মাটিতে ইসলামের বীজ রোপিত হয়। এদেশে বহিরাগত সূফী দরবেশগণই ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আর তাঁদের মাধ্যমেই এদেশে সূফী ভাবধারার আগমন ঘটে এবং কালক্রমে তা এদেশের মানুষের কাছে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত লাভ করে। বাংলাদেশে বিদেশী সূফীদের আগমনকালকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রথম পর্যায় : মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।
২. দ্বিতীয় পর্যায় : মুসলিম বিজয়ের কাল থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের কাল পর্যন্ত : ১২০৪ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. তৃতীয় পর্যায় : ১২৫৮ থেকে পরবর্তীকাল অর্থাৎ ধরে নেয়া যায় অষ্টদশ শতক পর্যন্ত।[৪৮৩]

---

৪৮২. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৪৮৩. ড. আবদুল করিম, *বাংলাদেশের সূফী সম্প্রদায়, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৬১।

সূফী সাধকগণের আগমনের প্রথম পর্যায়
(The First Stage of the Arrival of Sufies)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন :

> وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿﴾
>
> তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা সবাইকে আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।[৪৮৪]

পবিত্র কুরআনের এ বাণী হতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের বাণী প্রচার করা প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়েই সে যুগের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের বাণী উচ্চারণ শুরু হয়।

সূফীগণের মহান আদর্শ ও মানবতাবাদী কার্যাবলী এদেশের মানুষকে আকৃষ্ট করে। ধীরে ধীরে তাঁদের আদর্শ জীবনধারার প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগে। কেউ কেউ ইসলামের সহজ-সরল উন্নত মানবিক মুল্যবোধের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে সূফী দরবেশগণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৪৮৫]

প্রথম যুগে সূফী-দরবেশগণ সমুদ্র পথে আরব বণিকদের সাথে এদেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্রপথ আরবদের কাছে সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাই ছিল এর মূল কারণ। শুধু সমুদ্র পথে নয়, খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে স্থল পথেও বাংলাদেশে ইসলামের সংস্পর্শে আসে। আর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী, দরবেশ, আওলিয়ায়ে কিরামের নাম

---

৪৮৪. আল-কুরআন, ৩:১০৪।

৪৮৫. মনির-উদ-দীন ইউসুফ, *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।[৪৮৬] রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। এ মসজিদের ৬×৬×১ আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রশস্ত ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালিমা তাইয়্যেবাহসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা রয়েছে।[৪৮৭] এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছিল তাই নয়, এই ধর্মের অনুসারীও ছিল। আর সম্ভবত সেটা প্রথমদিকে আগত আরব বণিকগণ বা বাহিরাগত সূফী সাধকের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৪৮৮]

তবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৮৯] আরবজাতি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেন এবং তারা বিদেশ ভ্রমণে ব্যবসায় বাণিজ্যে অভ্যস্ত ও উন্নত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতে থাকেন এবং এইভাবে ভারতের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।[৪৯০]

নওগাঁ জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের (সোমপুর বিহার) ধ্বংসস্তুপে আবিস্কৃত একটি প্রাচীন আরবী মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলীফা

---

৪৮৬. *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা: ২০ এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃ. ৪।

৪৮৭. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫–৬৭।

৪৮৮. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৪৮৯. ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯২), পৃ. ৬১।

৪৯০. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭), পৃ. ৩।

হারুন–অর–রশীদ (৭৮৬–৮০৯ খ্রিঃ রাজত্বকাল) এর শাসনামলে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৭২ হিজরী) আল মুহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[৪৯১]

মুহাম্মদ এনামুল হক তার 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, আমাদের বিশ্বাস কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলীফার এই মুদ্রা আনীত হয়। সম্ভবত তিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল।[৪৯২] কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অনুরূপ খননকার্যকালে বানুল আব্বাস যুগের দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এসব মুদ্রা প্রাপ্তি এই কথাই প্রমাণ করে যে, খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ছিল।[৪৯৩]

খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীর মুসলিম ভৌগোলিক ও ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরবীয় মুসলিমদের যেমন বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তেমনি চট্টগ্রাম বন্দর ও আরব উপনিবেশে পরিণত হয় এবং আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী ভূ–ভাগে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রোসাঙ্গ রাজ সুলতৈংচন্দয় বাঙ্গালা অভিমুখে অভিযান করে সুলতান উপাধিধারী জনৈক মুসলিম আমীরকে পরাজিত করেন। এতে প্রমানিত হয় যে, খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম বহু বিস্তৃতি লাভ করে।[৪৯৪]

কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা আরবীয় মুসলমানরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। তবে ড. আব্দুল করীম এ ধারনা সংশয়মুক্ত নয় বলে তার 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল মান্নান তালিব

---

৪৯১. Dr. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2005), P. 36; K.N. Dikshit, Memories of the Archaelogical survey of India, No. 55 (Delhi : 1938), P. 87.

৪৯২. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, (ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮), পৃ. ১২।

৪৯৩. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪৯৪. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

বলেন, আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীনকাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। এখানকার লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। এখানে অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা যেমন- আল করণ, সুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এসব চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রনই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।[৪৯৫]

আরাকানের ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় যে, রাজা Tsu-la-Taing-Tsan-da-ya ৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। তার রাজত্বকালে একজন থু-রা-তান কে পরাজিত করে তিনি চাটগাঁও নামক স্থানে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন। গবেষকদের মতে 'থু-রা-তান' শব্দটি আরবী শব্দ 'সুলতান'-এর পরিবর্তিত রূপ। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে এবং মুসলমানদের নেতা এতোখানি শক্তিধর হয়ে উঠে যে আরাকান রাজা তার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[৪৯৬]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার রামপাল ও হরিরাম নগর, নেত্রকোনা জেলার মদনপুর, মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর, পাবনা জেলার শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থাগড়, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও দেওঘাট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এসব স্থানে

৪৯৫. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩–৪৪; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৪৯৬. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

সূফীগণের অম্লান স্মৃতি আজও অক্ষয় হয়ে আছে।[৪৯৭] এ কথা সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশাতেই নানাদেশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে মহানবী (সা.)-এর একদল সাহাবী হযরত মামুন (রা.) ও হযরত মুহায়মিন (রা.) এর নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। এরপর ইসলাম প্রচারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রচারকগণের আগমন অব্যাহত থাকে। এদের অধিকাংশই ছিলেন সূফী, দরবেশ ও পীর আওলিয়া। সাহাবী ও সূফীয়া-ই-কিরামের চরিত্র মাধুর্য ও জীবনমূখী শিক্ষা এদেশের মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। তাই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৯৮]

সূফীগণের বাংলাদেশে আগমন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না থাকায় এদেশে সূফীবাদ প্রচারের সূচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরূহ হয়ে পড়েছে। তথাপি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যাদের প্রথম পর্যায়ের সূফী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তারা হলেন :

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম পর্যায়ের সূফীগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি ইরানের বোস্তান নগরে অষ্টম শতাব্দীর শেষ কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম সুলতানুল আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন খলীফায়ে ইলাহী আল্লামা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)।[৪৯৯] তাঁর প্রকৃত নাম তায়ফুর ইবন ঈসা ইবন সুরুশান। তিনি পশ্চিম ভারতের সিন্ধু প্রদেশবাসী সূফী আবু আলী সিন্ধীর নিকটে আত-তওহীদ উল-

---

৪৯৭. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

৪৯৮. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৪৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

হাকাইক এবং ওহ্ দত্-ই-সিরী (গুপ্ত একাত্ববাদ বা বিশ্ব ব্রক্ষ্মবাদ) ও ফানাফিল্লাহ (বৌদ্ধ নির্বাণবাদ) শিক্ষা করেন এবং তিনি সিন্ধীকে হানাফী ফিক্হ শিক্ষা দেন।[৫০০]

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) শুধু চট্টগ্রামেই নয় তিনি মুসলিম জগতের একজন সুপরিচিত দরবেশ। চট্টগ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা ও অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫০১] স্থানীয় জনসাধারণের মতে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) যখন এই অঞ্চলে আগমন করেন তখন পুরো এলাকাটাই দূর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের মতে নবম শতাব্দীতে এই মনীষী চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হন।[৫০২]

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) ধনাঢ্য এক সুলতানের পুত্র ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে তিনি বিদেশ ভ্রমনে বের হন এবং এক সময় উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। এ অঞ্চলে তখন বিখ্যাত দরবেশ আবু আলী কলন্দর (র.) ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। আবু আলী কলন্দর (র.) এর গুনে ও তাঁর সাধন পদ্ধতির অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে বায়েজীদ বোস্তামী (র.) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অত:পর মুর্শিদের নির্দেশে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে পূর্বদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করেন। চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নাসিরাবাদের এক টিলার উপর তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানেই খানকা স্থাপন করেন। তার সাধনা ও মহত্তের কথা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশে জনবসতি গড়ে ওঠে। এই খানকায় তাঁর একটি স্মৃতি মাযার এখনো বিদ্যমান।[৫০৩] এই সমাধি প্রাস্তরের নিকট একটি মসজিদ এখনও অক্ষত রূপে বর্তমান রয়েছে। দেশ বিদেশের বহু পর্যটক ও ভক্ত এই মসজিদে নামাজ পড়ে থাকেন। বলা বাহুল্য হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)-এর মাযারের প্রস্তর ফলকে কোন শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়নি। ধারনা করা হয়

৫০০. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *বাংলাদেশে সূফীপ্রভাব ও ইসলাম প্রচার* (ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০১০), পৃ. ১১।

৫০১. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৫০২. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১০৫।

৫০৩. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত। এ মসজিদের পার্শ্বেই রয়েছে একটি বিরাট পুকুর। এ পুকুরে নানা রকমের মৎস্য (গজারী) এবং কচ্ছপ (মাজারী) আছে। এগুলোকে নিয়ে নানা রকমের অবিশ্বাস্য গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে।[৫০৪] চট্টগ্রামে যে মাজারটি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর বলে কথিত আছে, বস্তুত: এটা একটা ভুল ধারণা। তাঁর মাজার ইরানের অন্তর্গত বুস্তানে অবস্থিত। তিনি সেখানে ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি কাদেরীয়া তরীকার তাইফুরিয়া শাখার প্রবর্তক। তিনি সূফী সম্রাট বলে অভিহিত হন।[৫০৫]

মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার (র.)

শাহ সুলতান মাহমুদ মাহী সাওয়ার (র.) ৪৩৯ হিজরী (১০৪৭ খ্রি.) বগুড়া জেলার মহাস্থানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে তিনি যে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আসেন এবং ইসলাম প্রচার করেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব সুলতান বলখীর মাযারের খাদেমকে একটি সনদ দেন। সেই সনদ পত্রে পীরোত্তর সম্মত্তির স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর নাম লেখা রয়েছে, 'মীর সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ মাহী সাওয়ার (র.)।'[৫০৬]

মধ্য এশিয়ার তাতারিস্তানের বলখ রাজ্য তাসউউনের উজ্জল নক্ষত্রতুল্য। কথিত আছে শাহ আলী আসগর নামক বলখের জনৈক শাসকের সন্তান ছিলেন শাহ সুলতান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটাতে থাকেন। রাজ্যের সুশাসনের দিকে তাঁর আদৌ নজর না থাকায় দেশের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়।[৫০৭] একদিন তাঁর কোন বাদী বা পরিচারিকা তাঁর দুগ্ধফেননিভ নরম বিছানায় ঘুমানোর অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। এতে বাদী সুলতানকে ভোগবিলাসের জন্য নরক যন্ত্রণার ভয় দেখায়। সুলতান তার বিগত জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং নানা দেশ ও জনপদ ঘুরতে ঘুরতে দামেস্কের শায়েখ তাওফীক নামক দরবেশের

৫০৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৫০৫. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা: প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ২০০০), পৃ. ৭৩।

৫০৬. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৫০৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

সাথে দীর্ঘদিন কাটান। এই সাধক তাঁকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা দান করেন।[৫০৮] তাঁর অধীনে শাহ সুলতান প্রায় ছত্রিশ বছর সাধনামগ্ন থাকেন। দরবেশ তাঁর শিষ্যকে বাংলায় এসে অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য নির্দেশ দেন। বঙ্গে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্তলিক গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আরব মুসলিম বণিকদের সাথে মৎস্যাকৃতির এক বাণিজ্য জাহাজে চড়ে তিনি এসেছিলেন এজন্য তাঁকে মীর মাহী সাওয়ার বলে সম্বোধন করা হত।[৫০৯] কথিত আছে যে, শাহ সুলতান নাসিরাবাদ বা বর্তমানের চট্টগ্রামে সমুদ্র পথে পৌছাবার পর সন্দ্বীপে গমন করেন এবং সেখান থেকে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়ে বগুড়া শহরঞ্চলের উপকণ্ঠে মহাস্থানে আস্তানা স্থাপন করেন।[৫১০]

শাহ সুলতান যখন ঢাকার হরিরামপুর নগরে আসেন তখন সেখানে কালী উপাসক রাজা বলরামের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। রাজা পরাজিত ও নিহত হন। কথিত আছে যে, তিনি যেখানে রাজা বলরামের কালী মন্দিরে গিয়ে আযান দিলে মন্দিরে রক্ষিত দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বলরামের মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর সুলতান মহাস্থানে ক্ষত্রিয় রাজা নরসিংহ বা পরশুরামের রাজ্যে উপস্থিত হন। রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নী শীলাদেবীর সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং শীলা দেবী করতোয়া নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। করতোয়ার ‘শীলা দেবীর ঘাট’ হিন্দুগণের পূণ্য তীর্থে পরিণত হয়। মহাস্থান জয়ের পর সুলতান সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা প্রতিষ্ঠা করে প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মৃত্যুর পর তাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।[৫১১]

---

৫০৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৫০৯. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৫১০. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫১১. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.)

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার অন্তর্গত মদনপুর নামক স্থানে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.)-এর মাযার অবস্থিত। ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় লিখিত একটি দলিল থেকে জানা যায় যে, তিনি বলখ্ রাজ্য থেকে ৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলায় আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে একশত বিশ জন সহচর ও শিষ্য আসেন বলে জানা যায়। তাঁর মুর্শিদের নাম ছিল সৈয়দ শাহ সূর্খখুল আনতীয়হ। তিনি ও শাহ সুলতান রুমী (র.)-এর সাথে মদনপুরে আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫১২] মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যে সব সূফী দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন তাদের মধ্যে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.) সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়।[৫১৩]

শাহ সুলতান রুমী (র.) সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যখন মদনপুরে আসেন তখন এ এলাকার শাসক ছিলেন এক কোচ রাজা। রাজার রাজ্যের দুই একজন দরবেশ ও সূফী সাধক ব্যতীত অপর কোন মুসলমানের বসবাসের আদেশ ছিল না। দরবেশ গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করলে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহুলোককে তার প্রতি আকর্ষণ করেন এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কোচ রাজা এতে শঙ্কিত হয়ে সুলতান রুমী (র.) কে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে সাংঘাতিক বিষ পান করতে দিলেন। সুলতান রুমী (র.) 'বিসমিল্লাহ' বলে সে বিষ পান করলেন এবং রাজা ও অন্যান্য লোকজনের বিস্ময় উদ্রেক করে সেই বিষ হজম করে ফেললেন। রাজসভায় যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, তারা দরবেশকে এমন অলৌকিক কার্য সাধন করতে দেখে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫১৪] দরবেশের ঐশী ক্ষমতা দেখে রাজাও খুশী হলেন এবং মদনপুরের সমস্ত গ্রামবাসীকে দরবেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আদেশ দিলেন। মদনপুরে দরগাহ সংলগ্ন অনেকখানি পীরোত্তর সম্পত্তি রয়েছে।

---

৫১২. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

৫১৩. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *বাংলাদেশে সূফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫১৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

কোচ রাজা দরবেশকে এই সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন।[৫১৫] এই মহাতাপস নেত্রকোণার মদনপুর গ্রামেই ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর হুজরাখানাতেই সমাহিত করা হয়। আজও মদনপুরে তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। তাঁর মাজারের পাশে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যের মাজারও আছে। হযরত শাহ সুলতান রুমী ও তার শিষ্যদের মাযারের পাশে একটি পাকা মসজিদ, একটি মুসাফিরখানা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে এখানে বিরাট উরস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বহু দূর-দূরন্ত হতে হাজার হাজার লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে।[৫১৬] **১৬৭১** সালে বাংলার তদানীন্তন সুবাদার শাজাহান পুত্র সুলতান সুজা এক সনদ দিয়েছিলেন এই দরবেশের মাজার সংরক্ষণের জন্য।[৫১৭]

হজরত বাবা আদম শহীদ (র.)

বাবা আদম শহীদ (র.) বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ সূফীগণের অন্যতম। বাবা আদম শহীদ (র.) তুর্কী ছিলেন বলে মনে করা হয়। তুর্কী ভাষায় ‘বাবা’ শব্দটি ফারসী ‘পীর’ বা ‘বুজর্গ’ অর্থে ব্যবহার হয়। এ অর্থেই শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। তিনি ইরানের কোন মুরর্শিদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে বহু বছর সাধনায় সাফল্য অর্জন করেন এবং মুর্শিদের নির্দেশক্রমে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[৫১৮]

হযরত সুলতান ইবরাহীম বলখী মাহীসওয়ার (র.) মহাস্থানগড় বিজয়ের কয়েক যুগ পর বিক্রমপুরে বল্লান সেন নামক এক হিন্দু রাজার আবির্ভাব ঘটে। তিনি বৌদ্ধ এবং মুসলমানদের খুবই ঘৃনা ও অত্যাচার করতেন। বিশেষ করে যে সকল হিন্দু সুলতান ইবরাহীম বলখী (র.)-এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচার অবিচার করতেন। এই বল্লান সেনই হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন। এমনই এক সময়ে হযরত আদম শহীদ (র.) পশ্চিম দেশ হতে কিছু শিষ্যসহ

---

৫১৫. Bengal District Gazetter: *Mymensingh* (1917), P. 152.

৫১৬. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা: মডার্ণ লাইব্রেরী, ১৯৭৪), পৃ. ১২৯–১৩০।

৫১৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৫১৮. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

বগুড়া জেলায় আসেন এবং আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে তিনি একটি দীঘি খনন করেন যা আজও আছে, উক্ত দীঘি তাঁর নামানুসারে 'আদম দীঘি' নামে খ্যাত। হযরত বাবা আদম (র.) কিছুদিন এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাজা বল্লাল সেনের রাজ্যে আসেন। এখানে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন। এ বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একটা কাক এক টুকরা গরুর মাংস কোথাও হতে মুখে করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজবাড়ীর অন্দর মহলে ফেলে গেল। এটা দেখে রাজা বল্লাল সেন মুসলমান ফকিরকেই এ কাজের জন্য দোষী ভেবে তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার জন্য একদল সশস্ত্র লোককে হুকুম দিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল।[৫১৯] এক পক্ষকাল বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলেন না, তখন হতাশ হৃদয়ে তিনি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হলে মুসলমানদের হাতে রাজার পরিজনবর্গ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এই আশঙ্কায়, বল্লালসেন যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে রাজ অন্তঃপুরে চিতা জ্বালিয়ে রেখে নিজ পরিজনবর্গকে আদেশ দিলেন যে, যেন তারা রাজার পরাজয় সংবাদ পেলে জ্বলন্ত আগুনে আত্মবির্জন করে। বল্লাল সেনের পরিজনবর্গ যাতে এই সংবাদ লাভ করতে পারে, সেই জন্য তিনি সঙ্গে করে একজোড়া সংবাদবাহী কবুতর কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিলেন। যুদ্ধে রাজা বল্লালসেনের জয় হয়। একে একে সমস্ত মুসলমান নিহত হয়, কেবল বাবা আদম যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে অন্তিম নামাজ আদায় করতে থাকেন। রাজা বল্লাল সেন তাকেও নিহত করেন। রাজ বাড়িতে ফেরার পথে শরীর হতে কাপড় খুলে নিকটবর্তী কোন পুকুরে গোসল করতে থাকেন। এই সময় কবুতর জোড়া রাজবাড়ীতে রাজার অজ্ঞাতে পালিয়ে যায়। রাজ পরিবারের মহিলারা সকলেই জলন্ত চিতায় আত্মহত্যা করে। রাজা গোসল শেষে যখন জানতে পারলেন যে কুবতর জোড়া পলাতক, তখন তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে ফিরে এলেন। কিন্তু ততক্ষনে সকলেই পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেছে। তখন তিনি ক্ষোভে দুঃখে নিজেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন।[৫২০]

---

৫১৯. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

৫২০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

আব্দুল্লাহপুর গ্রামে বাবা আদম শহীদ (র.)-এর মাজার শরীফ রয়েছে। এরই পাশে আদম শহীদের মসজিদ নামে একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদের অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে রক্ষিত ফলকের আরবি লেখা থেকে বোঝা যায় যে, পরবর্তীকালে পাঠান সম্রাটদের অন্যতম জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের (১৪৮২–১৫৮৭) আমলে জনৈক কাফুর এই সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫২১]

হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.)

হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.) শুধু বঙ্গীয় এলাকায় নয়, তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী মনীষী হিসেবে পরিচিত। তিনি তুর্কিদের বাংলা দখলের পূর্বেই ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে আস্তানা স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়াতে আগমনের পূর্বে তিনি মক্কা, মদিনা ও বাগদাদসহ বহু দেশ পরিভ্রমন করেন। বাগদাদে তিনি শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা লক্ষন সেনের রাজত্বকালে জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.) ১১১৫ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পাণ্ডুয়াতে আগমন করেন।[৫২২] তারই বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রচার তৎপরতার জন্য উত্তর বাংলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠন ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সুসম্পন্ন হয়। ধর্মপ্রাণতা, আদর্শ চরিত্র এবং অক্লান্ত মানব সেবার জন্য হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.) লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মনে চিরস্মরণীয় এবং বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।[৫২৩]

বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং মানব সেবার দ্বারা শয়খ জালালউদ্দীন (র.) বাংলাদেশে আলৌকিক কার্য সাধন করেন। অবহেলিত ও নির্যাতিত হিন্দু বৌদ্ধগণ ত্রাণ লাভের জন্য দলে দলে তাঁর আশ্রয়ে ইসলাম কবুল করে। এভাবে তিনি উত্তর বাংলায় এক শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। তাঁর খানকাহ আধ্যাত্মিক, মানষিক ও মানবিক

---

৫২১. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৫২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫২৩. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৭৭), পৃ. ২১।

অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। তাঁর লংগরখানায় অভুক্ত দরিদ্র জনসেবা ও শান্তি লাভ করে। এভাবে আধ্যাত্মিক ও মানবিক সেবা দ্বারা হিন্দুদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেছিলেন। ফলে কালক্রমে সত্যপীরের ধর্ম ও পূজা হিন্দু সমাজে প্রবর্তিত হয়। এভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ উদার ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে।[৫২৪]

বিশ্ব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তার কামরূপ বা আসাম পরিভ্রমন সম্বন্ধে বলেন, 'আমার সে দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত আওলিয়া হযরত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরেজী (র.) এর সাথে সাক্ষাত করা। এই শায়খ তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ কুতুব ছিলেন। তাঁর কারামত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। তিনি চল্লিশ বছর বয়স থেকে বরাবর সিয়াম পালন করতেন। দশ দিন পর পর তিনি ইফতার করতেন। তাঁর দেহ ছিল রোগা পাতলা। তাঁর হাতে সেই দেশে অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর একজন সঙ্গী আমাকে জানালেন যে, ইন্তেকালের একদিন আগে তিনি সকল সহচর ও বন্ধুকে ডেকে নসীহত করলেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ চাহেনতো আগামীকাল আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। পরদিন জোহরের নামাজের সময় শেষ সিজদায় তাঁর ইন্তেকাল হয়।[৫২৫] তিনি ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পাণ্ডুয়ার দেওতলায় তাঁর কবর রয়েছে।[৫২৬] বাংলার তুর্কী শাসন কর্তা আলাউদ্দীন আলী শাহ (১৩৩৯-১৩৪৫খ্রি.) এই সাধকের আশীর্বাদে (স্বপ্নে আশীর্বাদ করা হয়) বাংলার সিংহাসন লাভ করেছিলেন বলে প্রকাশ এবং তিনি সাধকের কবরের উপর একটি দরগাহ নির্মাণ করে এই মহান সাধকের প্রতি তার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।[৫২৭] এখানে জামে মসজিদ ও দুস্থ দরিদ্রের জন্য মুসাফিরখানা আজো সেই অমর দরবেশের মহিমা ঘোষণা করছে। তাঁর সম্মানার্থে দেওতরার নামকরণ করা হয় তবরেজাবাদ।[৫২৮]

---

৫২৪. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৭৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৫২৫. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

৫২৬. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫২৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৫২৮. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.)

হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.) উত্তর ভারতের পাকপত্তন নামক স্থানে ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাত শিক্ষা করে তাঁর মাতার আদেশে দিল্লীর তৎকালীন পীর হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হন।[৫২৯]

চট্টগ্রাম শহর হতে এক মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়ের পাদদেশে এই সাধকের নাম সংশ্লিষ্ট একটি ঝর্না বর্তমান আছে। কথিত আছে, শেখ ফরীদ (র.) এই স্থানে দীর্ঘ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁরই অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে এই নির্ঝরিনীর উৎপত্তি হয়। বর্তমানে এই ঝর্ণাটি "শেখ ফরীদের চশমা" নামে পরিচিত। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ রোগ মুক্তির জন্য এই ঝর্ণার পানি ব্যবহার করে থাকে। এই ঝর্ণা সংশ্লিষ্ট শেখ ফরীদ (রহ.) যে উত্তর ভারতীয় চিশতী সাধক শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.) তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। কেননা "নুরুন্নেহা ও কবরের কথা" নামক পল্লী গীতকায় দেখতে পাই–

"তারপর মানি আমি ফকীর সেখ ফরিদ।
নেজাম ঔলিয়া মানম তান সাহারিদ॥"

দিল্লীর বিখ্যাত সাধক নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (র.) এর গুরু শেখ ফরীদ (র.) ভারত বিখ্যাত সাধক শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.) ব্যতীত আর অন্য কেউ হতে পারেন না।[৫৩০]

ফরিদপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে যে, শেখ ফরীদ (র.) এর নামানুসারেই ফরিদপুর শহর ও জেলার নামকরণ করা হয়েছে। সম্ভবত শেখ ফরীদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (র.) কোন এক সময়ে এ এলাকায় পরিভ্রমণ করেন এবং ফরিদপুর জেলাসহ

---

৫২৯. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৫৩০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী ও পরিব্রাজক। তিনি চিশতীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠ পীর এবং জগৎ বরেণ্য সূফী সাধক। চট্টগ্রামে অবস্থান করার পর তিনি দিল্লীতে ফিরে যান। তিনি পাঞ্জাবের পাকপত্তনে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং এখানে তাঁর মাজার রয়েছে।[৫৩১]

শাহ মাখদুম রুপোশ (র.)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে উত্তরবঙ্গে যারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাদের মধ্যে হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) এর নাম অগ্রগণ্য। অন্যান্য সূফীদের মতই তিনি জন্মভূমি ছেড়ে বাংলায় আসেন। তিনি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) বংশধর। হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) ইরাকের বাগদাদ নগরে মতান্তরে ইয়মন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৩২]

এই মহান সাধকের নাম শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) অথবা মখদুম আব্দুল কুদ্দুস রুপোশ।[৫৩৩] রুপোশ তাঁর আসল নামের অংশ নয়। এটা তাঁর উপাধি, ফারসী শব্দ রুপোশ অর্থ অবগুণ্ঠিত মুখ। হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) একটি বড় রুমালে নেকাবের মত করে তার মাথা ও মুখ আবৃত করে রাখতেন বলে তাঁকে রুপোশ নামে ডাকা হত।[৫৩৪] Inscriptions of Bengal-গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক প্রত্নতত্ত্ববিদ জনাব শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব বলেন যে, শাহ মাখদুমের নাম হবে ‘সাইয়েদ সনদ শাহ দরবেশ’, কেননা দরগা-সংলগ্ন শিলালিপিতে এই নামটিই আছে।[৫৩৫]

হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) সর্বপ্রথম নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি রেলষ্টেশনের ১০/১২ মাইল দূরে শামপুর মহল্লায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ঐ অঞ্চলে বহু

---

৫৩১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৫৩২. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *বাংলাদেশে সূফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫৩৩. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯২), পৃ. ৩৭।

৫৩৪. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৫৩৫. Shamsuddin Ahmad (Edited by) : *Inscriptions of Bengal*, (Rajshahi : Varendra Research Society, Vol. IV, 1960), P. 264.

বিধর্মীকে দ্বীন ইসলামে দীক্ষা দান করেন। অতঃপর তাঁর অনুচর ও শিষ্যদের উপদেশাদি দিয়ে নানাস্থানে পাঠিয়ে দেন। তিনি মাত্র চারজন সহচরসহ কুমীর আকৃতি জলযানে চড়ে নদীপথে উত্তরবঙ্গে মহাকালগড় থেকে ২৬ মাইল দূরে রাজশাহী সদর মহকুমার অধীন চারঘাটের অন্তর্গত পদ্মানদীর ২ মাইল উত্তরে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। মহাকালগড়ই পরে রামপুর বোয়ালিয়া নামে রুপান্তরিত হয়।[৫৩৬]

ড. এনামুল হক তার "Sufism in Bengal" গ্রন্থে হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.)-এর আগমন সম্পর্কে উদৃত করেছেন :

> মাখদুম সাহেবের নাম হযরত শাহ রুপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল তা আমি জানি না। তার ইন্তেকালের তারিখ ও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছি তাতে আমি উল্লেখ করেছি যে, হযরত রুপোশ ঐ সময়ের ৪৫০ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন।[৫৩৭]

তার সাক্ষ্য মতে, হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সকল ইসলাম প্রচারকগণ বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এদেশে ইসলামের ভীত গড়ে তুলেছিলেন, হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) কে তাঁদের অন্যতম বলা যেতে পারে। সম্ভবত এ জন্যই তাঁকে রাজশাহী অঞ্চলের সূফী ও ইসলাম প্রচারকদের প্রধান বলা হয়।[৫৩৮]

মহাকালগড়ে (রামপুর–বোয়ালিয়া) মহাকাল দেও-এর মন্দির অবস্থিত ছিল। সেখানে নরবলি দেওয়া হত। বর্মভোজ ও বর্মগুপ্তভোজ নামে দু'জন সামান্ত রাজা গড়ের অধিপতি ছিল। এই রাজাদের আমলে তুরকান শাহ নামক এক দরবেশ সঙ্গিদের নিয়ে এই

---

৫৩৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৫৩৭. Dr. Mumammad Enamul Haque, *A Histtory of Sufism in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1975), P. 231.

৫৩৮. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০২), পৃ. ১০০।

মাহাকালগড়ে আসেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু এই দুই রাজার দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তুরকান শাহ ও তাঁর শিষ্যগণ শাহাদাত বরণ করেন। তুরকান শাহের শাহাদাত বরণের পর হযরত শাহ মাখদুম সহচরদের নিয়ে আগমন করেন, এবং মাখদুম নগরে (তাঁর অবস্থান কেন্দ্রকে নিয়ে যে অঞ্চলে) এসেই তিনি একটি কেল্লা তৈরী করেন। দূর্গ থেকে অভিযান পরিচালনা করে মহাকালগড় রাজ্য আক্রমন করে জয় করেন। বহু নর-নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। স্বয়ং দেওরাজও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫৩৯]

হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.) ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সূফী-সাধক। তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রচার কার্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং মুসলিম সমাজ গঠনের প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসাবে খানকাহ স্থাপন করেন। এই মহান সাধক ৭১৩ হিজরীর ২৭শে রজব ইন্তেকাল করেন এবং বর্তমান রাজশাহীর দরগাহ পাড়া নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাঙ্গনে তাঁর মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর ২৭শে রজব তারিখে তাঁর মাজারে বার্ষিক ইছালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।[৫৪০]

শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.)

ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক সূফীগণের মধ্যে হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (র.) একজন। তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন অলী আল্লাহ ছিলেন। তবে তিনি কোথা থেকে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন বিবরণ জানা যায় না। তবে অনুমিত হয় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই তিনি ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তিনি ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে থাকে। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল ছিলেন এমন সময় হিন্দুরা দেবমুর্তি নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষন শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের

---

৫৩৯. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৫৪০. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তাঁর আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়।[৫৪১] মনে হয় এ ঘটনার কারণেই তাঁকে বুতশিকন বা মূর্তি নাশক উপাধি দেয়া হয়। বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে এ দরবেশের মাজার অবস্থিত। মাজারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান।[৫৪২]

হযরত খায়রুল বাশার ওমজ (র.)

দ্বাদশ শতকের শেষ প্রান্তে যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন, তখন আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন হযরত খায়রুল বাশার ওমজ (র.)। তিনি কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদারী গ্রামে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। সে সময় আলমডাঙ্গা ছিল জলাশয় ও জঙ্গলপূর্ণ এলাকা। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার ঘোলদারী ছিল প্রথম ইসলাম প্রচার কেন্দ্র। কথিত আছে, মুসলিম শক্তিতে ভীত হয়ে লক্ষ্মণ সেন একটি সৈন্যদল পাঠান খায়রুল বাশার (র.)-এর আস্তানায়। ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উক্ত সংঘর্ষে তাঁর অনেক মুরীদ ও অনুচর নিহত হন। এহেন পরিস্থিতিতে আরো বড় ধরনের আক্রমণের আশংকায় তিনি সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বিহারের মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নিকট পত্র প্রেরণ করলে বখতিয়ার খিলজী অতর্কিতে নদীয়া আক্রমন করেন। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যায়। এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া জেলার প্রথম মসজিদের পাশেই এই মহান সাধকের মাজার বিদ্যমান।[৫৪৩]

---

৫৪১. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৫৪২. মহিবুর রহমান লিটন, *বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকা: মাসুম বুক ডিপো, ২০০৮), পৃ. ৪৭।

৫৪৩. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

সূফী সাধকগণের আগমনের দ্বিতীয় পর্যায়
(The Second Stage of the Arrival of Sufies)

বাংলাদেশে সূফী দরবেশদের আগমনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ মুসলিম বিজয়ের কাল থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের কাল পর্যন্ত। এ দেশের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতক ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ শতকে ইসলামের প্রচারাভিযান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। এ শতককে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কারণ তখন অগণিত সূফী সাধক, পীর ফকীর, দরবেশ ধর্ম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে নিজ দেশ ত্যাগ করে এদেশে আসতে থাকেন। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পর ইসলাম প্রচারের ধারা আরও বেগবান হয়।

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সূফী ও দরবেশগণকে যেমন বহুতর বাধার মোকাবেলা করতে হয়, অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়নের মুখে পাহাড় প্রমাণ অবিচলনতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, স্থানীয় রাজশক্তির কোপানলে পড়ে কোথাও প্রকাশ্য জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদত বরণ করতে হয়, ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়েও ঠিক তেমনি এ ধারাগুলোর সবই অপরিবর্তিত থাকে। তবে সকল প্রকার বিরোধিতার তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। এর সাথে আর একটি আনুকূল্যও এ প্রচারকগণ লাভ করেন। তা হচ্ছে মুসলিম রাজশক্তির সহায়তা। সর্বক্ষেত্রে এ সহায়তা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য না হলেও একটা অঘোষিত সহায়তা অবশ্যই তাঁরা লাভ করেছেন।[৫৪৪] সূফীগণের আগমনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল সূফী সাধক বাংলাদেশে এসেছেন তাঁদের সবার পরিচয় দেয়া সম্ভব না হলেও মোটামুটিভাবে যাঁদের সম্পর্কে জানা যায়, তাঁদেও সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

হযরত শাহ তুর্কান শহীদ (র.)

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হযরত তুর্কান শহীদ (রহ.) এদেশে আগমন করেন এবং উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচার করেন। বগুড়া জেলার শেরপুরের নিকটবর্তী একটি স্থানে তুর্কান শাহ এর আস্তানা ছিল। এ সিদ্ধ পুরুষ মুষ্টিমেয় অনুচর ও

---

৫৪৪. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

শিষ্য নিয়ে বাংলার তদানীন্তন রাজা বল্লাল সেনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ইসলামের মান-মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিকল্পে তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে আত্মোৎসর্গ করেন। এজন্য তিনি 'শহীদ' নামে অভিহিত হন।[৫৪৫] বিখ্যাত ইংরেজী লেখক W.W. Hunter বলেন :

> "Turkan Shahid was a Gazi Slain in battle by Hindoo king Ballal Sen, One Shrine is called 'Sir-Mokam' where the head fell and the other 'Dhar-Mokam' where his body fell. The Shrines of Darghas of Turkam Shahid are higly revered." ।[৫৪৬]

কথিত আছে, হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় হযরত তুর্কান শহীদ (রহ.) এর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয় তাঁর শির একস্থানে গিয়ে পড়ে এবং দেহ অন্য স্থানে পড়ে। শির যে স্থানে দাফন করা হয় তাকে বলা হয় 'শির মোকাম' এবং দেহ বা ধড় যে স্থানে দাফন করা হয় তাকে 'ধড় মোকাম' বলা হয়। এভাবে নিজের জীবন দান করে তিনি ইসলাম প্রচারের পথ প্রশস্ত করে গেছেন।[৫৪৭]

মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.)

মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রহ.) কোন সময় বাংলাদেশে আসেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে শাহ শো'য়ায়েব লিখিত 'মানাকিবুল আসাফিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ সূফী আলেম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রহ.)-এর কাছে মাহিসুনে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাহিসুন বলতে বর্তমান রাজশাহী জেলার মহিষন্তোষই বোঝায়। আরো জানা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রহ.) বাংলাদেশে আসেন।[৫৪৮] এই হক্কানী আলিম ও

---

৫৪৫. খন্দকার আবদুর রশীদ, *বগুড়ায় ইসলাম* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ৮৩।

৫৪৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, (ঢাকা: ইফাবা,২০১১) সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ৮৮।

৫৪৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৫৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

আধ্যাত্মিক সাধক আরবদেশ থেকে এসেছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে আল-আরাবী যুক্ত করা হয়েছে।[৫৪৯]

হযরত মাওলানা তকীউদ্দীন আল-আরাবী (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি বাংলার প্রথম ইসলামী শিক্ষায়তন যেখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা পড়ার জন্য সমবেত হত। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান উচ্চস্তরের সাধক ও ইসলামী শাস্ত্র বিশারদ। যার ফলে বাংলার বাইরেও তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।[৫৫০] এই মহান সাধকের মাজার মাহিসন্তোষে রয়েছে।[৫৫১]

হযরত মাখদূস শাহ দৌলাহ শহীদ (র.)

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত মাখদূম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.)-এর মাজার রয়েছে। আববের ইয়ামনের বাদশাহ ছিলেন মুয়াজ-ইবনে-জাবাল। তাঁর এক কন্যা এবং দুই পুত্র ছিল। মাখদূম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.) দুই শাহাজাদার অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং রাজকার্যে উদাসীন। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি বার জন দরবেশ এবং অন্যান্য সহচরসহ জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। তাঁর সহচরদের মধ্যে তাঁর এক ভগ্নী এবং তিন ভাগ্নেও ছিলেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিন ভাগ্নেকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদের নিয়ে তিনি বুখারাতে পৌছলে তাঁর সঙ্গে জালালউদ্দীন বুখারীর (র.) সাক্ষাত হয়।[৫৫২] তিনি তাঁকে আশীর্বাদ স্বরূপ একজোড়া কবুতর দান করেন। হযরত মাখদূম শাহ দৌলহ শহীদ (র.) বাংলাদেশে পৌছে পাবনার শাহজাদপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। স্থানীয় হিন্দুরা এই মুসলমানদের আস্তানা ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করলে, হিন্দু ও

---

৫৪৯. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৫৫০. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৫৫১. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৫৫২. On the Antiguity and Traditions of Shahzadpur (Article) : *Asiatic Society of Bengal*, Journal, Part-1, No. 3, 1904, P. 91.

মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে মাখদূম শাহ দৌলহ শহীদ (র.) এবং তাঁর কিছু সহচর প্রাণ হারান।[৫৫৩]

হিন্দু রাজার হাতে অপমানিত হওয়ার আশংকায় শাহ দৌলার ভগ্নি একটি পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্যেৎসর্গ করেন। তখন থেকে সেই পুকুরের নাম হয় 'সতী বিবির ঘাট'। হযরত মাখদূম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.)-এর দেহচ্যুৎ শির বিহারে নীত হয়। হিন্দু রাজা তাঁর শিরে স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শন করে মুসলমানদের ডেকে পাঠান এবং তাদের সাহায্যে এই শির সমাধিস্থ করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছেন। খাজা নূর শাহ নামে তাঁর ভাগ্নে জীবিত ছিলেন। তিনি শাহজাদপুরে তাঁদের নির্মিত মসজিদের সন্নিকটে এই দরবেশের মস্তক বিহীন দেহ সমাহিত করেন। তাঁর সমাধির পার্শ্বে তাঁর ভাগ্নে ও অনুচরদের কবর দেয়া হয়।[৫৫৪] কথিত আছে হযরত মাখদূম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.) ইয়ামনের শাহাজাদা ছিলেন, তাই তাঁর আস্তানার স্থানটির নাম শাহজাদপুর হয়েছে। প্রতি বছর বাংলা চৈত্র মাসে (ইংরেজী এপ্রিল) তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে শাহজাদপুরে একমাস মেলা হয়।[৫৫৫]

হযরত মাখদূম শাহ দৌলাহ শহীদ (র.)-এর জীবনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি মুয়াজ বিন জবালের পুত্র নয় বরং বংশধর ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টীয় তের শতকের প্রথম ভাগে ইয়ামন থেকে বাংলাদেশে আসেন।[৫৫৬]

হযরত চিহিল গাজী (র.)

দিনাজপুর জেলায় চিহিল গাজী দরবেশের মাজার বিদ্যমান। প্রকৃত প্রস্তাবে চিহিল কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। চিহিল ফারসী শব্দ এর অর্থ চল্লিশ। আর গাজী বলতে ধর্ম প্রচারের জন্য জিহাদকারী ব্যক্তিদের বুঝায়। বিদেশ থেকে যে সকল ইসলাম প্রচারক উত্তর

---

৫৫৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

৫৫৪. Bengal District Gazetters : *Pabna*, 1921, PP. 211-126.

৫৫৫. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, (ঢাকাঃ ইফাবা,১৯৮৭), পৃ. ৪১, ৪৩।

৫৫৬. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

বঙ্গে ইসলাম প্রচার করতে আসেন এক সময় তাদের মধ্য থেকে চল্লিশ জন আলেম ও দরবেশ দিনাজপুরের উত্তরাংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করেন। স্থায়ী হিন্দু জমিদারগণ তাঁদের ইসলাম প্রচারকে সুনজরে দেখতে পারেননি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁদেরকে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এ সংঘর্ষে তাঁরা জয়ী হন।[৫৫৭] তাঁদের দলনেতা ছিলেন হযরত শেখ জয়েনউদ্দীন সোহেল বাগদাদী। সৈয়দ মুর্তাজ আলী মনে করেন যে, ইনিই সাধারণ্যে চিহিল গাজী নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) (১১৮৬-১২৩৭ খ্রি) এর শিষ্য। চিহিল গাজী ছিলেন তাঁর মুর্শিদের প্রিয়পাত্র। হযরত বখতিয়ার কাকী (র.)-এর ওফাতের পর হযরত চিহিল গাজী (র.) স্বপ্নে মুর্শিদের আদেশ লাভ করেন যে, উত্তর বঙ্গে গিয়ে তাঁকে ইসলাম প্রচার করতে হবে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মুঙ্গের (বিহার) থেকে উত্তর বাংলার দিনাজপুরে এসে হাজির হন। এখানে আস্তানা তৈরী করে ইসলামের শান্তির ললিত বাণী প্রচার করতে থাকেন।[৫৫৮]

হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে চল্লিশ জন ধর্মপ্রচারক বা গাজী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁদের সকলকে একসঙ্গে সমাহিত করা হয়। খুব সম্ভব তাঁদের সঙ্গে তাঁদের যে সকল শিষ্য ও সহচর মারা যান তাঁদেরকেও ঐ সঙ্গে কবরস্থ করা হয়েছিল। সময়ের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গাজীদের কবরগুলি মাটির সাথে মিশে গেছে। এর ফলে চল্লিশটি কবর ৫৪ ফুট দীর্ঘ। তাকে একটি মাত্র কবর বলে ভ্রম হয়। এ থেকেই স্থানীয় অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, চুয়ান্ন ফুট দীর্ঘ কবরটি চিহিল গাজী নামক কোন এক বিশেষ গাজী সাহেবের হয়ে থাকবে। তের শতকের মাঝামাঝি সময়ে চিহিল গাজী (র.) দিনাজপুরে আসেন এবং তের শতকের শেষে তাঁর ওফাত হয়।[৫৫৯]

---

৫৫৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৫৫৮. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৫৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

হযরত শাহ বন্দেগী গাযী (র.)

হযরত শাহ বন্দেগী গাযী (র.) বাবা আদমের সঙ্গে বগুড়া জেলায় বিশেষত শেরপুর থানায় ইসলাম প্রচার করেন। শেরপুরের টোলার মসজিদটি ৯৬০ হিজরী সনে নির্মিত হয়। এর পাশেই হযরত বন্দেগী শাহ (র.)-এর মাজার অবস্থিত। তাঁর মাজারের কাছেই তাঁর পুত্র ও পৌত্রের মাজার অবস্থিত বলে কথিত। রাজা বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তিনি গাজী উপাধি লাভ করেন এবং বন্দেগী গাযী (র.) নামে জনপ্রিয় হন।[৫৬০]

এদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে কোন কোন সূফী সাধক বিধর্মীদের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেও তাঁরা অনেক সময় বিধর্মী রাজা ও শাসকদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হতেন। ফলে শাসকদের অনাচার ও অত্যাচার প্রতিবিধানের প্রয়োজনে তাঁদেরকে বীর মুজাহিদের ভূমিকাও পালন করতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত বাবা আদম (র.) ও তাঁর সহযোগী হযরত শাহ বন্দেগী গাযী (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁরা ছিলেন মুজাহিদ। তাঁরা ধর্মের জন্য জিহাদ করেছিলেন। ‘প্রেমময় আল্লাহ’ এবং তাঁর অমিয় বাণী সাধারণ্যে প্রচারের জন্য আজীবন কঠোর সাধনা করে গেছেন এই মহান অলি-আল্লাহ। বগুড়ার শেরপুরে তিনি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁর মাজার সমতল ভূমি থেকে প্রায় একগজ উচু এবং ইট দিয়ে বাঁধানো।[৫৬১]

নিমাই পীর বা মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন (র.)

হযরত শাহ নিমাই পীরের মাজার পাঁচ বিবি থানা থেকে চার মাইল সোজা পূর্ব দিকে তুলশী গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে পাথরঘাটায় অবস্থিত। তিনি কোন দেশ থেকে কবে এখানে আগমন করেন তা জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ৪৩৯ হিজরীর শেষ ভাগে সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার নামে যে সাধক পুরুষ মহাস্থানে আগমন করেন, হযরত নিমাই পীর তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি তার গুরু সুলতান বলখী (র.)-এর নির্দেশে পাথরঘাটায় আস্তানা করে ইসলাম প্রচার করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, নিমাই পীর

---

৫৬০. *ইসলামি বিশ্বাকোষ*, পঞ্চদশ খণ্ড (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৪), পৃ. ২৭১।

৫৬১. খন্দকার আবদুর রশীদ, *বগুড়ায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নিমাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের নাম এবং সেই নামেই তিনি অধ্যাবধি পরিচিত। পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে সারা জীবন ইসলাম প্রচারেই উৎসর্গ করেন। আবার কেউ বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন।[৫৬২]

হযরত নিমাই পীর (র.) ইসলাম প্রচার অবস্থায় বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানাতেও আসেন। এই থানার একটি গ্রামে (নিমাইদীঘি) গিয়ে তিনি একটি স্থায়ী আস্তানাও করেন এবং জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি দীঘি খনন করেন যা আজও নিমাইদীঘি নামে পরিচিত।[৫৬৩] তাঁর মাজারে প্রতি বছর ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এটি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজা মহিপালের রাজ্যের অংশ ছিল পাথরঘাটা। সেখানে খনন কার্যের মাধ্যমে অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে।[৫৬৪]

হযরত দেওয়ান শাহাদত হোসেন (র.)

জয়পুরহাট রেল ষ্টেশন থেকে ছ'মাইল পশ্চিমে নেঙ্গাপীর গ্রামে হযরত দেওয়ান শাহাদত হোসেন (র.)-এর মাজার। তাঁর এ অঞ্চলে আগমনের সঠিক সন তারিখ জানা যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে তুর্কী শাসকদের আমলে ইসলাম প্রচারের মানসে সমরখন্দ থেকে এসেছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে তিনি শান্তির ললিত বাণী প্রচার করতেন। তাঁর হাতে বহুলোক ইসলাম কবুল করেছিল।[৫৬৫] তিনি কামেলিয়াত হাসিল করেছিলেন এবং নূর-ই-ইলাহীর আকর্ষণে মত্ত হয়েছিলেন। লোকে তাঁর কাছ এলে মন্ত্রমুগ্ধ হতো। কেননা এই মহান সাধক মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষন করত বলে জানা যায়।[৫৬৬]

---

৫৬২. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-*সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

৫৬৩. খন্দকার আবদুর রশীদ, *বগুড়ায় ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৫৬৪. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৫৬৫. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৫৬৬. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

হযরত দেওয়ার শাহাদত হোসেন (র.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি এ অঞ্চলে আগমন না করলে কবে নাগাদ এখানে ইসলামের আলো এসে পৌছত কেউ তা বলতে পারে না। শোনা যায়, তাঁর বংশে অনেক কামিল পীর জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান কালের কামিল পুরুষ হলেন দেওয়ান সমিরউদ্দীন। তাঁকে লোকে 'পাগলা দেওয়ান' বলতো। হযরত দেওয়ান শাহাদত হোসেন (র.)-এর মাজারের অনতিদূরে প্রবাহিত ছোট যমুনা নদী। এখানে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে।[৫৬৭]

হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.)

হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.) উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম। তাঁর আসল নাম সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান। তবে জনগণের মাঝে তিনি নেকমর্দান নামে পরিচিত। অত্যাধিক সৎ স্বভাব ও চরিত্র মাধুর্য্যের জন্য তিনি এ নামে পরিচিত হয়েছেন। তাঁকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীণ ইসলাম প্রচারক মনে করা হয়। তিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চর্তুদশ শতকের প্রথম ভাবে আগমন করেন।[৫৬৮] তাঁর নাম থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি তুর্কি অঞ্চল থেকে আগমন করেছিলেন।[৫৬৯] হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.) সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, দিনাজপুর জেলার এ অঞ্চলে তৎকালে নাথ-পন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং এখানে নাথ–পন্থীদের গুরু গোরক্ষনাথের একটি মন্দির ছিল। ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নামক দুই জমিদার ভ্রাতা ছিলেন এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.) তাঁর সঙ্গী সহচরদের নিয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলে এ জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে তাঁরা জয়ী হন। ফলে এ এলাকায় ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়। দিনাজপুর জেলার নেকমর্দান গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.)-এর মাজারটি বহুদিন অনাদৃত

৫৬৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৫৬৮. Dr. Mumammad Enamul Haque, *A Histtory of Sufism in Benga*, Ibid, P. 179.

৫৬৯. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

ছিল। পরে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তিন'শ বিঘা পরিমাণ জমি মাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেন।[৫৭০] প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখে এই মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিরাট মেলা বসে।[৫৭১]

হযরত আমীর খান লোহানী (র.)

হযরত আমীর খান লোহানী (র.) মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে রায় বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে আগমন করেন বলে মনে করা হয়। মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরের সন্নিকটে ইন্দাস গ্রামে তাঁর প্রস্তর নির্মিত মাজার আজও বিদ্যমান। মাজারটি একটি ভগ্ন মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। মনে হয়, মন্দিরের প্রস্তর দিয়েই মাজারটি নির্মিত হয়েছে। তাঁর হাতে এতদঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি সম্ভবত আফগানিস্তানের কোন এলাকার অধিবাসী হবেন।[৫৭২]

হযরত আমীল খান লোহানী (র.)ও মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তা হল, গ্রামের লোকদের পালা করে মন্দিরে দেবীর কাছে নরবলি দেওয়া হতো। একদিন এক অসহায় বিধবার পূত্রের করুণ ক্রন্দনে দয়াদ্রচিত্ত পীর সাহেব বিধবার পূত্রের বদলে নিজে মন্দিরে যান এবং দেবী ও দেবীর ভক্তদের পরাস্ত করেন।[৫৭৩]

হযরত শাহ কলন্দর (র.)

হযরত শাহ কলন্দর (র.) দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি পবিত্র ইসলাম প্রচার করে অবশেষে রংপুর জেলার সোনারাই নামক স্থানে এসে আস্তানা করেন এবং এর আশেপাশে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৫৭৪]

---

৫৭০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৭১. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫৭২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

৫৭৩. রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত, *বাংলার ভ্রমন*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: ১৯৪০), পৃ. ১৪৬।

৫৭৪. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

হযরত শাহ কলন্দর (র.) যে সময়ে বাংলাদেশে আসেন, সে সময় আরবদেশের ন্যায় বাংলাদেশে ও দাস প্রথার প্রচলন ছিল। বহু ক্রীতদাস তাদের প্রভুদের অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করত। তিনি বহু ক্রীতদাসকে তাদের মনিবের নিকট থেকে উদ্ধার করে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁর উপদেশ ও কর্মতৎপরতায় বিমুগ্ধ হয়ে বহু পাপী-তাপী মানুষ তাদের কুৎসিত জীবনযাত্রা ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁর আধ্যাত্ম শক্তি, সাধনা ও মধুর চরিত্রগুনে মুগ্ধ হয়ে দেশ–বিদেশের বহুলোক এসে তাঁর শুভেচ্ছা প্রার্থনা করত। এই মহান সাধকের জন্ম-মৃত্যু সাল নিরূপণ দু:সাধ্য, তবে জানা যায় যে, তিনি পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেন। ডোমার রেল ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দূরে সোনারই গ্রামে হযরত শাহ কলন্দর (র.)-এর মাজারের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তাঁর মাজার ইট-সুরকী দিয়ে সাধারণভাবে তৈরী, দর্শনীয় কিছু নেই। মাজার সংলগ্ন জমির পার্শ্ববর্তী স্থানটি বনজঙ্গলে পূর্ণ। প্রতি বছর ২৭শে বৈশাখ তারিখে তাঁর মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়, এতে বহু লোকের সমাগম হয়।[৫৭৫]

হযরত মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.)

হযরত মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.) কোন সময় বাংলাদেশে আসেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে শাহ শো'য়ায়েব লিখিত 'মানাকিবুল আসাফিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ সূফী আলেম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী মওলানা তকীউদ্দীন আরাবীর কাছে মাহিসুনে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাহিসুন বলতে বর্তমানে রাজশাহী জেলার মহিসন্তোষই বোঝায়। আরো জানা যায় যে, শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী (র.) ৬৯০ হিজরী অর্থাৎ ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে হযরত মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.) বাংলাদেশে আসেন। নাম থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি একজন আরবীয়। তিনি সম্ভবত আরব দেশ থেকেই ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ দেশে এসে থাকবেন। তাঁর

---

৫৭৫. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

মাদ্রাসাটিকে বাংলার প্রথম ইসলামী শিক্ষায়তন বলা যায়। তিনি একজন প্রথিতযশা ও উচ্চ স্তরের দ্বীনী আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। ফলে তাঁর সুনাম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা তাঁর শিক্ষায়তনে পড়ার জন্য সমবেত হতে থাকে।[৫৭৬] সম্ভবত হযরত মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (র.) সোহরাওয়ারর্দীয়া সূফী তরীকার অনুসারী ছিলেন এবং এই তরীকার বহু সূফী ও ওলী মাহিসন্তষে সমাহিত আছেন।[৫৭৭]

হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী (র.)

হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী (র.) বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত পীরদরবেশদের অন্যতম। তিনি ইরানের কিরমান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটা বেলায় তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি মুলতানের হযরত শায়খ মাখদুম আরজানী (র.)-এর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুর্শিদের নির্দেশে পশ্চিম বাংলার বীরভূমে আসেন এবং খুস্তিগিরিতে আস্তানা করেন। এখানে তাঁর মাজার রয়েছে।[৫৭৮]

‘তাজকিরা-ই-আওলিয়া-ই-হিন্দ’ গ্রন্থে শাহ আব্দুল্লাহ কিরমানী (র.) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী র্বণনা করা হয়। এ কাহিনী মতে, তিনি জন্মগতভাবে বাঙ্গালী ছিলেন এবং খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতীর শিষ্য ছিলেন।[৫৭৯] তাতে মনে হয় তিনি বাঙ্গালি ছিলেন এবং গৌরবজনক বোধে পৈতৃক ‘কিরমানী’ উপাধি ও ব্যবহার করতেন।[৫৮০] তিনি ভারতের চিশতীয়াহ তরীকার অধীনে একটি নতুন শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কিরমানীয়াহ শাখা নামে পরিচিত। এই শাখাভূক্ত অনেক সূফী ভারতের নানা স্থানে ইসলাম প্রচার

---

৫৭৬. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৫৭৭. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৫৭৮. Dr. Mumammad Enamul Haque, *A Histtory of Sufism in Benga*, Ibid, P. 197.

৫৭৯. মির্জা মোহাম্মদ আখতার দেলহবী, *তাজকিয়া-ই-আওলিয়া-ই-হিন্দ*, প্রথম খণ্ড (দিল্লী), পৃ. ১০৩।

৫৮০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

করেছিলেন।[৫৮১] হযরত শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী (র.) নিজেই কিরমানী সূফী মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৫৮২]

হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.)

হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.) রাঢ় কেন্দ্রে সর্ব প্রচীন মুসলমান সাধক বলে মনে হয়। বর্তমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামক নিষ্ঠাবান ও মুসলমান বিদ্বেসী হিন্দু রাজা যখন রাজত্ব করতেন, তখন তিনি মঙ্গলকোটে প্রবেশ করেছিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী তাঁকে রাজধানীর বাইরে নদীর তটদেশে অবস্থিত আড়াল গ্রামে বাস করার জন্য অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.) যখন আড়াল গ্রামে বাস করতেন, তখন দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে রাজা বিক্রমকেশীর কাছে ফারসী ভাষায় লিখিত এক পত্র আসে। রাজা তার পাঠোদ্ধার করতে ও উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.) ওরফে রাহী পীরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাহী পীর সাহেব পত্রের উত্তরে রাজার অগোচরে তার মুসলিম বিদ্বেষের সমস্ত কথা দিল্লীর বাদশাহের নিকট লেখেন, বাদশাহকে বিক্রমকেশীর রাজ্য আক্রমন করতে অনুরোধ করেন। বাদশাহ দরবেশের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে হযরত রাহী পীর (র.) যোগদান করেন। এই যুদ্ধে হিন্দুগণ পরাজিত হয়। রাজা বিক্রমকেশরী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে পালিয়ে যায়, এবং সেখানে অনেকদিন রাজত্ব করেন। মঙ্গলকোট মুসলমানদের অধিকারে আসে, এ সময় হযরত রাহী পীর (র.) সেইস্থানে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।[৫৮৩] স্থানীয় জনসাধারণ এখনও মঙ্গলকোটে ১৮ জন সিদ্ধ পুরুষের সমাধি দেখিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বেই মঙ্গলকোটে হযরত শাহ গজনবী (র.) এর আগমন ঘটেছিল বলে অনেকে বুঝাতে চাইলেও তাঁর আগমন ও কার্যাবলী বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে স্থাপন করা উচিত। ড. এনামুল হক তাই বলেছেন :

৫৮১. মির্জা মোহাম্মদ আখতার দেলহবী, *তাজকিয়া-ই-আওলিয়া-ই-হিন্দ*, প্রথম খণ্ড (দিল্লী), পৃ. ১০৩।

৫৮২. Bengal District Gazetters, *Birbhum*, 1910, P. 120.

৫৮৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

> Considering all aspects of the tradition of mangalkot, we are inclined to hold the vew that its conquest by Rahi Pir (Makhdum Shah Mahmud Gaznavi) and his companions was an historical episode that might have taken place during the early years of the Turki conquest.[৫৮৪]

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা মঙ্গলকোট বিজয় করেন। আজও পর্যন্ত মুসলমানরা মঙ্গলকোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ জন্য মনে হয় এই এলাকায় সূফী মনীষীদের আগমন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (র.) রাহী পীর অন্যতম ছিলেন।[৫৮৫]

সূফীসাধকগণের আগমনের তৃতীয় পর্যায়
(The Third Stage of the Arrival of Sufies)

বাংলায় ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই সূফী ও উলামা-ই-কিরামগণ দূর দূরান্ত থেকে আগমন করেছেন এদেশের মাটিতে। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেন তা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষ করে নানা বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে প্রয়োজনে প্রাণদান করে হলেও তাঁরা যেভাবে তাদের মহান উদ্দেশ্য সাধন করেছেন তা প্রসংশারও দাবীদার। আর এ কঠিন ও জটিল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাঁরা বলিয়ান ছিলেন বলে তাঁরা পূতপবিত্র চরিত্র, মহান আদর্শ, উদারতা, অসীম সাহস প্রভৃতির দ্বারাই পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হন। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে অগণিত সূফী সাধক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এদেশে এসেছেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সূফী সাধকদের আগমনের পথ আরও সুপ্রসস্থ হয়। কেননা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা তাঁদের কাজে রাজশক্তির সহায়তা পেতে থাকেন। বিশেষত:

৫৮৪. Dr. Mumammad Enamul Haque, *A Histtory of Sufism in Benga*, Ibid, P. 190.

৫৮৫. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হলাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পর অর্থাৎ তের শতকের শেষপদ থেকে পাক ভারত ও বাংলাদেশে সূফী প্রভাবের স্রোত অবাধ গতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়েই আরব, পারস্য, ইরান, ইরাক, ইয়মন ও মধ্য এশিয়ার সূফী দরবেশগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশেও এইসব ধারাই সম্প্রসারিত হয়। কাজেই তৃতীয় পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল তুলনামূলকভাবে সুগম। কিন্তু তবুও তাঁদেরকে বহুস্থানে অমুসলিম শক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যাহোক, এ সময়ে যে সকল সূফী সাধক এদেশে আগমন করেন ও যে সমস্ত এলাকায় তাঁদের খানকা প্রতিষ্ঠা করেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ (র.)

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ (র.) বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। শীঘ্রই তাঁর জ্ঞানও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হাদিস, ফিকহ, রসায়নশাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। তিনি ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে আগমন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সাধনা, পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতান বলবন তাঁকে সোনারগাঁও যেতে কৌশলে বাধ্য করেন।[৫৮৬]

বাংলাদেশে আগমনের পথে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র.) বিহারের ‘মানের’ নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি ইয়াহইয়া মানেরীর আতিথ্যগ্রহণ করেন।[৫৮৭] তিনি ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও এসে ইল্‌মে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটান। তিনি ইসলামের বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে দেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। শুধু বাংলায় নয় বাংলার বাইরেও তাঁর প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সোনারগাঁও আগমন করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও সাধারণভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের জন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে

---

৫৮৬. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

৫৮৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৫৮৮] ইতোপূর্বে এতবড় মাদ্রাসা বাংলার কোথাও স্থাপিত হয়নি। বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁওয়ে আসতে থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এ হিসেবে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ (র.) কে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। এভাবে এদেশে ইসলামী শিক্ষা সাধনা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরী করে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ (র.) ১৩০০ খৃষ্টাব্দে (৭০০ হিজরী) ইন্তেকাল করেন। সোনারগাঁওয়ে তাঁর মাজার রয়েছে।[৫৮৯]

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.)

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.) ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের মানের শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৯০] বাল্যকালেই তিনি উচ্চ ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শীতা লাভ করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। জ্ঞান লাভের আগ্রহ ও আকাংখা তাঁর এতো তীব্র ছিল যে পনের বছর বয়সেই তিনি স্বনামধন্য সূফী ও মনীষী সাধক শয়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র.) এর ছাত্ররূপ তার সঙ্গে সোনারগাঁও আসেন। এখানে তিনি ধ্যান, চিন্তা ও অধ্যায়নে এতো তন্ময় হয়ে থাকতেন যে বাড়ীর চিঠিপত্র পড়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। শিক্ষা সমাপনের পর যখন চিঠিগুলো খোলেন, তখন একটির মধ্যে তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত তিনি ওস্তাদ শয়খ আবূ তাওয়াহর নিকট থেকে ইসলামী বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের দ্বারা কামালিয়াত হাসিল করেন। ছাত্রের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে ওস্তাদ আপন কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন।[৫৯১]

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.) ছিলেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের উজ্জলতম রত্ন। ওস্তাদ ও ছাত্র উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাধনায় সোনারগাঁওয়ের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রটি বাংলার মুসলমানদের ইসলামী জীবন ধারায়

---

৫৮৮. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৯৫

৫৮৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৫৯০. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৫৯১. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

শ্রেষ্ঠতম অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু জন্মভূমির আহ্বানে ১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে সোনারগাঁও ত্যাগ করতে হয় এবং ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে তিনি মানেরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহারে ফিরে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষাদানে ব্রতী হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ইসলামী চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।[৫৯২]

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (র.)-এর রচিত বহু মুল্যমান গ্রন্থ তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি এই উপমহাদেশের স্বনামধন্য সিদ্ধ সাধকের অন্যতম ছিলেন। সূফী বিশ্বাস এবং সত্যের গুঢ় তত্ত্ব স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে তিনি তাঁর অনুভূতির স্বচ্ছতা, মনীষার দীপ্তি ও হৃদয়ের রস-গভীরতার পরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন।[৫৯৩]

হযরত শাহদৌলাহ (র.)

রাজশাহী জেলার বাঘা গ্রামে হযরত শাহদৌলাহ (র.)-এর মাজার রয়েছে। তিনি ৯২৫ হিজরী অর্থাৎ ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে আগমন করেন।[৫৯৪] শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ 'শাহদৌলাহ' নামেই বেশী পরিচিত। প্রচলিত কাহিনী মতে, তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা হারুনর রশীদের বংশধর। বাগদাদ থেকে এসে তিনি রাজশাহী জেলার বাঘায় আস্তানা স্থাপন করেন।[৫৯৫] তিনি ইসলামী বিধি-বিধান ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান গরিমা ও চরিত্র মাধূর্যে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় মখদুমপুরের প্রভাবশালী জমিদার আল্লাহ বখ্শ বরখুরদার লশকরী নিজ কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন।[৫৯৬] তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাঘাতে একটি মনোরম মসজিদ,

---

৫৯২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫৯৩. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫৯৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৫৯৫. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৫৯৬. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

একটি মাদরাসা ও একটি খানকা স্থাপন করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের ইবাদত বন্দেগী ও জ্ঞান সাধনার পথ প্রশস্ত করে গেছেন।[৫৯৭] তাঁর সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন :

> Bagha is the head quarters of an estate called the Bagha wakf-estate, the origin of which is as follows. In 925 H.I.E. in 1507 A.D., a devotee named Hazrat Moulana Shah Daulah came and settled in Bagha. His tomb may be seen in a small cemetery in the masque compound with those of five of his relatives. In 1615 A.D., his grandson Moulana Hazrat Shah Abdul Waheb received by a pharman (letters patent) of the Mughal Emperor, a free grant of 42 villages yielding Rs. 8,000 a year for the support of the family.[৫৯৮]

তাঁর পুত্র মাওলানা আব্দুল হামিদ দানিশমান্দও একজন অত্যন্ত বুজুর্গ ও আলিম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ও তাঁর পান্ডিত্য, সততা ও ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অত:পর তৎপুত্র মাওলানা আব্দুল ওহাব বংশ পরস্পরায় ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[৫৯৯]

হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব (র.)

হযরত মাওলানা আব্দুর ওহাব (র.) যখন ইসলামের সেবায় নিয়োজিত তখন সময়টা ছিল মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচারিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ ধর্মের প্রতিক্রিয়ার যুগ। এ সময় তিনি বাঘায় শরীয়তি ইসলাম প্রচার করেন এবং নিজামিয়া ইসলামিক কলেজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন। হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব (র.) বংশ পরস্পরায় ইসলামের সেবার জন্য আট হাজার টাকা আয়ের লাখেরাজ সম্পত্তি লাভ করেন।[৬০০] তাঁর মাজার সম্ভবত তাঁর পিতার মাজারের পাশেই বিদ্যমান।[৬০১]

---

৫৯৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৫৯৮. Dr. Mumammad Enamul Haque, *A Histtory of Sufism in Benga*, Ibid, P. 233.

৫৯৯. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৬০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

৬০১. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

হযরত শেখ আখি সিরাজুদ্দীন (র.)

চতুর্দশ শতকে বাংলায় এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন হযরত শেখ আখি সিরাজুদ্দীন (র.)। তিনি হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের মধ্যে একজন ছিলেন। 'সিয়ারুল আরেফীন' গ্রন্থে তাঁর বিদ্যাবত্তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তৎকালীন হিন্দুস্তানে তাঁর সমকক্ষ কোন আলেম ছিল না এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করার যোগ্যতাও কারোর ছিল না।[৬০২] এই স্বনামধন্য সাধক দিল্লীর প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.)-এর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.) তাকে 'হিন্দুস্তানের দর্পণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাল্যকালেই তিনি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে উপনীত হন। সেখানে প্রথমে মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদী ও পরে মাওলানা রুকনুদ্দীনের কাছে দীন-ই-এলেন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬০৩] জ্ঞান শিক্ষা সমাপ্তির পর হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.) তাঁকে 'খিরকাহ-ই-খিলাফত' (আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর নির্দশন) দান করেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচরের আদেশ দেন।[৬০৪] ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ওস্তাদের মৃত্যুর পর তিনি উত্তর বঙ্গের গৌড়ে আগমন করে আস্তানা স্থাপন করেন। তখন বাংলাদেশে সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯–১৩৫৮ খ্রি.) এই সূফী সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬০৫]

হযরত শেখ আখি সিরাজুদ্দীনকে অনেকে বাদায়ুনের অধিবাসী বলে মনে করেন। কিন্তু অধিকতর প্রমান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়াও শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর বাংলাদেশে আগমন ও ইসলাম প্রচার তাঁর

---

৬০২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

৬০৩. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

৬০৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৬০৫. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০।

বাংলাদেশের অধিবাসী হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে।[৬০৬] এই মহান সাধক ৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে ইন্তেকাল করেন। গৌড়ের সাগরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দুটি শিলালিপি আজো তাঁর পরিচয় ঘোষণা করছে। প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিন তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়।[৬০৭]

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (র.)

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম হলদবিহার, এখানে হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (র.)-এর মাজার বিদ্যমান।[৬০৮] কথিত আছে স্বপ্নযোগে সূফীসাধক সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (রহ.) হলদবিহারের এক নির্মম কাহিনী অবগত হয়ে তা নিরসনকল্পে সুদূর আরব থেকে কতিপয় মুজাহিদ সহচরসহ এতোদঞ্চলে এসে পৌছান এবং ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের মান মর্যাদা রক্ষাকল্পে তাঁর সহচরদের অনেকেই শাহাদৎ বরণ করেন। পীর দেওয়ান সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (র.) ও তাঁর সহচরদের মাজারগুলো এখনো বিদ্যমান আছে।[৬০৯]

হযরত উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী (র.)

উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে যে মুজাহিদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন উলুগ-ই-আযম হুমায়ুন জাফর খাঁ বাহরাম ইৎসীন গাজী। সম্ভবত তিনি লখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাউকাউসের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নিদের্শে তিনি বহুস্থানে অভিযান চালিয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। বরেন্দ্র ভূমিতে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রামান্য নিদর্শন হচ্ছে একটি পুরাতন মসজিদ। দিনাজপুর জেলার দেবীকোট নামক স্থানের এ মসজিদটি বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর শিলালিপিটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, হযরত উলুগ-

---

৬০৬. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

৬০৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৬০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৬০৯. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

ই-আযম জাফর খাঁ গাজী (র.)-এর আদেশে মুলতানবাসী মালিক জীওন্দ কর্তৃক ৬৯৭ হিজরীর মুহররম মাসের প্রথম তারিখে (১২৯৭ খ্রি.) মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[৬১০]

হযরত জাফর খাঁ গাজী (র.) বহু অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বরেন্দ্র ও রাঢ় এলাকায় ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও মিনারসহ মুসলিম স্থাপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর মারেফাতপন্থী সূফী ছিলেন। বহু মানুষ তাঁর কাছে বায়'আত হয়ে অনাবিল শান্তিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সূফী, দরবেশ, পীর, বুযুর্গ আলিম ও একজন প্রথম শ্রেণীর মরদে মুজাহিদ। এই মহান সাধক ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে ইন্তেকাল করেন। সেখানে একটি প্রস্তর নির্মিত খানকাহ শরীফে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৬১১]

হযরত শাহ বদরউদ্দীন ওরফে পীর বদর (র.)

হযরত শায়খ সিরাজউদ্দীন (র.)-এর শিষ্য হযরত শাহ বদর উদ্দীন (র.) গুরু কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি গৌড়ে আসেন ইসলাম প্রচার করতে। ঐ সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। দিনাজপুর তখন হিন্দু শাসিত এলাকা ছিল। রাজা মহেশ ছিলেন এখানকার শাসনকর্তা। মহেশ অত্যান্ত মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন।[৬১২] হযরত শাহ বদরউদ্দীন (র.) তার সময়ে দিনাজপুর হেমাতাবাদে আসেন এবং আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি এখানে ইসলাম প্রচার শুরু করলে রাজা মহেশ বাধা প্রদান করেন। কথিত আছে রাজা মহেশ নানা ভাবে পীর সাহেবকে অত্যাচার করলে পীর বদর উদ্দীন (র.) গৌরের সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এর কাছে নালিশ করেন। ফলে হোসেন শাহ দিনাজপুর আক্রমন করেন। রাজা মহেশ পরাজিত ও নিহত হন। অত:পর পীর সাহের

---

৬১০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৬১১. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আর্বিভাব ও ক্রমবিকাশ*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫), পৃ. ১০৬।

৬১২. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

এতোদঞ্চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সূফী মত প্রচার করে বিপুল সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহে সক্ষম হন।[৬১৩]

দিনাজপুরের হেমোতাবাদের অনতিদূরে এখনও প্রাসাদমালার ধ্বংসাবশেষ এবং একটি চতুর্ভুজাকৃতি স্তম্ভের ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। লোকে এই ধ্বংসোম্মুখ প্রাসাদমালাকে মহেশ রাজার রাজবাড়ী ও স্তম্ভটিকে ''হুসাইন শাহী তখ্‌ত্‌'' বলে অভিহিত করে থাকে। সম্ভবত: মহেশ রাজা পরাজিত হলে, এতোদঞ্চলে যখন মুসলমানদের অধীনে হয়, তখন হুসাইনশাহ স্তম্ভটি নির্মাণ করে তাঁর বিজয় স্মৃতি রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। হযরত শাহ বদর উদ্দীন (র.)-এর সমাধি হিন্দু প্রসাদমালার উপাদান দ্বারা গঠিত। কেননা তাঁর সমাধির গায়ে মুর্তি দেখা যায়। মনে করা হয় মহেশ রাজার প্রাসাদ ভেঙ্গে সেই উপকরণ দিয়ে পীরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল।[৬১৪] দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হেমোতাবাদ নামক স্থানে হযরত শাহ বদর উদ্দীন (র.)-এর মাজার বিদ্যমান।[৬১৫] পরে তাঁর মাজারের পার্শ্বে একটি চমৎকার মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদ পাঠান আমলের কারুশিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। মসজিদটি কোন সময়ে নির্মিত তা মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের গাত্রদেশে আরবী তুঘ্‌রা অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়।[৬১৬]

হযরত শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা (র.)

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা (র.) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক। জনশ্রুতি আছে তিনি একটি প্রস্তর খণ্ড চড়ে চট্টগ্রাম আসেন এবং অলৌকিক শক্তির দ্বারা চাটি জ্বালিয়ে সেই স্থানের অশুভ শক্তির প্রভাব দূর করেন। স্থানীয় উপভাষায় প্রদীপকে চাটি বলে এবং কারো

৬১৩. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬১৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৬১৫. Eastern Bengal District Gazetters, *Dinajpur*, 1912, P. 20.

৬১৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

কারো মতে, বদর শাহ এর চাটি থেকেই চাটিগাহ (প্রদীপের স্থান) চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।[৬১৭]

হযরত শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা (র.) চট্টগ্রামের সূফীদের অভিভাবক হিসেবে পরিচিত। তাঁর পুরো নাম কারো জানা নেই, তিনি বদর শাহ, বদর পীর এবং বদর নামে পরিচিত। সম্ভবত তাঁর প্রকৃত নাম বদরুদ্দীন আল্লামা।[৬১৮] ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে দেবনামে জনৈক বৈষ্ণব রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু চট্টগ্রাম এলাকায় বরাবরই মগ দস্যুদের আক্রমন হতো এবং আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি মোটেই সুখকর ছিল না। এ রকম পরিস্থিতিতে হযরত বদরুদ্দীন আল্লামা (র.) চট্টগ্রামে আসেন এবং মগ দস্যুদের বিতাড়নের ব্যাপারে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। 'জিনের আস্তানা' ও 'পরীর পাহাড়' এ সবই আরাকান থেকে আগত মগ দস্যুদের ঘাটি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিহাবুদ্দীন ত্যালিশের রচিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মুসলমানরা প্রথম চট্টগ্রাম দখল করে। এই সময় ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের রাজত্বকাল চলছিল।[৬১৯] প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৪৬-৪৭ সালের শীতকালে বাংলাদেশ পরিভ্রমণকালে চট্টগ্রাম বন্দর ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের অধীনে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬২০] এজন্য একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের সেনাপতি কদল খান গাজী চট্টগ্রামে পীরের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। চট্টগ্রামের মধ্যভাগে বকশী বাজারে হযরত শাহ বদরুদ্দীন (র.)-এর মাজার অবস্থিত। নিয়মিতভাবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও দেশীয় খ্রিষ্টানরা এই মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য আগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা নেই। তবুও প্রতিবছর ২৯শে রমজান মাজারে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। তিনি

---

৬১৭. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৬১৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬১৯. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

৬২০. East Bengal Gazetters, *Chittagong*, 1908, P. 20-21.

হিন্দু মুসলমানের মিলিত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আজও পর্যন্ত চট্টগ্রামের হিন্দু ব্যবসায়ীরা নববর্ষের হালখাতায় জমা খরচ লেখা শুরু করার আগে 'পীর বদর ভরসা' লিখে থাকে।[৬২১]

হযরত কাতাল পীর (র.)

"বার আউলিয়ার দেশ" হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম যেসব সূফী সাধকের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত কাতাল পীর (র.) একজন। হযরত কাতাল পীর (র.) এর মাজার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত কাতালগঞ্জে অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি কাতল মাছের পিঠে চড়ে এসেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে কাতাল পীর।[৬২২] তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল তা জানা যায় না। স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি কাতাল পীর নামে পরিচিত। এ নামের কারণে ঐ স্থানের নামকরণ হয়েছে কাতলগঞ্জ। ধারনা করা হয় যে, তিনি শাহ বদরের সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবত মগদের সাথে যুদ্ধে অসীম বীরত্বের কারণে তিনি কাত্তাল উপাধি লাভ করেন। কারণ আরবীতে 'কাত্তাল' বলতে সাধারণত দুর্দান্ত ও অসম সাহসী যোদ্ধাই বোঝায়, যিনি অসংখ্য শত্রু নিপাত করেন। আর 'কাত্তাল' শব্দটি মূলত যুদ্ধ, জিহাদ ও হত্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই 'কাত্তাল' শব্দটি যে পরবর্তীকালে 'কাতালে' পরিণত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।[৬২৩]

হযরত শাহ মুহসীন আউলিয়া (র.)

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যাঁরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন হযরত শাহ মুহসীন আউলিয়া (র.) তাঁদের অন্যতম। হযরত বদরুদ্দীন আল্লামা (র.)-এর সাথে তিনি চট্টগ্রামে আসেন। তাঁরা সর্বপ্রথম ভারতের পানিপথ হয়ে বাংলা ও গৌড়ে আসেন। সেখানে তাঁরা বেশীদিন বসবাস করেননি। তাঁরা নদী পথে ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানেও বেশীদিন অপেক্ষা না করে আবার নদীপথে চট্টগ্রামের দিকে চলে যান। এখানে এসে তিনি প্রথমে আনোয়ারা উপজেলার ঝিয়ারী গ্রামে খানকাহ শরীফ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইসলামের প্রচার ও মানব

---

৬২১. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

৬২২. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬২৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ গ্রামের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাঁর মানবিক মূল্যবোধ ও অলৌকিক কারামত দেখে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।[৬২৪]

হযরত শাহ মুহসীন আউলিয়া (র.)-এর কবর এক সময় আনোয়ারা থানার ঝিয়ারী গ্রামে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে শংখ নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই কবর নিকটবর্তী বটতলী গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়।[৬২৫] তাঁর মাজারে একটি প্রাচীন তুঘরা অক্ষরের লিখিত ফারসী শিলালিপি আছে, তাতে লেখা রয়েছে তিনি ৮০০ হিজরী বা ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৬২৬]

হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ (র.)

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ (র.)-এর দান অতুলনীয়। ইবনে বতুতার মতে, তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৬২৭] বস্তুত সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জেলা সমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব এ কথাই প্রমাণ করে। তিনি ৭০৩ হিজরী সনে অর্থাৎ ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট আগমন করেন।[৬২৮]

হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ (র.) তুর্কিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[৬২৯] তিনি ৫৯৫ হিজরী মোতাবেক ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৩০] নাসিরউদ্দীন হালদার

৬২৪. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আর্বিভাব ও ক্রমবিকাশ*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

৬২৫. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৬২৬. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬২৭. ইবনে বতুতা, *আযায়েবুল আসফার*, (উর্দু) অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৬২৮. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৬২৯. রিচার্ড এম. ইটন, হাসান শরীফ অনূদিত, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৮) পৃ. ১০২।

৬৩০. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৩৭৬।

নামক সিলেটের জনৈক মুনসেফ ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত 'সুহাইল-ই-ইয়ামান' নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, হযরত শাহজালাল (র.) ইয়ামান এর মোহাম্মদ নামক জনৈক দরবেশের পুত্র এবং তাঁর পুরো নাম শাহ জালাল মুজারদ-ই-ইয়ামনী। বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর মাতৃব্য প্রখ্যাত সূফী সৈয়দ আহম্মদ কবীর সোহরাওয়ার্দীর অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন ও শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শাহ সাহেব দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করেন। অবশেষে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হলে হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার (র.) (১২৩৬–১৩২৫) আতিথ্য লাভ করেন। কথিত আছে যে, দিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.) একজোড়া ধুসর রং এর পায়রা শাহ সাহেবকে উপহার দেন। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় এলাকায় এই ধরনের পায়রাকে 'জালালি কবুতর' নামে অভিহিত করা হয়।[৬৩১]

৩১৩ জন অনুচরসহ তিনি সিলেটে এসে উপস্থিত হন। মুসলিম সেনাপতি সিকান্দর খান গাযীকে সিলেট বিজয়ে তিনি সাহায্য করেন (১৩০৩ খ্রি.)। হযরত শাহ জালাল (র.) পবিত্র উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব এবং সম্মোহনের ফলে সিলেট সহজেই দখলে এসে যায় এবং ইসলামের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সিলেটেই খানকা স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে ও মানব সেবায় ব্রতী হলেন।[৬৩২] খানকা থেকে তিনি একদিকে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন এবং অন্যদিকে এ কেন্দ্রটিকে গরীব দু:খীদের জন্য সাহায্য সংস্থা রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সহচরগণ বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই মহান সাধকের সিলেট শহরেই মাজার বিদ্যমান। প্রতিদিন সেখানে বহুলোকের সমাগত হয়।[৬৩৩] মিশর দেশীয় বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে

---

৬৩১. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৬৩২. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৬৩৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

(৭৪৬ হি.) বঙ্গদেশে আসেন,[৬৩৪] তখন তিনি কামরূপে হযরত শাহ জালাল (র.) কে দেখতে গিয়েছিলেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহজালাল (র.) ইন্তেকাল করেন।[৬৩৫]

হযরত সৈয়দ মীরান শাহ (র.)

হবীগঞ্জ ষ্টেশনের দশ-বার মাইল দক্ষিণে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে সৈয়দ হাফেজ মওলানা আহমদ তান্নুরি তাওয়াক্কোলী ওরফে সৈয়দ মীরান শাহ (র.)-এর মাজার বর্তমান রয়েছে। তিনি পীরান-পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর পৌত্র এবং হযরত মওলানা আজাল্ল (র.)-এর পুত্র। বাদশাহ হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খ্রি.) পর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর অনেক আত্মিয় স্বজন ও বংশধর কাবুল, কান্দাহার, পারস্য, হিন্দুস্থান এবং পাক-বাংলায় আগমন করেন। হযরত সৈয়দ আজাল্ল (র.) সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে হিন্দুস্থানে আগমন করেন এবং সেখানেই মাওলানা সৈয়দ আহমন তান্নুরি (র.) এর জন্ম হয়।[৬৩৬] তিনি পিতার নিকট হতে যাহিরী ও বাতিনী ইলম শিক্ষা করেন এবং পরে অন্যান্য পীরের নিকট হতে কাদিরীয়া ও চিশতিয়া তরীকায় শিক্ষা লাভ করে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ আজল্ল (র.) বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলেও হযরত মীরান শাহ (র.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বারজন শিষ্যসহ পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন এবং পরে সেখান থেকে নোয়াখালি জেলার সোনারবাগে পৌছান। গৌরের সুলতান তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার রাস্তী শাহ (র.) ও রাশজাহীর শাহ মাখদুম রূপোশ (র.)-এর নিকট আত্মীয় এবং সিলেটের শাহ জালাল মুজর্রদ (র.) (মৃ. ১৩৪৬ খ্রি.) এর সমসাময়িক ছিলেন বলে কথিত আছে।[৬৩৭]

---

৬৩৪. N. Kanta Bhattasali, *Travels of Ibn Batutah* (An Extract)-Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, PP. 143-144.

৬৩৫. Ibid, P. 150। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬৩৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৬৩৭. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

হযরত মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশত বুখারী (র.)

রংপুরে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে প্রথম যে সাধক পুরুষের পরিচয় পাই তিনি হচ্ছেন হযরত মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশ্ত বুখারী (র.)। তিনি বুখারার সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশজাত। তাঁর প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ জালালুদ্দীন। তিনি বাসস্থান নির্দেশক পৈতৃক উপাধি ব্যবহার করতেন বলে তাঁকে 'বুখারী' উপাধি দ্বারাও পরিচিত করা হয়। তিনি ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ছিলেন। ভারত ও ভারতের বাইরের মুসলমান অধিকৃত দেশগুলিতে যত প্রসিদ্ধ সূফীকেন্দ্র ছিল সবগুলিতে তিনি পরিভ্রমন করেন বলে জানা যায়। তাঁর ভ্রমন তালিকা হতে বাংলাদেশও বাদ পড়ে নাই।[৬৩৮] অনেকের মতে তিনি একটি মাছের পিঠে আরোহণ করে রংপুরে আগমন করেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি 'মাহিসওয়ার' নামেও অভিহিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এই মাহিসওয়ার যে স্থানে অবতরণ করেন সেটিই তাঁর নামানুসারে মাহিগঞ্জ নামে পরিচিত লাভ করেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক অভিমত পোষণ করেন যে, এই মাহিগঞ্জই হচ্ছে রংপুরের আদি নাম। মাহিসওয়ারের এই প্রাচীন আস্তানাটি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে বহু নারী-পুরুষ আগমন করে এই সূফী সাধকের প্রতি তাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৬৩৯] এই মহান সাধক ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। পাঞ্জাবের 'উচ' নামক স্থানে তাঁর মাজার রয়েছে। রংপুর জেলার মাহিগঞ্জে হযরত মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন বুখারী (র.) এর মাজার বিদ্যমান। আফানুল্লা নামক কোন ভূঁইফোড় লোক এই দরগাটিকে সঞ্জীবিত করে তোলেন বলে জানা যায়।[৬৪০] অনুমান করা হয়, হযরত মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন বুখারী (র.) এর আস্তানাটি কালক্রমে মাজারে রূপ নিয়েছে। বর্তমানে মাজার প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ আছে। ১৯০৯ সালে মাহিগঞ্জের খ্যাতনামা কবিরাজ খান বাহাদুর আফানউল্লাহ সাহেব মাজারটির সংস্কার সাধন করেন এবং সেখানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন।[৬৪১]

---

৬৩৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৬৩৯. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৪) পৃ. ৫৮।

৬৪০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৬৪১. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

হযরত শাহ কামাল (র.)

হযরত শাহ কামাল (র.) ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামন থেকে প্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। পরে নানাদেশ ও জনপদ পর্যটনপূর্বক বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের (তৎকালে ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ছিল জিঞ্জিরা নদী) তীরে আল্লাহতায়ালার উপাসনার জন্য এসে উপস্থিত হন। তিনি ঐশীশক্তি বলে কামেল আউলিয়া হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ লাভেই স্থানীয় হিন্দু জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণের পুত্রের দুরারোগ্য অর্ধাঙ্গ ব্যাধি দুই একদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়। এর ফলে জমিদার হযরত শাহ কামালের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কামালপুর, গেদরা প্রভৃতি অঞ্চল জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। করাইবাড়ির জমিদার হযরত শাহ কামাল (র.)কে আসামের গোয়ালপাড়ার অন্তর্ভূক্ত বাকলাই মৌজা দানপত্র করে দেন। এই অঞ্চল এখনও জনসাধারণের নিকট পূণ্যভূমি বলে গণ্য।[৬৪২]

ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের তীরে হযরত শাহ কামালের মাজার অবস্থিত। তিনি হযরত শাহ জালাল মুজাররাদ (র.)-এর সাথে বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে ইসলাম প্রচার কার্যে ব্রুতী হন বলে জানা যায়। অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ গ্রন্থে লিখেছেন, "ইয়মন দেশীয় শাহ কামালুদ্দীন ১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের স্ত্রী ও নয়জন শিষ্যসহ তাঁর পিতা শাহ বোরহানুদ্দীনের অন্বেষনে সিলেট আসেন। শাহ বোরহানুদ্দীন ছিলেন হযরত শাহ জালাল (র.) এর একজন প্রধান শিষ্য। হযরত শাহ কামাল (র.) সিলেটে এসে হযরত শাহ জালাল (র.) এর মুরীদ হন। পীরের আদেশে শাহ কামাল (র.) কয়েকজন শিষ্যসহ সুনামগঞ্জের শাহারপাড়া নামক স্থানে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করেন এবং উহার চতুস্পর্শ্বাবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।"[৬৪৩]

---

৬৪২. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৬৪৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫।

হযরত সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.)

হযরত সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.) উত্তর বঙ্গের একজন প্রভাবশালী ইসলাম প্রচারক ও সূফী ছিলেন। চর্তুদশ শতকে (১৩৪২–১৩৫৭ খ্রি.) গৌড়ের সুলতান ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। তিনি মুসলিম সূফী ও দরবেশদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। এ সময় গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় যে সব সূফী সাধকের আগমন ঘটে তাঁদের মধ্যে হযরত সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.) সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল সুলতান ইলিয়াস শাহের।[৬৪৪] এমনকি দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ (১৩৫১–১৩৮৮খ্রি:) ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় আক্রমন করলে সুলতান ইলিয়াস শাহ একডালা দূর্গে আশ্রয় নিলে চতুর্দিকে ফিরোজ শাহের সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় নগর অভ্যন্তরে সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.)-এর মৃত্যু হয়। ইলিয়াস শাহ ভয়াবহ বিপদের ঝুকি নিয়ে ফকীরের ছদ্মবেশে দূর্গ থেকে বের হন এবং হযরত সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.)-এর জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করে আবার দুর্গে ফিরে যান। এ থেকে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের উপর সাইয়েদ রিযা বিয়াবানী (র.) এর প্রভাব অনুমান করা যায়। এই মহান সাধকের প্রচেষ্টায় বহুলোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬৪৫]

হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (র.)

বৃহত্তর কুমিল্লায় ইসলাম প্রচারকগণের মধ্যে হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (র.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি হযরত রাসতি শাহ (র.)-এর সমসাময়িক ছিলেন।[৬৪৬] সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের কাছ থেকে শাহতলী মৌজাটি নিস্কর সম্পত্তি হিসেবে লাভ করার পর তিনি সেখানে আস্তানা স্থাপন করেন এবং জনসাধারণের

---

৬৪৪. M. Abid Ali Khan, Khan Sahib, *Memoris of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1924, P. 83 ; গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৬৪৫. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৬৪৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আর্বিভাব ও ক্রমবিকাশ*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

মধ্যে ইসলামের আদর্শ প্রচার করেন। কুমিল্লার শাহতলী রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী শাহতলী খন্দকার বাড়িতে হযরত শাহ মুহম্মদ বাগদাদী (র.)-এর মাজার অবস্থিত।[৬৪৭]

হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.)

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে তথা বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পথিকৃৎ হলেন হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.)। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে দিগ্বিজয়ী তৈমুর লংগের (১৩৬১–১৪০৫ খ্রি.) নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাংলায় আগমন করে প্রায় সর্বত্রই ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলের নদী বেষ্টিত দূর্গম এলাকা বরিশালে আগমন করে বাউফলে আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি এই এলাকায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচারে সক্ষম হন।[৬৪৮]

জনশ্রুতি থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.) প্রথমে সমগ্র এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেখানে ইসলামের আলো এখনও প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি, সেই এলাকায় তিনি আস্তানা স্থাপন করবেন। কিন্তু তিনি দেখলেন বাংলার সর্বত্র ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তবে অসংখ্য নদী পরিবেষ্টিত বাকেরগঞ্জ জেলা ভ্রমণকালে তিনি এমন বহু স্থান দেখলেন, যেখানে একজনও মুসলমান নেই। এমনি একটি স্থান ছিল কালিশুড়ি। এখানেই তিনি আস্তানা স্থাপন করেন। পটুয়াখালী ও বরিশালের বহু অমুসলিমকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন।[৬৪৯] বরিশাল জেলার বাউফল থানার কালিশুড়ি গ্রামে হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.)-এর মাজার রয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসে কালিশুড়িতে এই সাধকের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি মেলা বসে। কথিত আছে, তিনি নদীপথে গমনকালে শুড়িশ্রেণীভূক্ত কালী নাম্নী কোন হিন্দু বালিকাকে 'কারামত' দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলে, বালিকা সাধকের নিকট

---

৬৪৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৬৪৮. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৪৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

বর প্রার্থনা করেছিল। তিনি বালিকাকে বর দিলেন যে, বালিকা তখন যেখানে দাড়িয়েছিল, সেই স্থানে প্রতি বছর একটি মেলা বসবে ও সেই মেলা বালিকার নামে পরিচিত হবে। হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র.) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।[৬৫০]

হযরত শাহ লঙ্গর (র.)

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার মোয়াজ্জেমপুরে হযরত শাহ লঙ্গর (র.)-এর মাজার রয়েছে। তাঁর মাজার শরীফ সংলগ্ন মসজিদটি গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন আহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩১–১৪৪২ খ্রি.) নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। তাতেই মনে হয় যে, হযরত শাহ লঙ্গর (র.) হয়তো শামসুদ্দীন আহম্দ শাহের সমসাময়িক অথবা তার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।[৬৫১]

হযরত শাহ লঙ্গর (র.)-এর প্রকৃত নাম জানা যায় না। লঙ্গর শব্দটি কোন নাম হতে পারে না। সম্ভবত এটি লঙ্গরখানা শব্দের অংশ বিশেষ। এ থেকে অন্ততপক্ষে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, হযরত শাহ লঙ্গর (র.) নিজের আস্তানার সঙ্গে কোন বড় আকারের লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি গরীব-দু:খী ও অভাবী নও-মুসলিমদের আহার যোগাতেন। এ লঙ্গরখানা অত্যাধিক প্রসিদ্ধি ও সাফল্য লাভ করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর আসল নাম ও পরিচয় এর অন্তরালে চাপা পড়েগিয়েছিল। তাঁর এই লঙ্গরখানাই তাঁর ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। আ.ন.ম. বজলুর রশীদ তার "পাকিস্তানের সুফী সাধক" গ্রন্থে শাহ লঙ্গর (র.) কে বাগদাদের কোন শাহজাদা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সংসার ত্যাগী শাহজাদা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকার মুয়াজ্জমপুরে এসে আস্তানা গড়েন।[৬৫২]

হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.)

হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.)-এর পিতা ওমর বিন আসাদ বিন খালিদ লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভাগ্যন্বেষনে গৌড়ে আগমন করেন। এখানে তাঁর পুত্র

---

৬৫০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৬৫১. Eastern Bengal District Gazetters, *Dacca*, 1912, P. 65.

৬৫২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.)-এর জন্ম হয়।[৬৫৩] তিনি বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-১৩৯২ খ্রি.) কোষাধক্ষ। তাঁর ভাই আজম খান পাণ্ডুয়া রাজদরবারের অন্যতম উজীর ছিলেন। বংশ ও বিত্তের অভিজাত্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্বের যোগ হওয়ায় হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.) শীঘ্রই এক খ্যাতিমান পুরুষ হয়ে ওঠেন।[৬৫৪] তিনি যেহেতু ধনী পিতার সন্তান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাই তার মনে নিজের সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা স্বভাবতই গড়ে উঠেছিল। তিনি 'গঞ্জে নবাত' (মিষ্টান্ন ভাণ্ডার) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। একদিন এক শুভক্ষণে দিল্লী থেকে লক্ষণাবতীতে পদার্পণ করেন হযরত শেখ আখি সিরাজউদ্দীন (র.)। এই সিদ্ধ পুরুষের চরিত্র মহিমায় মুগ্ধ হয়ে শেখ আলাউল হক (র.) তাঁর হাতে মুরীদ হন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬৫৫] তাঁর শিষ্য হয়ে ঐশ্বর্য, প্রভাব ও বংশের আভিজাত্য ত্যাগ করে সেবা ও কৃচ্ছসাধনের জীবনে তিনি একনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর হন। সেবা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি গুরুর প্রীতিভাজন হয়ে তাঁর খিলাফত লাভ করেন। হযরত আখি সিরাজউদ্দীন (র.)-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ব্রত ও আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত রাখেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিস্ময়কর মনীষার জন্য পাণ্ডুয়া সেই যুগে ধর্মীয় ও মননশীল জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে পড়ে।[৬৫৬] হযরত শেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক (র.) গৌড়ে একটি খানকাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ভিক্ষুক, পরিব্রাজক ও বিদ্যার্থীগণের জন্য নিজ ব্যায়ে খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই আশ্রম রক্ষায় তিনি অজস্র অর্থব্যয় করতেন। কেউ তাঁর আশ্রম হতে নিরাশ হয়ে ফিরতেন না। তাঁর এরকম বদান্যতায় দীন দরিদ্রের অভাব দূর এবং মূর্খ ও নিরক্ষরদের হৃদয় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। গৌরের সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রি.) দরবেশের এই বদান্যতার কথা শুনতে পেলেন এবং দেখলেন যে, তার রাজকোষ ও দরবেশের দানশীলতার কাছে হার মানিয়েছে। সুতরাং গৌড়ে দরবেশের

৬৫৩. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৬৫৪. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৬৫৫. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

৬৫৬. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

অবস্থানের কারণে সুলতানের দানশীলতার দুর্নাম রটার আশঙ্খা দেখা দেয়। তাই সুলতান দরবেশকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেছিলেন।[৬৫৭] সেখানেও তিনি খানকা স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। দু'বছর সোনারগাঁওয়ে থাকার পর সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেন। তিনি ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহে তাঁর মাজার অবস্থিত।[৬৫৮]

হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.)

রংপুর তথা উত্তর বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) একটি চিরস্মরণীয় নাম। তিনি আরবের মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন এবং ধর্মীয় উপদেশ প্রদান ও ব্যাখ্যাদানে সময় অতিবাহিত করতেন।[৬৫৯] যৌবনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান বারবাক শাহ (১৪৫৯–১৪৭৪ খ্রি.) গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন তখন তিনি বাংলায় আসেন। সুলতান এই সূফী দরবেশের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সেনাপতি নিয়োগ করেন।[৬৬০] তিনি সেনাপতিরূপে উড়িষ্যার রাজা গজপতির সঙ্গে লড়াই করে মান্দারন সুলতানের দখলে আনেন। কামরূপ জয় করে ও তিনি সুলতান বারবাক শাহকে সাহায্য করেন। সুলতান তাঁকে গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন।[৬৬১]

ঘোড়াঘাট সীমান্ত দূর্গের অধিনায়ক ভান্দশী রায় হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) উপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তিনি সুলতানের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করলেন যে, হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) কামরূপ রাজার সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। সুলতান ভান্দশী রায়ের কথা বিশ্বাস করে হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) এর শিরচ্ছেদ করার

---

৬৫৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৬৫৮. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

৬৫৯. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৬৬০. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৬৬১. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের আদেশে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। পরে অবশ্য সুলতান ভন্দশী রায়ের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বিলাপ করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন।[৬৬২] রংপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার চারটি স্থানে এই দরবেশের সমাধি মন্দির আছে। তার মধ্যে কাঁটাদুয়ার বা ছত্রহাটা নামক স্থানের দরগাহটি অতি প্রসিদ্ধ। ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত একটি ফারসী জীবনীতে হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) যাবতীয় জীবন কাহিনী পাওয়া যায়।[৬৬৩]

হযরত খান জাহান আলী (র.)

খুলনা, যশোর ত্রয়োদশ শতাব্দীকালের প্রথমার্ধে হযরত খান জাহান আলী (র.) (১৪৩৭–১৪৫৮ খ্রি.) ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি খান জাহান খান ও উলুগ খান-ই-জাহান নামেও সমধিত পরিচিত ছিলেন। তিনি এতদঞ্চলে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এ অঞ্চলের অসংখ্য বিধর্মীগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সাথে সাথে তাঁর শিষ্যদেরকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভৈরবকুলী মুড়লী কসবার গরীব শাহ, বাহরাম শাহ খানপুর, মেহেরপুরে পীর মহীউদ্দীন, মাগুরায় পীর জয়ন্তী আরো অনেকে বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন।[৬৬৪]

এছাড়াও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মীর খাঁ, চাঁদ খাঁ, এখতিয়ার খাঁ, বখতিয়ার খাঁ, আলম খাঁ প্রমুখ খুলনা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। হযরত খান জাহান আলী (র.) যশোর ও খুলনার সমগ্র এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসলামী দাওয়াতের

৬৬২. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

৬৬৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৬৬৪. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস* (বাগেরহাট: বেলায়েত হোসেন ফাউণ্ডেশন, ২০০১), পৃ. ৬৪-৬৫।

সম্প্রসারণ ঘটান।[৬৬৫] বর্তমান বাগেরহাট শহরটি তিনিই স্থাপন করে নাম রাখেন খলীফাতাবাদ। বাগেরহাটের দৃষ্টি নন্দন ষাট গম্বুজ মসজিদসহ এ এলাকার অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ স্থাপনসহ বহু জনহিতকর কাজ করে তিনি এ এলাকা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কাছে অমর হয়ে আছেন।[৬৬৬]

খুলনা জেলার বাগেরহাটে হযরত খান জাহান আলী (র.)-এর মাজার অবস্থিত। মাজার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর এক নগণ্য দাস, বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ প্রত্যাশী, রাসুলে করীম (স.)-এর বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী উলুগ-খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬ জিলহজ্জ বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন।" শিলালিপিতে উল্লেখিত তারিখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৬৬৭] এই মহান সাধকের বার্ষিক উরস উপলক্ষে দরগাহ শরীফে এবং ষাট গম্বুজ–এ প্রতি বছর চৈত্র পূর্ণিমায় তিন দিন ব্যাপি বিরাট মেলা বসে। এই মেলাকে লোকেরা 'খাঞ্জানির মেলা' বলে।[৬৬৮]

হযরত খালাস খান (র.)

পীর দরবেশগণই যশোহর জেলার নানা স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এই জেলার ওলী দরবেশদের মধ্যে হযরত খালাস খান (র.) এর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কপোতাক্ষ নদীর পুর্বতীরস্থ সুন্দরবনের দেবকাশী নামক স্থানটি তিনি তাঁর প্রচার কেন্দ্র রূপে বেছে নিয়েছিলেন।[৬৬৯] তখন যশোহর জেলা ও সুন্দরবনের এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত এসে

---

৬৬৫. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত (কলিকাতা: দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৩১৯।

৬৬৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৪।

৬৬৭. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৬৬৮. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

৬৬৯. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

পৌছেনি। তিনিই এ অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক। সম্ভবত তাঁর আগে বা সমসময়ে যশোহর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে বড় খান গাজী ও খান জাহান আলীর আবির্ভাব হয়েছিল। তুর্কী সুলতানদের রাজত্বকালে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর আগমনকালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বেদকাশী গ্রামে খালাস খাঁ দীঘির পাড়ে একটি প্রাচীন কালী মঞ্চের কাছে হযরত খালাস খান (র.)-এর মাজার অবস্থিত। দীঘি খনন করা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ও খান জাহান আলী (র.)-এর ন্যায় জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। কোন রাজশক্তির সহায়তা ছাড়াই পৌত্তলিকতার অবসান করে এ অঞ্চলকে তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাকে যে বিপুল সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৬৭০]

হযরত শাহজালাল দক্ষিণী (র.)

হযরত শাহ জালাল দক্ষিণী (র.) পঞ্চদশ শতকের একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪–১৪৮১ খ্রি.) শাসনকালে গুজরাট থেকে কয়েকজন শিষ্যসহ পূর্ববঙ্গে আসেন। দাক্ষিণাত্য থেকে আগমন করায় সম্ভবত লোকে তাঁকে দক্ষিণী বলে অভিহিত করে।[৬৭১] মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী লিখিত 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত শাহ জালাল দক্ষিণী (র.) উত্তর ভারতের স্বনামধন্য সূফী শায়খ সলীম চিশতীর বিখ্যাত বাঙ্গালী শাগরিদ শায়খ পিয়ারার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাদশাহর ন্যায় জাঁকজমক সহকারে বসতেন এবং শাগরিদদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করতেন। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং তাঁর শাগরিদগণের প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে তৎকালীন সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন।[৬৭২] ১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সেনাদলের হাতে

---

৬৭০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৬৭১. মহিবুর রহমান লিটন, *বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৬৭২. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

হযরত শাহ জালাল দক্ষিণী (র.) ও তাঁর শাগরিদগণ সবাই নিহত হন। ঢাকায় বঙ্গভবনের পাশেই তাঁর মাজার রয়েছে।[৬৭৩]

হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.)

ঢাকা জেলায় আগত ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) অন্যতম। তিনি ঢাকার প্রায় আট মাইল উত্তর পশ্চিমে মিরপুর এলাকায় অনন্তনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁর বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত যে কুরসীনামা বা বংশ পরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় যে, ৮৩৮ হিজরীতে (১৪১২ খ্রি.) হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) একশত জন সূফী সাধক ও দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ থেকে দিল্লীতে আসেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যই তিনি দিল্লীতে আসেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর।[৬৭৪] দিল্লী থেকে প্রথমে তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। অত:পর সেখান থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গী-সাথীসহ ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৭৫] হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) একশত বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত কুরসীনামায় লিখিত আছে যে, ৯২৩ হিজরীতে (১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৭৬] কিন্তু ঢাকা গেজেটিয়ারের সংকলক বি.সি. এ্যালেন এর মতে তিনি ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৭৭] তাঁর মাজার সংলগ্ন মসজিদে একটি শিলালিপি আছে, তাতে দেখা যায় মসজিদটি ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[৬৭৮] ড. এনামুল হকের মতে, বাংলার মাজার সংলগ্ন কোন মসজিদ দরবেশের মৃত্যুর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। সুতরাং হযরত শাহ আলী বাগদাদী ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ইন্তেকাল করেন।[৬৭৯]

---

৬৭৩. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৬৭৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

৬৭৫. ওহীদুল আলম, *বাংলাদেশে ইসলাম*, অগ্রপথিক সংকলন (ঢাকা: ইফাবা, জুলাই ২০০৪), পৃ. ১৬৩।

৬৭৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৬৭৭. Eastern Bengal District Gazetters, *Dacca*, 1912, P. 65.

৬৭৮. J.A.S.B. Vol. XLIV. 1875. Pt. 1, P. 293.

৬৭৯. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

হযরত শাহ পীর (র.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানায় হযরত শাহ্ পীর (র.)-এর মাজার রয়েছে। এই মাজার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এক পবিত্র স্থান। এই মাজারের মাইল তিনেকের মধ্যে দরবেশের হাট নামে এক বিখ্যাত হাট রয়েছে। এলাকাবাসীর বিশ্বাস হযরত শাহ্ পীর (র.) স্বয়ং এই হাট চালু করে গেছেন।[৬৮০] কিংবদন্তি অনুসারে তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ ইউসুফ। তিনি নাকি দিল্লীর শাহজাদা ছিলেন। যৌবন অতিবাহিত হলে তিনি ক্রমশ সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে সংসার পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে কাঠোর সাধনায় তিনি এক মস্তবড় অলী আল্লাহ হয়ে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আসেন তিন বা চারশত বছর পূর্বে। তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন।[৬৮১]

সংযুক্ত প্রদেশের মীরাটে শাহ্ পীর নামক কোন বিখ্যাত দরবেশের সমাধি আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান এই দরবেশের কবরের উপর এক সুরম্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। জানতে পারা যায়, এই হযরত শাহ্ পীর (র.) ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি সত্তারি সম্প্রদায়ভূক্ত সূফী সাধক ছিলেন।[৬৮২] দুইজন যদি একই ব্যক্তি হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, সাতকানিয়ার মাজারটি হযরত শাহ্ পীর (র.) এর একটি স্মারক মাজার এবং তিনি সতের শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।[৬৮৩]

হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী (র.)

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার আটিয়া গ্রামে হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী (র.)-এর মাজার অবস্থিত। তিনি চিশতিয়া তরীকাপন্থী এবং দিল্লীর প্রসিদ্ধ সূফী দরবেশ সলীম শাহর শিষ্য ছিলেন। তিনি হযরত শাহানশাহ সাহেব নামে সাধারণত পরিচিত ছিলেন। তিনি

---

৬৮০. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৬৮১. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৬৮২. Encyclopadia of Religion and Ethics-Article, *"Indian Saints"*. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৬৮৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

ছিলেন তেজ ও জালালী ফায়েজের অলী।[৬৮৪] কথিত আছে যে, আটিয়া ও শেরপুরের ইসলাম বিদ্বেষী রাজাদের দমন করার জন্য তিনি সম্রাট আকবরের সেনাপতি সাঈদ খান পন্নীর সাথে এদেশে আসেন। তাঁর সঙ্গে চল্লিশ জন মুরীদ ও সহচর এদেশে আসেন। বিজয়ী সাঈদ খান পন্নী পুরস্কার স্বরূপ আটিয়া পরগনার জায়গীরদারী পান। তিনি তাঁর জায়গীরের এক চতুর্থাংশ হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী (র.) কে দান করেন। কিন্তু তিনি এই জায়গীর প্রজাদের দান করেন। সেই থেকে প্রজারা এই সুবিধা ভোগ করত।[৬৮৫] হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী (র.) ৯১৩ হিজরী (১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজারের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় জমিদার চৌদ্দখানা গ্রাম ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ের অনেক কীর্তি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।[৬৮৬]

হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.)

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার দেড় মাইল দূরে শ্রীমতি নদীর পাড়ে হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.)-এর মাজার রয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত বারো আউলিয়ার একজন অন্যতম আউলিয়া। আজও পর্যন্ত দূর-দূরান্ত ও স্থানীয় অধিবাসীরা এই মহান সাধক পুরুষের মাজার জিয়ারত করে থাকেন।[৬৮৭]

কথিত আছে, তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং দিল্লীতে আত্মগোপন করে বাস করতেন। দিল্লীর জনৈক শাহাজাদী মনের মত স্বামী সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করার জন্য যান। তিনি শাহাজাদীকে জানিয়ে দেন যে, তার স্বামীভাগ্য নেই। এতে শাহাজাদী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। শাহাজাদীর ভয়ে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার সর্ব পূর্বপ্রান্তে চলে আসেন। এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পর তিনি চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গড়েন। ইতিপূর্বে তিনি যেসব স্থানে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানগুলো তাঁর নামে পরিচিত হয়। যেমন –মেঘনা পাড়ের চাঁদপুর বন্দর,

---

৬৮৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬৮৫. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

৬৮৬. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬৮৭. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

সীতাকুণ্ডের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী চাঁদগাঁও এবং পটিয়ার চাঁটখালী, এসব স্থানের নামকরণ থেকে হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.) এর জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। তিনি যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।[৬৮৮]

শোনা যায়, কিছুদিন পরে দিল্লীর শাহাজাদী হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.)-এর অনুসন্ধানে দলবলসহ চট্টগ্রামে পৌছেন। এতে দরবেশ শাহাজাদীকে বিয়ে করতে সম্মতিজ্ঞাপন করে একদিন হঠাৎ ইন্তেকাল করেন। শাহাজাদী আর দেশে না ফিরে অনুচরবর্গসহ পটিয়ায় বাস করতে থাকেন। পটিয়ার বর্তমান ‘চিকন কাজীর’ বংশধরেরা এই শাহাজাদীর কোন অনুচরের বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। তাদের মৌখিক বংশ তালিকা হতে দেখা যায়, তারা বর্তমানে দ্বাদশ পুরুষে এসে দাড়িয়েছেন। তা হলে হযরত শাহ চাঁদ আউলিয়া (র.) ষোড়শ শতাব্দীর লোক হতে পারেন।[৬৮৯]

হযরত শরফুদ্দীন চিশতী (র.)

হযরত শরফুদ্দীন চিশতী (র.) একজন বিখ্যাত সূফী সাধক। তিনি খাজা চিশতী বেহেশতী নামে বেশী পরিচিত ছিলেন। মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৫ খ্রি.) তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। এতদঞ্চলে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম প্রচার করেন।[৬৯০] অনেকে তাঁকে নওয়াব আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতীর উত্তর পুরুষ বলে মনে করে।[৬৯১] তিনি ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ঢাকার সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেখানে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।[৬৯২]

---

৬৮৮. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

৬৮৯. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৬৯০. ওহীদুল আলম, *বাংলাদেশে ইসলাম*, অগ্রপথিক সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৬৯১. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৬৯২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩তম খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৭), পৃ. ৬১৫।

হযরত কাযী মুওয়াক্‌কিল (র.)

চট্টগ্রামের মীরসরাই থানার গোবালিয়া দীঘির পাড়ে হযরত কাযী মুওয়াক্‌কিল (র.)-এর মাজার রয়েছে।[৬৯৩] মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৯-১৭০৭ খ্রি.) তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর অগাধ পণ্ডিত্য ও উন্নত চরিত্র মাধুর্য বহু অমুসলিমকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দানে সাহায্য করে।[৬৯৪]

তাঁর সম্পর্কিত প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি বাদশা আওরঙ্গজেবের একজন কাযী ছিলেন। তাঁর উন্নত চরিত্র ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে বাদশা তাকে "কাযী-উল-কুজাত" বা প্রধান বিচারপতি পদে অভিষিক্ত করেন।[৬৯৫] কিন্তু অচিরেই সম্রাজ্ঞীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমার রায় নিয়ে সম্রাজ্ঞীর সাথে তার বিরোধ শুরু হয়। কাযী নির্ভীকচিত্তে সম্রাজ্ঞীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে রায় দেন। ফলে সম্রাজ্ঞী রুষ্ট হয়ে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করেন। সম্রাজ্ঞীর ভয়ে হযরত কাযী মুওয়াক্‌কিল (র.) দিল্লী ত্যাগ করে চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং দুনিয়ার লালসা ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে একজন সূফীর জীবন যাপন করতে থাকেন।[৬৯৬]

হযরত শাহ মুকাররাম (র.)

হযরত শাহ মুকাররাম (র.) পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের সেনাপতি ছিলেন। একবার পারস্য রাজের আদেশে তিনি রাজশাহীতে হযরত শাহ মাখদুম রুপোশ (র.)-এর মাজার জিয়ারতে বাংলাদেশে এসে আর ফিরে যাননি।[৬৯৭]

হযরত শাহ মুকাররাম (র.) একজন কামিল ওলী ছিলেন। তিনি রাজশাহীর কুমারপুর অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও দীনের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারকাল ছিল সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তিনি আনুমানিক ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল

---

৬৯৩. মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৬৯৪. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৬৯৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৯৬. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৬৯৭. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, *উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে বাঘা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

করেন। রাজশাহী শহর হতে পশ্চিম দিকে প্রায় বার মাইল দূরত্বে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাস্তার পাশে কুমারপুরে হযরত শাহ মুকাররম (র.) এর মাজার অবস্থিত।[৬৯৮]

একবার পারস্যের প্রধানমন্ত্রী মোজাফর শাহ বাংলাদেশে ভ্রমনে এসে হযরত শাহ মোকাররম (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। তখন তাঁর মাজার বাঁধান ছিল না এবং অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তিনি মাজার পাকা করে দেন এবং কবরের উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন।[৬৯৯]

হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র.)

গৌড়ের শহরতলী এবং বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার (বর্তমান উপজেলা) ফিরোজপুর মৌজার ছোট সোনা মসজিদের অর্ধমাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহ নিয়ামাতুল্লাহর সমাধি সৌধ অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি সৌধটি অতি মনোরম।[৭০০]

"খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র.) দিল্লী প্রদেশের কানাউল নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা ও দেশ ভ্রমন করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এভাবে দেশ ভ্রমন করতে করতে একদিন দিল্লী থেকে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর প্রাচীন গৌড়ের ফিরোজপুর মহল্লায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। তখন বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র শাহাজাদা সুজা (১৬৩৯–১৬৬০ খ্রি.) ছিলেন বাংলার গভর্ণর।[৭০১] শাহ সুজা তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করেন এবং ইকতা হিসেবে লাখারাজ ভূমি প্রদান করেন। শাহ সুজা প্রশাসনিক ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৭০২] এই মহান সাধক হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র.)-এর ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে মৃত্যু হয়। তাঁর মাজার গাত্র সংলগ্ন শিলালিপিতে নিম্নোক্ত বাক্যটি লিখিত রয়েছে–

---

৬৯৮. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

৬৯৯. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

৭০০. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৭০১. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৭০২. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

"নিয়ামতুল্লাহ বাহারুল উলুম মুদাম।" অর্থাৎ নিয়ামতুল্লাহ জ্ঞান ও বিদ্যার একটি চিরন্তর সমুদ্র। এ থেকে একথা জানা যায় যে, তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[৭০৩] তাঁর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশ বিদেশ থেকে বহু গুনগ্রাহী ও পর্যটকদের ভীড় জমে থাকে। তাঁর মাজারের পাশে সুবৃহৎ মসজিদ বিদ্যমান। এ মসজিদটি মোগল যুগের কারুকার্য দ্বারা শোভিত।[৭০৪]

হযরত শাহ আবদুর রহীম শহীদ (র.)

হযরত শাহ আবদুর রহীম শহীদ (র.) ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় তিনি মিয়া সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরই নামানুসারে এই স্থানটির নাম মিয়া সাহেবের ময়দান হয়।[৭০৫] বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর সতের শতকের শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। কেবলমাত্র শাহ নজমুদ্দীন নামক এক ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন তাঁর সঙ্গী।[৭০৬] হযরত শাহ আবদুর রহীম শহীদ (র.) মুজাদ্দেদীয়া তরীকার সাধক ও সূফী হিদায়তুল্লাহ ওরফে সূফী হাসানের খলীফা ছিলেন। তিনি যাহিরী ও বাতিনী উভয় প্রকার ইলমে কামেলিয়াত হাসিল করেন।[৭০৭] তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর আল্লাহর আরাধরায় মগ্ন ছিলেন। তিনি হজ্জব্রত সুসম্মত করার জন্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ যান এবং সেখানে ঐশী প্রত্যাদেশ পেয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি শুধু যে একজন দরবেশ ছিলেন তা নয় তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন।[৭০৮] ঢাকার লক্ষ্মীবাজার মহল্লায় তাঁর খানকাহ অবস্থিত ছিল। ১১৫৮ হিজরীর ৭ শাবান (১৭৪৫ খ্রি.) একজন পাগল তাঁর দেহে সাতটি তরবারির আঘাত করে। ফলে একমাস তিন দিন পর রমজানের ৯ তারিখে

---

৭০৩. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৭০৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৭০৫. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

৭০৬. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৭০৭. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

৭০৮. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

তিনি ইন্তেকাল করেন। লক্ষ্মীবাজার মহল্লায় মিয়া সাহেবের ময়দানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। বর্তমানে এখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত।[৭০৯]

হযরত শাহ আফজাল মাহমুদ (র.)

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে পাবনা জেলায় ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করেছিল। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইসলাম প্রচারক এ জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করে গেছেন। হযরত শাহ আফজাল মাহমুদ (র.) সেসব ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। সম্ভবত সুলতানী শাসনামলে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[৭১০] কিংবদন্তী অনুসারে স্থানীয় হিন্দু জমিদার রাঘব রায়ের পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহনের পর জমিদার পুত্র শয়খ রুকনুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জের উত্তরে অবস্থিত গুণেরগতি গ্রামের রুকনী সাহেবেরা তারই বংশধর বলে কথিত।[৭১১]

হযরত শাহ আফজাল মাহমুদ (র.)-এর অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে তাঁকে একজন পীর বা অলি-আল্লাহ রূপে শ্রদ্ধাভক্তি করত। এই পীরের রাজ্যে মশা-মাছি নেই এরূপ কথা সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাজর্ষির মতো; সংসার-নির্লিপ্ত মহাপুরুষ ও প্রজারঞ্জক প্রশাসকে ছিল তাঁর চারিত্রীক বৈশিষ্ট্য। তাঁর সুশাসনে প্রজাকুল খুব সুখে ছিল। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ, তাদের সুখ-সুবিধার বিধান করা। পীর আফজাল মাহমুদ (র.) এর নামানুসারে আফজালপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে আফজালপুর গ্রাম আংশিকভাবে যমুনা নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে।[৭১২]

হযরত শাহ আফজাল মাহমুদ (র.) ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বেলকুচি এলাকায় ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু যমুনা নদীর গর্ভে তাঁর মাজার ভগ্ন হওয়ার

---

৭০৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৭১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৭১১. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

৭১২. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

উপক্রম হলে তাঁর দেহাবশেষ উঠিয়ে নিয়ে আসা হয় সিরাজগঞ্জে। সিরাজগঞ্জ শহরে দরগাহ পট্টিতে তার মাজার স্থাপন করা হয়। বেলকুচির সমাধীকে সাধারণতঃ “পীর সাহেবের দরগাহ” নামে আখ্যায়িত করা হতো। জনসাধারণ তাঁর অলৌকিক কার্যাবলীতে মুগ্ধ হয়ে বহু সম্পত্তি তাকে দান করেন। এগুলি পীরোত্তর সম্পত্তি। বড় বাজু পরগণায় যে যে স্থানে তাঁর সম্পত্তি ছিল সেইসব স্থানে একটি করে কৃত্রিম দরগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭১৩]

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য সূফী দরবেশের আগমন হয়েছে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের ফলে বাংলাদেশে ইসলাম শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এদেশে অসংখ্য পীর দরবেশ ও সূফী সাধক আগমন করে নব-সমাজ সংগঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এদেশের হিন্দু বৌদ্ধ জনসমাজ মননে ও চিন্তায় মুসলিম সূফী-সাধক ও পীর দরবেশদের নিকট থেকে এমন অনাড়ম্বর, সহজ, সরল জীবনাচরণের আদর্শ লাভ করল যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিম পীর ফকীরসহ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথাবেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায়, বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসঙ্কোচে ইসলামকে বরণ করে।[৭১৪]

সূফী দরবেশগণের জীবন বৃত্তান্ত ও কার্যকলাপের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সর্বশ্রেণীর জনসমাজেই সূফী দরবেশগণের প্রভাব ছিল অসীম। কুটিরবাসী ভিক্ষুকের আঙ্গিনা থেকে আরম্ভ করে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বাদশাহের প্রাসাদ পর্যন্ত তাদের প্রভাব সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সারা পাক-বাংলায় এমন শহর-বন্দর বা গ্রাম নেই যেখানে সূফী দরবেশগণ আসেননি এবং বসতি স্থাপন করেননি। অসংখ্য সূফী দরবেশ এদেশে এসে আস্তানা বা খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচার করেছেন। শাগরিদগণকে তরীকতের

---

৭১৩. রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস* (পাবনা : নব বিকাশ প্রেস, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৭; গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৭১৪. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

শিক্ষা দান করেছেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করে সমাধিস্থ হয়েছেন। শত শত লোক আজও তাঁদের মাজার জিয়ারত করে। তাঁরা জীবনকালেই শুধু সমাজে প্রভাব বিস্তার করেননি। মৃত্যুর পরেও জনসমাজে তাঁদের গভীর প্রভাব বিদ্যমান।[৭১৫]

They influenced deeply the minds the people in their life time. Sufism, thus became a powerful factor in the society.[৭১৬]

এই সকল সূফী দরবেশ বহুকাল আগেই ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের মনে জাগরূক রয়েছে। তাঁদের জীবনাদর্শ ও অলৌকিক কর্মতৎপরতার কথা কিংবদন্তীরূপে দেশে বিদেশে এখনও প্রচলিত।[৭১৭]

এক কথায় বলা যায়, পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর, ফকীর ও সূফীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দরবেশগণই বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এই সকল পীর দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন।

---

৭১৫. অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, *পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১।

৭১৬. Amiya K. Banerjee, West Bengal District Gezetteers (Heweah), *Calcutta*, 1972, P. 128.

৭১৭. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

অধ্যায় : ছয়
বিশিষ্ট সূফী সাধকগণের জীবনচরিত
(Biography of Eminent Sufies)

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.)

জন্ম

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) এর জন্ম সন বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। ফকির আবদুর রশিদ লিখেছেন, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) ৫৩৬ হিজরি অর্থাৎ ১১৪১ খিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন।[৭১৮] মাওলানা নুরুর রহমান তাঁর জন্ম সন ৫৩৭ হিজরি অর্থাৎ ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন।[৭১৯] ড. গোলাম রসুল তাঁর "Chisti-Nizami sufi Order of Bengal" গ্রন্থ লিখেছেন যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) ১১৪২-৪৩ খ্রি. জন্মগ্রহন করেছেন। অবশ্য এদুটি বছরের কাছাকাছি সন হলো ৫৩৭ হি.। কারণ ৫৩৭ হি. সনের ১লা মহরম ছিল ২৭ জুলাই।[৭২০] মো: মোজাম্মেল হক, সফিনাতুল আউলিয়া ও আইনে আকবরি গ্রন্ধদ্বয়ের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) ৫৩৭ হি./১১৪২ খ্রি. জন্মগ্রহন করেন।[৭২১] ইসলামি বিশ্বেকোষে তাঁর জন্ম সন ৫৩৭ হি. /১১৪২ উল্লেখ করা হয়েছে।[৭২২] An Encyclopedia–তে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর জন্ম সন ৫৩৭ হি. উল্লেখ করা হয়েছে যার তৎস্থানী হলো ১১৪২ খ্রি.।[৭২৩] খাজা বাবার বংশধর হাজী ফারুক হোসেন বলেন, খাজা বাবা ৫৩৭ হি. সনের ১৪ রজব জন্মগ্রহন করেন এবং আজো আজমীর

---

৭১৮. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন* (ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ১৮৬।

৭১৯. মাওলানা নুরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৭), পৃ. ২০৫।

৭২০. Dr. Gholam Rasool, *Chisti-Nizmi Sufi Order of Bengal* (Delhi: Idarah-I-Adabiyat, 1990), P. 75.

৭২১. Muhammad Muzammel Haq, *Some Aspects of the principal Sufi Orders in India* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985, P. 31.

৭২২. *ইসলামিক বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, পৃ. ৩৮৩।

৭২৩. *An Encyclopedia of Persian Literature Iran*. Vol. 4, P. 2401.

শরিফে ১৪ রজব খাজা বাবার জন্ম তারিখ পালন করা হয়।[৭২৪] খাজা বাবা ১৪ বছর বয়সে পিতৃহারা এ বিষয়ে কোন লেখকের দ্বিমত নেই। তাঁর পিতা হযরত গিয়াসুদ্দিন চিশতির মৃত্যু সন ৫৫১ হি. বলে অনেক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন কোন গ্রন্থে ৫৫০ হি. সনও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে খাজা বাবার জন্ম সন ৫৩৭/৫৩৬ হি. প্রমাণিত হয়। যেহেতু অধিকাংশ লেখক ৫৩৭ হি. সন উল্লেখ করেছেন সেহেতু খাজা বাবা ৫৩৭ হি. সনের ১৪ রজব সোমবার মোতাবেক ১১৪৩ খ্রি. ৩ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহন করেছেন।[৭২৫]

জন্মস্থান

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর জন্মস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) সিজিস্তানে জন্মগ্রহন করেন এবং সে জন্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, কবিতা ও গাঁথা থেকে জানা যায় যে, তাঁর নামের শেষে সযজী শব্দ ছিল।[৭২৬] সেকালের সিজিস্তানের অধিকাংশ এলাকা বর্তমান ইরানের খোরাশান প্রদেশের এবং বাকী অংশ আফগানিস্তানের অন্তর্গত। খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী উল্লেখ করেন যে, গরীব-ই-নেওয়াজ সঞ্জরের অন্তর্গত সিস্তান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহন করেছেন।[৭২৭] এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী বলেন যে, হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দির প্রথমার্ধের পারস্য সাম্রাজ্যের মানচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসফাহান, মোসুল ও সাজিস্তান এ তিনটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। ইসফাহানের উপকণ্ঠে সন্জর নামক একটা গ্রাম ছিল। আবার মোসুলের উপকণ্ঠেও সন্জর নামক একটা গ্রাম ছিল। সন্জরে জন্মগ্রহন করেছিলেন বলে গরীব-ই-নেওয়াজের নামের শেষে সন্জরী শব্দ যুক্ত করা হয়েছিল। তবে দু সন্জরের মধ্যে ইসফাহানের উপকণ্ঠের সন্জরে তাঁর জন্মগ্রহন করা বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ মোসুল সে সময় তত সমৃদ্ধ ছিল না। ইসফাহান ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। গরীব-ই-নেওয়াজের পিতা যেহেতু ব্যবসা

---

৭২৪. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, (ঢাকা : সদর প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৫১০।

৭২৫. প্রাগুক্তা, পৃ. ৫১০।

৭২৬. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক* (ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৫।

৭২৭. খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, *দলিলুন আরেফীন* (অনুবাদ) (ঢাকা : বরহাগে চিশতিয়া, ১৯৮১), পৃ. ৮।

করতেন সেহেতু তার ইসফাহানে বসবাস অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। তদুপরি গরীব-ই-নেওয়াজ বড় হয়ে ইসফাহানের মন্জরে কয়েকবার গিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।[৭২৮] ফকির আবদুর রশিদ তার সুফি দর্শন বইয়ে লিখেছেন যে, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) ইরানের সান্জার নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেন।[৭২৯] ড. গোলাম রসুল বলেন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) পারস্যের পূর্বাঞ্চলীয় সান্জারে জন্মগ্রহন করেন।[৭৩০] মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা সিস্তানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি আরো বলেন যে, তৎকালীন তাতার বাহিনীর আক্রমন পর্যদস্ত ও লণ্ডভণ্ড সিস্তান ছেড়ে তাঁর পিতা খোরাশানে অভিবাসন করেছিলেন।[৭৩১] শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম মাওলা চিশতি তার গ্রন্থে প্রাচীণকালের অন্তত ১০ খানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রাচীনকাল থেকেই খাজা বাবার নামের শেষে সন্জরী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে সন্জরে তাঁর জন্ম সম্পর্কে যদি কেউ দ্বিমত পোষণ করে তবে তিনি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির মানসেই তা করবেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, আফগানিস্তানের কান্দাহার থেকে পদব্রজে ২৪ ঘন্টার পথ উত্তরে গেলে সন্জর নামক স্থানটি পাওয়া যায় যা পূর্বকালে সিস্তানের অন্তর্গত ছিল।[৭৩২] ইসলামি বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।[৭৩৩] An Encyclopedia of Persian Literature এ বলা হয়েছে যে, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) সিস্তানে জন্মগ্রহন করেন। এতে কয়েকবার তাঁর নামের পরে সায্জী শব্দ ব্যবহার করলেও একথা বলা হয়েছে তিনি

---

৭২৮. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি* (ঢাকা : দি তাজ পাবলিসিং হাউজ, ১৯৭৯), পৃ. ১৫-১৭।

৭২৯. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ২৮৬।

৭৩০. Dr. Gholam Rasool, *Chisti-Nizmi Sufi Order of Bengal* (Delhi : Idarah-i-Adabiyat, 1990), P. 75.

৭৩১. Muhammad Muzammel Haq, *Some Aspects the principal Sufi Orders in India* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985, P. 31.

৭৩২. শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম মাওলা চিশতি, *গরীব নেওয়াজের জীবনী* (শরীয়তপুর : খানকায়ে চিশতিয়া, ১৩৯২ বাংলা), পৃ. ৭-৮।

৭৩৩. *ইসলামিক বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৮৩।

সান্‌জারী নামেই বেশী পরিচিত। হয়তো কেউ ভুল করে সানজারীর স্থলে সায্‌জী শব্দ জুড়ে দিয়েছেন।[৭৩৪]

উপর্যুক্ত আলোচন্‌ থেকে এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) সানজারে জন্মগ্রহন করেছেন এবং সে কারণে তাকে সানজারী বলা হতো। তবে সানজার এলাকা কোথায় অবস্থিত এনিয়ে মতভেদ রয়েছে।

বংশ পরিচয়

সারা জগতের আউলিয়াকুল শিরোমণি, মুর্শিদাকুলের মধ্যমনি, সুলতানুল আরেফীন, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর পিতার নাম সৈয়দ গিয়াসুদ্দিন হাসান (র.) ও মাতার নাম সৈয়দ উম্মোল ওয়ারা মাহেনুর (র.)। খাজা সাহেবের পিতৃ ও মাতৃ দুটি কুলই ছিল কুরাইশ গোত্রের শ্রেষ্ঠ শাখা। সাইয়্যেদ বংশদ্ভুত। অর্থাৎ তাঁর পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশধারাই শেরে খোদা হযরত আলী (র.) এর সাথে মিলিত হয়েছে।[৭৩৫] উভয় বংশধারা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হলো :

---

৭৩৪. *An Encyclopedia of Persian Literature*, Vol 4(Iran, 2001), P. 2401.

৭৩৫. আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)* (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ১৯৯৬), পৃ. ১৩।

আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব

মাতৃবংশ	পিতৃবংশ
ইমাম হাসান আল-মুজতাবা	সায়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন
হাসান ইবনে হাসান (হাসান মাসনা)	ইমাম জয়নুল আবেদিন
সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মাহজ	ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির
সৈয়দ মুসা আল-জোহান	ইমাম জাফর আস-সাদিক
সৈয়দ আব্দুল্লাহ সানি	ইমাম মুসা আল-কাজিম
সৈয়দ মুসা সানি	সৈয়দ ইব্রাহিম
সৈয়দ ইয়াহিয়া যাহেদ	সৈয়দ নাজমুদ্দিন তাহের
সৈয়দ দাউদ মক্কি	সৈয়দ কামালুদ্দিন হাসান
সৈয়দা উম্মোল ওয়ারা মাহেনুর	সৈয়দ গিয়াসুদ্দিন হাসান

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.)

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির পিতৃবংধারা খলিফাতুল্লাহ, ফলিফাতুর রাসুল, আমিরুল মোমেনিন আলী ইবনে আবি তালিব থেকে ইমামতের ধারায় হজরত মূসা আল-কাজেম পর্যন্ত এসেছে। এভাবে দেখা যায় যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি হাসানি ও হুসাইনি উভয় ধারার বংশভুত। কাজেই তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) আহলুল বাইতের মহান সদস্য।[৭৩৬]

নামকরণ

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর জন্মের তৃতীয় দিনে মতান্তরে সপ্তম দিতে তাঁর নাম রাখা হয় 'মুঈনুদ্দিন'। 'মুঈন' শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী বা সহায়ক। আর দ্বীন শব্দের অর্থ ধর্ম। অতএব মুঈনুদ্দিন শব্দের অর্থ হল ধর্মের সাহায্যকারী। কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে 'হাসান' বলে ডাকতেন। 'হাসান' শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র, উত্তর ও সুন্দর। তিনি যেহেতু চিশতীয়া তরীকার ইমাম সেহেতু তাঁর পবিত্র নামের সাথে চিশতী যুক্ত হয়েছে। তাঁর জন্মস্থানের নাম সানজার ও তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাঁর সম্মানজনক উপাধি হযরত ও খাজা নামের প্রথমে যুক্ত হয়েছে। তাঁর ধরাধামে অবস্থানের শেষ সময়টা যেহেতু কেটেছে আজমীরে সেহেতু তাঁর পবিত্র নামের সাথে আজমিরী যুক্ত হয়ে নাম হয়েছে, "হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান চিশতী সন্জরী ছুম্মা আজমেরী (র.)।[৭৩৭]

হযরত খাজা সাহেব সারাদেশের জনসাধারণের নিকট আরও একটি বিশেষ নামে পরিচিত হয়ে আছেন। আর তা হল, 'গরীব নেওয়াজ'। এই নামটিও এত বেশী খ্যাতিলাভ করেছে যে, তাঁর নামের কোন একটি শব্দ উল্লেখ না করে শুধু গরীব নেওয়াজ বলা হয়, তাহলে সকলেই বুঝতে পারে যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর কথা বলা হচ্ছে।[৭৩৮]

---

৭৩৬. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২।

৭৩৭. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী (মাজার শরীফের খাদেম), মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী* (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১২), পৃ. ৩৪-৩৫।

৭৩৮. আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

বাল্য জীবন

সুযোগ্য পিতা ও স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর বাল্যকাল অত্যন্ত সুখের ছিল। প্রিয় ছেলের দেখাশুনা ও মন-মানসিকতার বিকাশ সাধনের জন্য মাতা এবং পিতা উভয়ই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) বাল্যকালে বেশ শান্তশিষ্ট ছিলেন। কোন বালকের সাথে পথে-ঘাটে খেলা করে বেড়াতেন না। বাল্যকালে কোন মাদ্রাসায় গিয়ে ইলম শিক্ষা করার বিশেষ সুবিধা তিনি পাননি। কিন্তু যারা ওলী বংশে জন্মগ্রহন করেছেন, তাঁদের অসীম খোদা প্রেমের কথা বলে শেষ করা যায় না। যখন তাঁর বয়স সাত বছর তখন থেকেই তিনি পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করতেন, রোজা রাখতেন, জিকিরের মজলিশে যোগদান করতেন। যে কোন পূণ্য ও নেক অনুষ্ঠানে আহার নিদ্রা ভুলে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। একদিন তিনি পিতার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে এক অন্ধ ও অসহায় বালককে ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পড়ে নামাজ পড়তে যেতে দেখলেন। তিনি বালকটির অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি কিছু সময় কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর পিতার অনুমতি ও নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজের নতুন জামা খুলে অন্ধ বালকটাকে পরিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর পরম আনন্দে ঈদের নামাজ আদায় করে বাড়ী ফিরে আসলেন। হযরত খাজা গিয়াসুদ্দিন (র.) দূর থেকে নিজ পুত্রের সকল কার্যকলাপই দেখলেন এবং মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।[৭৩৯]

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর ভাগ্যে পিতৃ-মাতৃস্নেহ বেশী দিন লাভ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মালামাল কেনা-বেচা করতেন। একদিন তিনি শাম দেশে যান এবং সেখানেই ৫৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। শাম দেশেই তাঁর পবিত্র মাজার শরিফ রয়েছে। যারা বাইতুল মোদাদ্দাস যান তারা ঐ

৭৩৯. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

পবিত্র মাজার শরিফ জিয়ারত করে আসেন।[৭৪০] খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। পিতার মৃত্যু সংবাদে তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না। তখন থেকে তিনি মাতা বিবি নূর এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মাও পরলোকগমন করলেন। ফলে জীবন সংগ্রামের এই মহা রণক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ওয়ারিসী সূত্রে একটি বাগান ও একটি চাক্কী পেলেন। তিনি বাগানটির দেখাশুনা করতেন এবং এর আয় দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাগানের ও সংসারের সকল কাজকর্ম তিনি নিজের হাতেই করতেন।[৭৪১]

সংসার বিরাগ

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দিতে মুসলিম জাহানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মবিদারক ছিল। মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহ এবং এ সুযোগে নিষ্ঠুর তাতারদের আক্রমন, হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, ধ্বংসলীলা খাজা বাবা তাঁর কৈশোরে প্রত্যক্ষণ করে নিদারুন মর্মপীড়ায় ছটফট করছিলেন। তবু পিতৃওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ফলের বাগান ও আটা চাক্কি তত্ত্বাবধান করে দিনাতিপাত করছিলেন। কথিত আছে যে, একদিন তিনি তাঁর ফলের বাগান পরিচর্যা করছিলেন এমন সময় সেখানে একজন দরবেশ উপস্থিত হলে খাজা বাবা তাঁকে পরম যত্নে ক'টি ফল খেতে দিলেন। এ দরবেশ হলেন তৎকালীন মজ্জুব[৭৪২] আউলিয়া ইব্রাহীম কান্দুজী (র.)।[৭৪৩] তিনি কয়টি ফল খাওয়ার পর তাঁর থলে থেকে একটি ফল বের করে তা চিবিয়ে খাজা বাবাকে খেতে দিলেন। যখন তিনি ফকিরের ফল খেলেন, তখন তাঁর হৃদয় হতে সংসারের মায়া মমতা উধাও হয়ে গেল। এ ফল খাওয়ার পর তাঁর অন্তর নির্মল হয়ে একটা নুরের আলো হৃদয়ে প্রকাশ পেতে থাকলো।

---

৭৪০. মৌলভি আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)* (কলিকাতা : ওসমালিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮৭ বাংলা), পৃ. ৬।

৭৪১. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

৭৪২. মজ্জুব– আরবী শব্দ। যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর ভালবাসায় নিমজ্জিত তাকে মজ্জুব বলে।

৭৪৩. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জোহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্তা, পৃ. ৫১৩।

তখন আর খাজা বাবার বিষয় সম্পত্তি ও সখের বাগানের প্রতি মন রইল না। তিনি বিষয় সম্পত্তি আল্লাহর পথে দান করে ফকির বেশে ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বোখারী অভিমুখে গমন করেন।[৭৪৪]

শিক্ষা জীবন

শিয়া, তাতার ও চেংগিস খার হাতে নিশাপুরের সুবৃহৎ লাইব্রেরী ও গ্রন্থসমূহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহৎ কেন্দ্রটি ছিল বোখারায়।[৭৪৫] হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র) ৫৫৩ হিজরীতে সমরকন্দ হতে বোখারায় যান। সেখানে তিনি হযরত হিশামুদ্দিন বোখারী (র.) এর নিকট প্রায় ছয় সাত বছর পবিত্র কুরআন, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।[৭৪৬] শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং অল্প কিছুদিন গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর কাছে অবস্থান করেন। এ সময় গাউসুল আজম ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, "এ যুবক একদিন খোদা-প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের পথ প্রদর্শক হবেন এবং তিনি ইসলামের একজন বড় মোবাল্লিগ হবেন।" তার ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।[৭৪৭]

মুর্শিদের সন্ধানে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর নিনাপুরের হারুন নামক স্থানে হযরত উসমান হারুন (র.) এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত উসমান হারুন (র.) মারেফত বিদ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। খাজা বাবা তাঁর হাতে মুরিদ হন, এরপর খেলাফতি পদে নিযুক্ত হয়ে 'খেরকা' পরিধান করেন।[৭৪৮] কামিল মুর্শিদের খিদমতে থেকে কঠোর সাধনা করে তিনি কামালিয়াত বা সিদ্ধি লাভ করেন। খাজা উসমান হারুনী (র.) খাজা বাবার হাতে চিশতিয়া তরিকার দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে নিয়ে হজ্ব পালন করতে যান। হজ্বের

---

৭৪৪. মৌলভী আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৭৪৫. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৭৪৬. মৌলভী আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৭৪৭. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪।

৭৪৮. মৌলভী আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

পর তিনি মদিনা গমন করেন। খাজা বাবা যখন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কদম মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করলেন তখন রওজা মোবারক থেকে সে সালামের জবাবে খাজা বাবাকে 'কুতুবুল মাশায়েখ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সালামের এ জাবাব উপস্থিত সবাই শুনেছে বলে কথিত আছে। মদিনায় অবস্থান কালে হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বপ্নযোগে হিন্দুস্থানে গিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য খাজা বাবাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৪৯]

ভারতবর্ষে আগমন

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নির্দেশে খাজা বাবা আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি লাহোরে এসে পৌছলেন। লাহোরে হযরত মাখদুম আলী দাতা গঞ্জে বখ্শ (র.) এর আস্তানায় কিছু দিন আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে ছিলেন। লাহোর মুসলিম প্রধান ছিল কিন্তু আজমীর ছিল ঘোর পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল। খাজা বাবা আজমীরের পথে চল্লিশজন ভক্তসহ দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু দিল্লীতে আর বেশি দিন না থেকে তিনি আজমীরের দিকে রওনা হন। যাত্রার পূর্বে তিনি খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) কে দিল্লীর জন্য খলিফা নিযুক্ত করে আরো ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। আজমীর তখন হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের রাজত্ব। পৃথ্বীরাজ ও তার অনুচরগণ খাজা বাবাকে নানাভাবে উত্যক্ত এবং তাঁর ভক্তদের উপর নির্যাতন শুরু করে। এ কথা জানতে পেরে খাজা বাবা তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন রাজাকে বলে দাও মাত্র তিন দিনের সময় দেওয়া হল। এই তিন দিনের মধ্যে হয় এই ফকির, নয়তো স্বয়ং রাজাকে এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। খাজা বাবার এই কথার পর তিনদিন যেতে না যেতেই সুলতান মুহম্মদ ঘোরী আজমীর আক্রমন করেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হয়।[৭৫০] এভাবে দিল্লী ও আজমীরে মুসলিম সাম্রাজ্য কায়েম হয়। সুলতান শিহাবুদ্দিন

---

৭৪৯. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪।

৭৫০. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

ঘোরী স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে দিল্লীতে রেখে আজমীর গিয়ে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার হাতে বায়াত গ্রহন করেন।[৭৫১]

বিবাহ ও বংশধরগণের পরিচয়

ইসলামের মহান মোবাল্লিগ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) জীবনের সুদীর্ঘ সময় শিক্ষা–দিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে ব্রত থেকে ঘর সংসার করার প্রতি কোন মনোযোগ দেননি। ভারত বর্ষে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে গোমরাহির অন্ধকার দূর করে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে সুশীতল ছায়াহলে ভারতবাসীদের স্থান করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ বছরে প্রায় সমগ্র ভারতে ইসলামের বাণী পৌছে দিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন তাঁর খলিফাগণ প্রচার কার্য সার্থকভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অতি কষ্টে লালিত গাছে পর্যাপ্ত ফলের ফলন হয়েছে, তখন ৬১০ হি./১২১৩ খ্রি. প্রায় ৭৩ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন।[৭৫২] মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী লিখেছেন, খাজা বাবা ৬০ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন।[৭৫৩] আলহাজ্জ মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী লিখেছেন, খাজা বাবা ৯০ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন।[৭৫৪] হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) দু'টি বিয়ে করেছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু আগে ও পরে কাকে বিয়ে করেছিলেন এবং কোন বিবির সন্তান কারা ও কয়জন তা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে একজনের নাম আমাতুল্লাহ আর অপরজনের নাম ইসমাতুল্লাহ।[৭৫৫] তাঁদের মধ্যে বিবি ইসমাতুল্লাহ ছিলেন হযরত খাজা বাবার বিশিষ্ট মুরিদ ও আজমীরের গভর্ণর সৈয়দ আজিজুদ্দিনের অতি ধর্মপরায়ণা কন্যা। অপরজন বিবি আমাতুল্লাহ ছিলেন কোনও রাজপুত সামন্ত রাজার

---

৭৫১. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

৭৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯।

৭৫৩. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

৭৫৪. আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)* (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি:, ১৯৯৬), পৃ. ৮০।

৭৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

বন্দিনী কন্যা। যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর তিনজন পুত্র ও একজন কন্যা ছিল।[৭৫৬]

খাজা বাবার জ্যৈষ্ঠ পুত্র খাজা ফখরুদ্দিন (র.) পিতার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করে তাঁর খলিফা হিসাবে আজমীর থেকে ৪৫ কি. মি. দূরবর্তী সরওয়ার নামক স্থানে খানকা তৈরী করে সেখানে ইসলাম ও তাসাউফের প্রচার করেন। তিনি ৬৬১ হি./১২৬৩ খ্রি. ৬ সাবান সরওয়ারে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার এখনও বহু ভক্তের জিয়ারত স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ।[৭৫৭]

খাজা বাবার দ্বিতীয় পুত্র হযরত খাজা হিশামুদ্দিন আবু ছালেহ (র.) খুব কঠিন রিয়াজতকরী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কঠোর সাধনা, তপস্যা ও রিয়াজত বন্দেগী দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। কতিপয় লেখকের মতে, তিনি ৪৫ বছর বয়সে কয়েকজন আবদালের সাথে আজমীর ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেননি। অবশ্য খাজা বাবার মূল দরবারের দক্ষিণাংশে ঝালড়ায় ছায়াঘাটের একটি মাজারকে হযরত হিশামুদ্দিন (র.) এর মাজার হিসেবে সনাক্ত করা হয়। অনেক লেখক তাঁর ৭ জন সন্তানের কথা লিখলেও বাস্তবে তাদের স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৭৫৮]

খাজা বাবার কনিষ্ঠ পুত্র হযরত খাজা জিয়াউদ্দিন আবু সাঈদ (র.) শিক্ষা–দীক্ষা ও জ্ঞানগরীময় বিশেষ ব্যুৎপত্তি হাসিল করেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও মুজাহিদায় তিনি অগ্রগামী

---

৭৫৬. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯-৫২০।

৭৫৭. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৫২০।

৭৫৮. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

ছিলেন।[৭৫৯] কথিত আছে যে, খাজা জিয়াউদ্দিন (র.) এর দুই পুত্র ছিল। তাঁদের বংশধরদের দু চার জন এখনো আজমীরে দরগার খেদমতে নিয়োজিত আছেন।[৭৬০]

খাজা বাবার একমাত্র কন্যা বিবি হাফেজা জামাল (র.) আধ্যাত্মিক সাধনায় এত উন্নত ছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় রাবেয়া উপাধি লাভ করেছিলেন।[৭৬১] খাজা বাবা তাঁকে তরীকার খিলাফত দান করে নারী সমাজের মধ্যে তরীকা প্রচারের দায়িত্ব সোপর্দ করেন। হযরত খাজা বাবা তাঁর এ স্নেহধন্য মেয়েকে হযরত হামিদুদ্দিন নাগোরী (র.) এর পুত্র হযরত শায়খ রাজিউদ্দিন (র.) এর সাথে বিয়ে দেন। তাঁর দু'সন্তান ছিল যারা শিশুকালেই ইন্তেকাল করেন। এই মহিয়সী তাপসীর মাজার তাঁর পিতার মাজারের সাথেই দক্ষিণের দেয়াল ঘেসে বিদ্যমান।[৭৬২]

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর রচনাবলী

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) শুধুমাত্র একজন খোদায়ী জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত একজন স্বনামধন্য খ্যাতিমান মহাবুজুর্গ অলিয়ে কামেল, সত্য পথে সুপ্রতিষ্ঠিতক মহান ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, জাহেরী জ্ঞান তথা শরীয়তী জ্ঞানেও তিনি ছিলেন এক অনন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। এছাড়াও তিনি একজন খ্যাতিমান লেখক ও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংখ্যা কতটি তা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর অসংখ্য রচনাবলী ছিল বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনাবলীর হস্তলিপি আজো বিদ্যমান আছে। খাজা বাবার রচনার যেসব পাণ্ডুলিপি আজো রয়েছে সেগুলো ক্যাটালগ নম্বরসহ উল্লেখ করা হলো :

---

৭৫৯. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৭৬০. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

৭৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

৭৬২. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

(১) দিওয়ান : খাজা বাবার রচিত দিওয়ান তাসাউফের পথে একটা আলোকবর্তিকা। এতে ফারসি ভাষায় ১১৮টি গজল, ২টি কাসিদা ও ৫টি রুব'ঈ রয়েছে। ভারতের হায়দারাবাদের আসেফিয়া লাইব্রেরীতে এক কপি হস্তলিপি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। আলীগড় লাইব্রেরীতেও এককপি হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ভারতের উদয়পুরের নবাব মর্দান আলী খানের সরকার মাওয়ার লাইব্রেরীতে আরো এককপি হস্তলিপি রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, খাজা বাবার দেওয়ান ভক্তগণের কেউ নকল করে হাতে লিখে নিয়েছে।

(২) আনিসুল আরওয়াহ : এটি খাজা উসমান হারুনির বক্তব্য ও বাণী। খাজা বাবা তাঁর মুর্শিদ খাজা উসমান হারুনীর ২৮টি মজলিসের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে ২৮টি অধ্যায়ে ফারসি ভাষায় এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থের আদি দুটি কপি লাহোরের গনজ্ বখ্শ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে যার ক্যাটোলগ নম্বর ৪২৩০ ও ৪৩১৪।

(৩) আস্‌রারে হকিকি : এটি ফারসি ভাষায় লিখিত একটা প্রবন্ধ যা তাঁর খলিফা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (র.) এর জন্য লিখেছিলেন। এর একটি কপি লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

(৪) গজনে আসরার : ফারসি ভাষায় এ গ্রন্থখানায় তিনি মারেফাতের সুগভীর তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। কুরআন, হাদিস ও বুজুর্গানে দ্বিনের ভাবধারা অনুযায়ী জাহেরি ও বাতেনি পবিত্রতা, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ইবাদত এবং তাসাউফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এতে স্থান পেয়েছে। এর দুইট আদি কপি লাহোরের গান্‌জে বখ্শ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে যার ক্যাটেলগ নম্বর ৩৬৫০ ও ৪২৩১।

(৫) রেসালায়ে মুঈনুদ্দিন : এ গ্রন্থে যিকির, রিয়াজত ও চিল্লায় অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের হাতের লেখা একটা কপি

লাহোর গান্জে বখ্শ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। যার ক্যাটেলগ নম্বর ৬৩১৪।

(৬) আদাবে দাম্যাদান : এ গ্রন্থের হস্তলিখিত একটা কপি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ৮৪পি–৮৮পি ক্যাটেলগ নম্বরে সংরক্ষিত আছে।

(৭) কালেমাতে মুঈনুদ্দিন : এ গ্রন্থে ওয়াহদাতুল ওজুদ, নফি ও ইসবাত এবং মাকামে নাসুত, লাহুত ও মালাকুত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের একটা কপি লাহোরের গন্জে বখ্শ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। যার ক্যাটেলগ নম্বর ২৭২৮।

(৮) রেসালায়ে তাসাওফে মান্যুম : এ গ্রন্থে তাসাওফ শিক্ষার উজ্জল বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের একটা কপি হায়দ্রাবাদের আসিফিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৭৬৩]

(৯) রেছালায়ে আফাক ওয়া আনফুছ : এ গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় লিখিত। এ কিতাবে মহাকাশ, রুহ্ ও জাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

(১০) হাদীসুল মা'আরিফ : এটা খাজা বাবার রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানা আকার ও কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে।[৭৬৪]

ইন্তেকাল

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর ইন্তেকালের সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক গড়মিল রয়েছে। মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী লিখেছেন, খাজা বাবার মৃত্যু সন ৬২৭ হিজরী।[৭৬৫] মাওলানা নূরুর রহমান লিখেছেন, খাজা গরীব নওয়াজ

---

৭৬৩. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.), জেহাদুল ইসলাম প্রমুখ অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১-৫২২।

৭৬৪. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৭৬৫. আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) (ঢাকা : দি তাজ পাবলিসিং হাউজ, ১৯৭৯), পৃ. ৯৩।

(র.) ৬৩৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৭৬৬] আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু লিখেছেন, এই মহান সাধক ৬৩৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৭৬৭] মৌলভী আজাহার আলী লিখেছেন, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) ৬৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৭৬৮] কিন্তু অধিক সংখ্যক ঐতিহাসিক ও নির্ভরযোগ্য লেখকের অভিমত অনুযায়ী খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) ৬৩২ হিজরী ৬ রজব ইন্তেকাল করেন।[৭৬৯]

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) এর কবর খনন করা হয় তাঁরাই পবিত্র হুজরার মধ্যে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। প্রতি বছর ১লা রজব থেকে ৬ই রজব পর্যন্ত অত্যন্ত ধুমধাম, জাকজমক ও শান শওকতের সাথে তাঁর মাজারে ওরস উদযাপিত হয়। ওরসে কোটি লোকের সমাবেশ ঘটে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটে এই মাজার শরিফে।[৭৭০]

পবিত্র ভূমি আজমীর শরীফে খাজা বাবার নির্দেশিত স্থানে তাঁর মাজার নির্মিত হয়েছিল। এর পত্তন করেছিলেন মহাত্মা হোসেন নাস্তির। এরপর সম্রাট জালালদ্দিন আকবর এই মাজারের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি কবরটিকে ঘিরে শ্বেত পাথরের এক বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি মাজার শরীফের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭০ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করেন। আজ পর্যন্ত সেই জায়গীরের আয় থেকেই মাজার শরীফের খরচ পত্র চালান হয়।[৭৭১]

---

৭৬৬. নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৭৬৭. আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী* (ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১৫৮।

৭৬৮. মৌলভী আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৭৬৯. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমিরী, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত, *গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

৭৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৭৭১. মৌলভী আজাহার আলী, *খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩।

হযরত ইমাম গাযালী (র.)

জন্ম ও বংশ

ইমাম গাযালী (র.) খোরাসান প্রদেশের তূস জেলার অন্তর্গত তাহেরান শহরে ৪৫০ হিজরী মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৭২] ইমাম গাযালী (র.) এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। 'হুজ্জাতুল ইসলাম' তার উপাধী। তবে গাযালী নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৭৭৩] তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম ও মুহাম্মদ এবং প্রপিতামহের নাম আহমদ। গাযাল শব্দটির অর্থ 'সূতা বিক্রেতা' বা যে সূতার ব্যবসা করে। ইমাম গাযালী (র.) এর পিতা সূতার ব্যবসা করতেন। এ কারণে তাঁদের পারিবারিক পরিচয় হয়ে গিয়েছিল গাযালী।[৭৭৪]

শিক্ষা জীবন

ইমাম গাযালী (র.) এর পিতা কোন বিশেষ কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ইন্তেকালের সময় ইমাম সাহেব ও তাঁর ছোট ভাই ইমাম আহমদ গাযালীকে এক ঘনিষ্ট আলেম ও সূফী বন্ধুর হাতে সোপর্দ করে বলেছিলেন, 'আপনি আমার ছেলে দুইটির ভার গ্রহণ করুন। আপনার তত্ত্বাবধানে আমার ছেলে দুইটি যেন ভবিষ্যতে লেখা-পড়া শিখতে পারে, তাহলেই আমার এই মূর্খতার কিঞ্চিত ক্ষতিপূরণ হতে পারে।[৭৭৫]

পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা দু'ভাই উক্ত সূফী সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষার মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর একদা পিতৃবন্ধু তাদেরকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তোমাদের পিতা আমার নিকট যে অর্থ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। আমার আর্থিক অবস্থা ও তেমন সচ্ছল নয় যে, তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার আমি বহন করতে পারি। সুতরাং আমার মতে

---

৭৭২. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃকামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : তাজ কোং লিঃ ২০০৫), পৃ. ৩।

৭৭৩. আল্লামা শিবলী নোমানী, অনু. কাউছার বিন খালেদ, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন* (ঢাকা : কোহিনূর লাইব্রেরী, ২০০৩), পৃ. ১০।

৭৭৪. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃকামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৭৭৫. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৭), পৃ. ৯৮।

তোমরা দু'ভাই এখন থেকে এমন কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু কর, যেখানকার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই গরীব শিক্ষার্থীদের খরচপত্র চালিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব পিতৃবন্ধুর পরামর্শানুযায়ী নিজেই এরূপ কোন মাদ্রাসার খোঁজে বের হয়ে পড়লেন।[৭৭৬] তিনি এরূপ একটি মাদ্রাসার সন্ধান পান এবং সেখানে ভর্তি হয়ে শিক্ষা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম গাযালী (র.) আহমদ বিন মোহাম্মদ রাযকানী (র.) এর নিকট ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন। একই শহরে তাঁরা উভয়ই বসবাস করতেন। তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে পাঠ সমাপ্ত করার পর তিনি 'জুরজান' নামক প্রসিদ্ধ শহরে গমনের ইচ্ছা করেন এবং তথায় উপস্থিত হয়ে ইমাম আবু নসর ইসমাইল (র.) এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। সেকালে নিয়ম ছিল, শিক্ষকগণ ছাত্রদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করতেন এবং সমবেত ছাত্রগণ তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। শিক্ষকদের এরূপ আলোচনায় লিখিত সংরক্ষণকে বলা হত 'তা'লীকাত'। শিক্ষানবিশ ইমাম গাযালী (র) তাঁর ছাত্র জীবনে তালিকাতের একটি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন।[৭৭৭]

জুরজান শহরে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মনস্থ হলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে তিনি ডাকাতের হাতে সর্বস্বান্ত হন। সমস্ত মাল-সামানের সঙ্গে তাঁর সেই তা'লীকাতগুলিও ছিল। তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন। কেননা, এই তা'লীকাতগুলিই ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের শিক্ষার নির্যাস। তিনি ডাকাত দলেন সর্দারের নিকট গিয়ে বললেন, আমার সমস্ত মাল-সামানের বিনিময়ে আমাকে তা'লিকাতগুলি ফিরিয়ে দাও। কেননা, একমাত্র এগুলির জন্যই বহুদিন ধরে আমি এই বিদেশে এসে বহু কষ্ট স্বীকার করেছি। তাঁর কথা শুনে ডাকাত সরদার হো হো করে হেসে উঠল এবং বলল, তাহলে তুমি শিখেছ ছাই। কেবল এক বাণ্ডিল কাগজের মধ্যেই যদি তোমার ইলম সীমাবদ্ধ থাকে, তবে দেখা যায়,

---

৭৭৬. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৭৭৭. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

এখনও তুমি মূর্খই রয়ে গেছ। তোমার কিছুই শেখা হয়নি। এই বলে সে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিল। তিনি কাগজগুলি হাতে নিয়ে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বাড়ী ফিরে তিনি তা'লীকাতগুলি মুখস্ত করতে আরম্ভ করলেন। পূর্ণ তিন বছর অক্লান্ত ও অবিরত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ তা'লিকাতগুলি মুখস্ত করে ফেললেন। সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান পিপাসা যেন বহুগুন বুদ্ধি পেল। সুতরাং আরো অধিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি আবার গৃহত্যাগ করে বের হয়ে পড়লেন।[৭৭৮]

ইমাম গাযালী (র.) নিশাপুরে গিয়ে উপনিত হন। নিশাপুর ছিল ইমাম সাহেবের বাসস্থানের নিকটবর্তী শহর। নিশাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালে খোরাসান প্রদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন। সেখানকার অধ্যক্ষ ইমাম হারমায়েন (র.) ছিলেন প্রাচ্য ভূখণ্ডের একজন খ্যাতনামা আ'লিম। এখানে ও মেধাবী ইমাম গাযালী (র.) এর পক্ষে সম্ভ্রান্ত লোকের সহায়তা লাভ কঠিন হল না। তিনি এক ধনীর বাড়ীতে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতে পেরে একান্ত মনে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করলেন। নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য ইমাম গাযালী (র.) এর মনে শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত। অসাধারণ পরিশ্রম ও অপূর্ব মেধার বলে ইমাম সাহেব ইমাম হারমায়েন (র.) এর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।[৭৭৯] শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর খ্যাতিমান উস্তাদের সহযোগী (নায়েব) তে পরিণত হন। ইমাম হারমায়েন (র.) এর ইন্তেকালের পর তিনি নিশাপুর থেকে বহির্গত হন। সে সময় ইমাম গাযালী (র.) এর ইন্তেকালের পর তিনি নিশাপুর থেকে বহির্গত হন। সে সময় ইমাম গাযালী (র.) এর বয়স ছিল ২৮ বছর। অথচ তখনো তাঁকে বড় বড় বর্ষীয়ান উলামাগণের চেয়ে অধিকতর বিশিষ্ট ও কামালিয়তের অধিকারী মনে করা হত।[৭৮০]

---

৭৭৮. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৮৯।

৭৭৯. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭), পৃ. ৩৪৪।

৭৮০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ১৩৮।

কর্ম জীবন

হযরত ইমাম গাযালী (র.) এর জ্ঞান ও গুন-গরিমার কথা পূর্ব থেকেই দূর-দূরান্তে পৌছে গিয়েছিল। নিজামুল মুলক ও এ খবর ভালভাবে রাখতেন। তাই তিনি যখন নিজামুল মুলকের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তাঁকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁকে সাদরে গ্রহন করে সম্মানিত আসনে বসতে দিলেন। সে যুগে কারো জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচক্ষনতা ও যোগ্যতা পরিমাপ করার মাপকাঠি ছিল তর্কযুদ্ধ। ইমাম গাযালী (র.) যখন নিজামুল-মুলকের রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন তখন প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এ জাতীয় একটি তর্কযুদ্ধের মজলিসের ব্যবস্থা করা হলো। এমনকি পরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কয়েকটি তর্কযুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতার সাথে জয়লাভ করলেন। সাথে সাথে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ উয়ে উঠলো।[৭৮১] তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতাদৃষ্টে নিজামুল মূলক তাঁকে নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত করেন। যা ছিল সে যুগে একজন আলিমের জন্য সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপান। এ সময় ইমাম সাহবের বয়স মাত্র ৩৪ বছর।[৭৮২] এত অল্প বয়সে মাদরাসায়ে নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষক হবার সৌভাগ্য একমাত্র তিনিই অর্জন করতে পেরেছিলেন। নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করা কিরূপ দূর্লভ ও সম্মানজনক ছিল সে ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, উক্ত মাদরাসায় অধ্যাপনা করার আশায় বহু আলেম প্রতীক্ষার প্রহর গুনে জীবন অতিবাহিত করেছেন তথাপি তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি।[৭৮৩]

ইমাম গাযালী (র.) ৪৮৪ হিজরী সনে বিরাট শান-শাওকতের সঙ্গে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং নিজামিয়ায় পাঠ দান শুরু করেন। অল্পদিনেই তাঁর যোগ্য শিক্ষকতা, উত্তম আলোচনা ও জ্ঞানের গভীরতার কথা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র শিক্ষক ও জ্ঞানী-গুনী তাঁর

৭৮১. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৭৮২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৭৮৩. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবার জন্য চতুর্দিক থেকে নিজামিয়ায় এসে ভীর জমাতে লাগল। তাঁর দরস-মাহফিল গোটা মনুষ্যকুলের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁর উন্নত মস্তিস্ক ও মেধা, ইলমী ফযীলত ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বাগদাদে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে যে, তিনি সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সদস্যবর্গের সমমর্যাদা লাভ করেন।[৭৮৪] তাঁর ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে স্বয়ং সুলতান তাঁকে নিজ মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহন করেন। তাঁর বুদ্ধি প্রখরতায় আমীর উলামা ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ প্রত্যেকেই তাঁর গুনাগ্রাহীরূপে পরিণত হয়ে যান। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, যে কোন সমস্যা সঙ্কুল ব্যাপার সমাধানে তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহন করা বাধ্যতামূলক হিসেবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঐ সময় ইসলামের কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল সালজুকী সাম্রাজ্য এবং আবাবাসীয় রাজ্য। ইমাম সাহেব এই উভয় দেশেই সমতুল্য ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়লেন।[৭৮৫]

৪৮৪ হিজরী সনে বাগদাদের খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহর মৃত্যুর পর মুস্তাযহার বিল্লাহর খেলাফতের অভিষেক অনুষ্ঠানে ইমাম গাযালী (র.) মন্ত্রিসভার পুরোভাগে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা মুস্তাযহার বিল্লাহ বেশ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সুতরাং এলম ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ছিল যথেষ্ট। এই কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইমাম গাযালী (র.) এর সাথে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা ও ঘনিষ্টতা ছিল। বাতেনিয়া ফেরকা এই সময়ে দেশের মধ্যে দারুণ অশান্তি ও কোন্দলের সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাই খলীফা ইমাম গাযালী (র.)-কে তাদের মতবাদের প্রতিবাদে একটি কিতাব রচনা করতে অনুরোধ করলেন। ইমাম সাহেব খলীফার অনুরোধে একটি কিতাব রচনা করলেন এবং খলীফার নামানুসারে গ্রন্থখানার নাম রাখলেন 'মুস্তাযহারী'। রাজদরবারে এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেও তিনি তাঁর অধ্যাপনার কাজে মোটেও শিথিলতা প্রকাশ করেননি। তাঁর মাদ্রাসায় প্রতিদিন তিনশতের অধিক ছাত্র ও শিক্ষক এবং একশতের অধিক আমির উলামা উপস্থিত থেকে

৭৮৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৭৮৫. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

শিক্ষা লাভ করতেন। এছাড়াও তিনি প্রায়ই মজলিশ অনুষ্ঠান করে ওয়ায-নছীহত করতেন। পরে এই ওয়াযগুলির পূর্ণ সংকলন একটি বিরাট গ্রন্থ দুই খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সংকলন শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব পুনরায় তা আদ্যোপান্ত দেখেছেন। এরপর এই গ্রন্থের নাম রাখা হয় 'মাজালিসে গাযালিয়া'।[৭৮৬]

ইমাম সাহেবের নির্জন বাস

চরম উন্নতি ও উত্থানের স্বাভাবিক দাবি ছিল যে, ইমাম গাযালী (র.) এতে তৃপ্তি লাভ করবেন এবং এই বৃত্তের মাঝেই তিনি তার গোটা জীবন কাটিয়ে দেবেন। যেমনটি তাঁর কতক উস্তাদ করেছন এবং লোকেও সাধারণত তাই করে থাকে। কিন্তু তাঁর অস্থির স্বভাব ও প্রকৃতি, উন্নত মনোবল, দুরন্ত সাহসিকতা উন্নতির এই চরম পর্যায়েও তাঁকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে এই উন্নত মনোবল ও হিম্মতই তাঁকে 'ইমাম' ও 'হুজ্জাতু'ল-ইসলাম' বানিয়েছিল। দুনিয়াতে জাঁকজমক, আড়ম্বর, সম্মান ও পদবীর কুরবানী এবং স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা ও সত্যের প্রতি আকর্ষণের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইমাম গাযালী (র.) স্বয়ং সেসব অবস্থা ও কার্যকারণ বর্ণনা করেছেন যা তাঁকে এমন পদক্ষেপ গ্রহনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যা তাঁকে টেনে বের করেছিল শিক্ষা ও দর্স প্রদানের কাজ থেকে।[৭৮৭] তিনি বাগদাদ গমন করে বিভিন্ন মাযহাবের লোকের সাথে মেলামেশা করত: তাদের মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হলেন। যার ফলে তাঁর জীবনধারা ও মতবাদ- মনোভাব এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগলো। এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেব নিজেই বলেছেন "প্রথম থেকেই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সঠিক এবং নির্ভুল তত্ত্বের অনুসন্ধান করা। তাই সবশ্রেণীর লোকের সংস্পর্কে এসে প্রায়শ: আমার মনে হতো আমি যে মতবাদে বিশ্বাসী তার ভিত্তি বুঝি শিথিল হয়ে গেল। এরপর ধারণা হলো– এই ধরনের অনুকরণীয় মতবাদেরতো ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান সবাই বিশ্বাসী। কিন্তু এটাতো প্রকৃত জ্ঞান নয়। তাই আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এরূপ মৌলিক জ্ঞান আমি কতটা অর্জন করতে

৭৮৬. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৭৮৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

পেরেছি, চিন্তা করে দেখলাম, অনুভূত এবং প্রমাণিত বস্তু এবং জ্ঞান ব্যতীত আমার আর অন্য কিছু নেই। এরপর তথ্যানুসন্ধানের অবস্থা যখন বেড়ে গেল, তখন বাস্তব অস্তিত্বের প্রতি ও সন্দেহের উদ্রেক হলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, কোন কিছুর প্রতিই আর বিশ্বাস রইলো না।[৭৮৮]

এরপর আমি তর্কশাস্ত্র সম্পর্কিত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলাম কিন্তু কোন কিছুতেই আমি তৃপ্তি পেলাম না। দর্শন শাস্ত্রের যে পরিমাণ অংশ অবধারিত ও সুনিশ্চিত সত্য, তা কোন মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে, 'খোদাতত্ত্ব' নামক যে অংশটি সম্পৃক্ত তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অবশেষে আমি সূফীবাদ বা তাছাউফ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং এই মতবাদের উপর ইমাম জুনায়েদ বাগদাদী, শিবলী ও বায়জিদ বোস্তামী প্রমুখ মহাত্মা ও মহামনীসীদের রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করলাম। দেখা গেল, কেবলমাত্র ইলম দ্বারা নয়, বরং ইলম ও আমল উভয়ের দ্বারা ওটা অর্জন করা সম্ভব। আর আমলের জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম ও পরহেজগারী। তাই ৪৮৮ হিজরী সনের কোন এক সময় আমার মনে খোয়াল চাপলো যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যা করে চলেছি তা পরিত্যাগ করে কোথাও চলে যাই। আমার এই উদভ্রান্ত আবস্থার মধ্যে প্রায় ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। নিজের মনকে বুঝাতে ও শাসাতে লাগলাম। যে ভাবেই হোক এই যে সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছি, অবশ্যই এগুলো বিসর্জন দিতে হবে।[৭৮৯]

এই কাতরতা, অস্বস্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার দরুন আমি বাকহারা হয়ে গেলাম। এ সময় আমার পরিপাক শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল। এ পর্যায়ে চিকিৎসকগণ আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বললেন, এমন মানসিক ব্যাকুলতায় পথ্যাদি কোন কাজে আসে না। আমি নফসের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সফরের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। এরূপ সংবাদ শুনে বাগদাদের আলেম উলামা ও জ্ঞানী

---

৭৮৮. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্তা, পৃ. ১২-১৩।

৭৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

সমাজ ভীষণ মর্মাহত হলেন। তারা আমাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে জোর অনুরোধ জানালেন। আলেমগণ বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কেবল আমিই অনুভব করছিলাম। সুতরাং সমস্ত সম্পর্ক ও যশ প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আমি সিরিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রখ্যাত জীবনীকার ইবনে খাল্লিকানের মতে, ইমাম গায্যালী (র.) ৪৮৮ হিজরী সনের জ্বিলকদ মাসে বাগদাদ ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করে স্বল্প মূল্যর মোটা কাপড় পরিধান করেন এবং সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে সাধারণ শাক-সবজি গ্রহণে ব্রতী হন।[৭৯০]

অবশেষে ইমাম সাহেব বাগদাদ হতে বের হয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি কঠোর রিয়াযৎ ও মুজাহাদায় মশগূল হন। বিখ্যাত 'জামে'আয়ে উমাবীর' পশ্চিম দিকস্থ মীনারার উপরের কক্ষে দরজা বন্ধ করে সমস্ত দিন মুরাকাবা ও যিক্র আযকারে মশগূল থাকতেন। এভাবে একাধারে দুই বছর সেখানে কাটালেন। তিনি অধিকাংশ সময় মুরাকাবা ও মুজাহাদায় কাটালেও তখন পর্যন্ত ইলম চর্চা বন্ধ করতে পারেন নাই। তিনি মসজিদের পশ্চিম কোনে বসে নিয়মিত তালীমের কাজ করতেন। কিন্তু কিতাব অধ্যয়নেই যেহেতু এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করা যায় না, তাই কোন একজন মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহন জরুরী ছিল। ইতিহাসবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম গায্যালী (র) শায়েখ আবু আলী ফারমুদী (র.) এর হতে বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন। শায়েখ আবু আলী ফারমাদী (র.) একজন বিখ্যাত ওলী ছিলেন। নিযামুল মুলক তাঁকে এত সম্মান করতেন যে, তিনি দরবারে আসলে নিযামুল মুলক স্বীয় আসন থেকে উঠে দাড়াতেন এবং ফারমাদী (র.)-কে সিংহাসনে বসাতেন। শায়েখ ফারমাদী (র.) ৪৭৭ হিজরীতে তুস নগরে ইন্তেকাল করেন। এতে বোঝা যায়, ইমাম গায্যালী (র.) স্বীয় ছাত্র জীবনেই শাখে ফারমাদী (র.) এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। সম্ভবত তখন তাঁর বয়স ছিল ২৭ বছর।[৭৯১]

---

৭৯০. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৭৯১. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

সিরিয়ায় দু'বছর অতিবাহিত করার পর ইমাম সাহেব বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার অভিপ্রায়ে রওনা করে পথে দামেশকে উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে নিয়ত করেন। সেখানে অবস্থানকালে দামেস্কের সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে আমিনিয়া পরিদর্শনে যান। এ সময় একজন শিক্ষক তালীম দিতে গিয়ে বলেন, এই ব্যাপারে ইমাম গাযালী (র.) এই মত পোষণ করেন, তাই অন্যান্য মতবাদ থেকে এটি দৃঢ় ও তত্ত্বভিত্তিক। এই কথা শুনে ইমাম সাহেব আত্ম-গৌরবের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, এই কথা মনে করে দ্রুত সেখান থেকে উঠে এলেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই দামেশক পরিত্রাগ করে বাইতুল মুকাদ্দাস রওনা হলেন। যদিও কয়েকদিন দামেশকে অবস্থান করা তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু অহংকার উজ্জীবিত হওয়ার আশংকায় তিনি এক মুহূর্ত সেখানে থাকা নিজের জন্য নিরাপদ মনে করলেন না। বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছে সেখানে তিনি রুদ্ধদার কক্ষে দিবা-নিশি মুরাকাবাহ মুশাহাদায়ই নিমজ্জিত থাকলেন। লোক সমক্ষে বের হওয়া নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করলেন।[৭৯২]

কিছুদিন পর বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কবর 'মাকামে খলীলে' চলে আসেন। আরো কিছুকাল পর সেখান থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনা সফর করেন। এ সময় তিনি মক্কায় কিছুকাল অবস্থান করেছেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সফরে তিনি মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মিশর থেকে ইমাম গাযালী (র.) মরক্কোর বাদশাহ ইউসুফ বিন তাশকীনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফরের ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশকীন ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করলে তার সেই সফর আর করা হয়নি। ইমাম গাযালী (র.) লাগাতার দীর্ঘ দশ বছর বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। অধিকাংশ সময় তিনি বিরান ও জনশূন্য এলাকায় বিচরণ ও দিন যাপন করতেন। ইতিহাসে তাঁর এই সফরের সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি।[৭৯৩]

---

৭৯২. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মো:কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৭৯৩. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯।

হযরত ইমাম গাযালী (র.) ৪৯৯ হিজরী সনে ‘মাকামে খলীলে’ পৌঁছালেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রতিজ্ঞা করলেন –(১) আর কোনদিন কোন বাদশাহর দরবারে যাবেন না (২) কোন বাদশাহর হাদিয়া উপঢৌকন গ্রহন করবে না (৩) কারও সাথে বাহাস তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহন করবেন না। বলা বাহুল্য, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই তিনটি প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।[৭৯৪]

গৃহ প্রত্যাবর্তন

ইমাম গাযালী (র.) তাঁর ‘মুনকায মিনাদদালাল’ গ্রন্থে লিখেছেন, হজ্জ্বব্রত সম্পন্ন করার পর পরিবার পরিজনের আকর্ষণে আমি পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হলাম। অথচ ইতোপূর্বে আমি বাড়ী বা স্বদেশের নাম শুনলেই চমকে উঠতাম এবং তা থেকে দূরে পালিয়ে বাঁচতাম। সে যাই হোক অবস্থার বিবর্তনে আামি বাড়ী এসে পৌছলাম এবং এখানে এসে গভীরভাবে মুরাকাবাহ মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করলাম। অবশ্য দেশ ও দশের বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে মাঝে মাঝে মুরাকাবাহ ভঙ্গ করতে হতো।[৭৯৫]

অন্যত্র ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, “অক্লান্ত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে আমার আত্মা এমনভাবে নিস্কলুষ ও পবিত্র হয়ে গিয়েছিল যে, আমার মনের যাবতীয় দ্বন্দ ও দ্বিধা সন্দেহের প্রাচীর এ সময় ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবেই আমি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হলাম।”[৭৯৬]

পুনরায় অধ্যাপনা

মা’রেফাত ও হাকীকতের তথ্য উদঘাটনের পর ইমাম সাহেব লক্ষ্য করলেন যে, গোটা যুগটাই যেন ক্রমে মাযহাবের প্রভাব হতে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ফালসাফা ইত্যাদির বেলায় মাযহাবী মতবাদের প্রভাব যেন অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। অতএব, তিনি পুনরায় নির্জনবাসের মনস্থ করলেন। কিন্তু এমন সময় শাহী দরবার হতে পুনরায় তা’লীমের কাজ

৭৯৪. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৭৯৫. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ’দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

গ্রহনের জন্য তাঁর নিকট অনুরোধ পত্র আসল। ইমাম সাহেব সূফীয়ায়ে কেরাম ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলেই তাঁকে নির্জনবাস ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। এছাড়া তাঁর সমসাময়িক বহু বুযুর্গ লোকের প্রতি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইঙ্গিত হল যে, ইমাম গাযালী (র.) এর বাদশাহের অনুরোধ রক্ষা করার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এছাড়া নিযামুল মুলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফখরুল মুলক এবং তৎকালিন বাদশাহ মালেক শাহের প্রধানমন্ত্রী ইমাম গাযালী (র.) এর বহুমুখী প্রশংসা শুনে স্বয়ং ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে তাঁকে নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করলেন। ৪৯৯ হিজরী সনের জিলকদ মাসে তিনি নিশাপুর নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।[৭৯৭]

কিছুদিন যেতে না যেতেই এই জ্ঞানী-গুনী লোকটির উপর কঠিন বিপদ নেমে আসলো। হিজরী ৫০০ সনের মহররম মাসে বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের এক গুপ্তঘাতকের হাতে উযীরে আযম ফখরুল মুলক নিষ্ঠুরভাবে শাহাদাত বরণ করেন। এই ঘটনায় ইমাম গাযালী (র.) এর মনে অত্যন্ত অশান্তি দেখা দিল। হঠাৎ তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা দমে গেল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে নিজ জন্মভূমি তুস নগরে চলে আসলেন। অতঃপর স্বীয় গৃহ সংলগ্ন একটি স্থানে খানকাহ ও মাদ্রাসা তৈরী করে একই সাথে জনসাধারণকে জাহেরী ও বাত্বেনী শিক্ষা দান কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্যাপৃত থাকলেন।[৭৯৮]

ইমাম গাযালী (র.) এর রচনাবলী

গ্রন্থ রচনার জগতে ইমাম গাযালী (র.) যেই বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন ইতিহাসে তার অপর দৃষ্টান্ত বিরল। ইমাম গাযালী (র.) এর আয়ুস্কাল ছিল মাত্র ৫৫ বছর। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় মাত্র বিশ বছর বয়সেই তিনি লেখালেখির সূচনা করেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার সরব উপস্থিতির কোনরূপ ব্যত্যয় ছিল না। এতসব ব্যস্ততার পরও তিনি

৭৯৭. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৭৯৮. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মো: কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

কিরূপে গ্রন্থ রচনায় পর্বতসম অবদান রেখে গেলেন তা আজো বিদগ্ধ সমাজের এক জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে। ইমাম গাযালী (র.) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নিম্নে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে একটি গ্রন্থসূচী দেওয়া হল –

১. এহয়াউ উলুমিদ্দীন
২. ইমলা আলা মুশকিলিল এহয়া
৩. আরবাইন
৪. আসমাউল হুসনা
৫. আল ইকতিসাদ ফিল ই'তিক্বাদ
৬. ইলজামুল আওয়াম
৭. আসরারুল আনওয়ারিল ইলাহিয়্যাহ
৮. আখলাকুল আবরার
৯. আসরারু ইত্তবায়িস সুন্নাহ
১০. আসরারুল হুরুফ ওয়াল কালিমাত
১১. আইয়ুহাল ওয়ালাদ
১২. বিদায়াতুল হিদায়া
১৩. আল-বাসীত
১৪. বায়ানুল ক্বওলাইনিশ শাফেয়ী
১৫. বায়ানু ফাজাইহিল ইবাহিয়্যাহ
১৬. বাদায়েউস সানায়ে
১৭. তাম্বীহুল গাফেলীন
১৮. তালবীসে ইবলীস
১৯. তাহাফুতুল ফালাসিফা
২০. তা'লীকাত ফী ফরুইল মাযহাব
২১. তাহসীনুল মাখায
২২. তাফরিকা বাইনাল ইসলাম ওয়ায্‌যানদাকাহ্‌
২৩. জাওহারুল কোরআন

২৪. হুজ্জাতুল হক্ব

২৫. হাকীকাতুররূহ

২৬. খোলাসাতুর রাসাইল ইলা ইলমিল মাসাইল

২৭. ইখতিসারুল মুখতাসার

২৮. আর-রেসালাতুল কুদসিয়্যাহ

২৯. আসসিররুল মাসূন

৩০. শারহে দায়েরা আলী ইবনে আবি তালেব

৩১. শিফাউল আলীল আলা মাসআলাতিত তালীল

৩২. আকীদাতুল মিসবাহ্

৩৩. আজাইবু সুনইল্লাহ

৩৪. উনকুদুল মুখতাসার

৩৫. গায়াতুল ফাউর ফী মাযেলিত দাওর

৩৬. গাওরুদ্দ দাওর

৩৭. ফাতাওয়া

৩৮. আল-ফিকরাহ ওয়াল ইবরাহ্

৩৯. ফাওয়াতিহুসসুয়ার

৪০. আল ফারকু বাইনাল সালেহ ওয়া গাইরেস সালেহ

৪১. আল-ক্বানুনুল কুল্লী

৪২. ক্বানুনুর রাসুল

৪৩. আল-কুরবাতু ইলাল্লাহ্

৪৪. আল-কিসতাসুল মুস্তাকিম

৪৫. ক্বাওয়ায়েদুল আক্বায়েদ

৪৬. আল-ক্বাওলুল জামীল

৪৭. কিমিয়ায়ে সা'দাত

৪৮. কিমিয়ায়ে সা'দাত (সংক্ষিপ্ত)

৪৯. কাশফু উলুমিল আখেরাহ

৫০. কানযুল ইদ্দাত

৫১. আল-লুবাবুল মুনতাহাল

৫২. আল-মুস্তাসফা ফী উসুলিল ফেকাহ্

৫৩. আল-মানখুল

৫৪. আল-মাবাদী ওয়াল গায়া

৫৫. আল-মাজালেসুল গাজ্জালিয়া

৫৬. মাকাসেদুল ফালাসিফা

৫৭. আল-মুনকেয মিনায যালাল

৫৮. মেয়ারুন নাজর

৫৯. মেয়ারুল উলুম ফিল মানতেক

৬০. মুহিককুন নাজর

৬১. আল মুস্তাযহারী

৬২. মীজানুল আমল

৬৩. মাওয়াহেমুল বাতেনিয়াহ্

৬৪. আল-মানহাজুল আ'লা

৬৫. মেরাজুস সালেহীন

৬৬. আল-মাকনুন ফিল উসূল

৬৭. মুসাল্লামুস-সালাতীন

৬৮. মুফাস্‌সালুল খিলাফ

৬৯. মিনহাজুল আবেদীন (বলা হয়, এটা তার লিখিত সর্বশেষ কিতাব)

৭০. আল মাআরেফুল আকলিয়্যাহ

৭১. মিশকাতুল আনওয়ার

৭২. নসীহাতুল মুলুক

৭৩. ওয়াজিয

৭৪. ওয়াসীত

৭৫. ইয়াকুততাবীল ফিত তাফসীর (৪০ খণ্ড)

বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবলী
(উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ)

১. ইসলামী ফেকাহ ও আইনশাস্ত্র : ওয়াসী, বাসীত, ওয়াজিয, বায়ানুল ক্বাওলাইন, তা'লীকাত ফী ফরুইল মাযহাব, খোলাসাতুররাসূল, ইখতিসারুল মুখতাসার, গায়াতুল ফাউর, ফাতাওয়া।

২. উসূলে ফেকাহ্ : তাহসীনুল মা'খায, শিফাউল আলীল, মুনতাহাল ফী ইলমিল জাদাল, মানখুল, মুস্তাসফা, মা'খায ফীল খিলাফিয়্যাত, মুফাসসালুল খিলাফ।

৩. মানতেক শাস্ত্র : মিয়ারুল ইলম, মুহিককুন নাজর, মীজানুল আমল।

৪. দর্শনশাস্ত্র : মাকাসেদুল ফালাসিফা

৫. কালাম শাস্ত্র : তাহাফুল ফালাসিফা, আল-মুনকিয মিনায যালাল, ইলজামুল আওয়াম, আল-ইকতিসাদ, আল-মুস্তাযহারী, ফাজায়েহে ইবাহিয়্যাহ, হাকীকাতুর রূহ, আল-কিসতাসুল মুস্তাকিম, আল-ক্বাওলুল জামীল, মাওয়াহেমুল বাতেনিয়া, তাফরিকা বাইনাল ইসলাম ওয়ায্ যানদাকাহ্, আল-রেসালাতুল কুদসিয়াহ।

৬. তাছাউফতত্ত্ব ও চরিত্র দর্শন : এহয়াউ উলুমিদ্দিন, কিমিয়ায়ে সা'সাত, আল-মাকসাদুল আকসা, আখলাকুল আবরার, জাওহারুল কোরআন, জাওহারুল কুদ্স, মেশকাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবেদীন, মেরাজুস সালেকীন, নসীহাতুল মুলুক, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, বিদায়াতুল হিদায়া, মেশকাতুল আনওয়ার।[৭৯৯]

সন্তান

ইমাম গাযালী (র.) এর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তবে একাধিক কন্যা সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'সাতুল মনী'। ইমাম সাহেবের বংশাবলীর দীর্ঘসূত্রী পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লামা কাইউমী তার রচিত 'কিতাবুল মিসবাহ' গ্রন্থে শায়খ মায়দুদ্দীন থেকে ইমাম গাযালী (র.) সম্পর্কে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। শায়খ

---

৭৯৯. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৬।

মায়দুদ্দীন 'সাতুল মনীর' নিম্নতম সপ্তম পুরুষ। ৭১০ হিজরী সন পর্যন্ত ইমাম সাহেবের বংশ পরম্পরার সন্ধান পাওয়া যায়।[৮০০]

ইন্তেকাল

মুসলিম জাহানের ক্ষনজন্মা পুরুষ ইমাম গাযালী (র.) দীর্ঘজীবী হননি। তিনি ৫০৫ হিজরী সনের ১৪ই জামাদিউস সানি সোমবার প্রত্যুষে ফজরের নামাজের পর মাত্র ৫৫ বছর বয়সে 'তাবরান' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৮০১] আল্লামা ইবনে জাওযী তাঁর ছোট ভাই আহমদ গাযালীর বরাতে এভাবে বর্ণনা করেছেন – সোমবার দিন ভোর বেলা তিনি ঘুম থেকে উঠেন। ওযু করে সালাত আদায় করেন। এরপর কাফনের কাপড় চেয়ে পাঠান এবং তা চোখে মুখে ঠেকিয়ে বলেন, প্রভুর নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছি। এই বলে দু'পা সোজা করে শায়িত হলেন। এরপর লোকেরা দেখতে পেল, তিনি আর ইহজগতে নেই।[৮০২] ইমাম গাযালী (র.) এর মৃত্যুতে গোটা মুসলিম জাহানে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সকল শ্রেণীর মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে যায়। তৎকালীন বড় বড় কবিগণ তাঁর স্মরণে বহু শোকগাঁথা ও কবিতা রচনা করেছেন।

---

৮০০. ইমাম গাযযালী (র.), মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান অনূদিত, *কিমিয়ায়ে সাআ'দাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৮০১. আল্লামা শিবলী নোমানী, কাউছার বিন খালেদ অনূদিত, *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৮০২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)

জন্ম

মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, তাপসকুলের মধ্যমণি, সুলতানুল আউলিয়া, গাউছুল আযম, সাইয়্যেদ আবদুল কাদির জিলানী (র.) ৪৭১ হিজরী সনের পবিত্র রমজান মাসে ইরানের জিলান বা গিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তিনি ৪৭০ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৮০৩] জন্মভূমির সাথে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে আবদুল কাদির জিলানী (র.) বলা হয়।

বংশ পরিচয়

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার বংশগত সম্পর্ক ছিল হযরত ইমাম হাসান (রা.) সাথে আর তাঁর মাতার বংশগত সম্পর্ক ছিল হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) সাথে। এই কারণেই তাঁকে আল হাসানী ওয়াল হুসাহনী বলা হয়ে থাকে। তাঁর পিতার নাম হযরত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসা (র.), আর মাতার নাম হযরত সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র.)।[৮০৪] হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর আদি পিতৃপুরুষ ছিলেন হযরত আলী (রা.)। সুতরাং পিতা এবং মাতা উভয় সূত্রেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উভয় বংশধারা নিম্নে ধারাবাহিকভবে উদ্ধৃত হলো :

---

৮০৩. আবদুল খালেক, *গাওসে আ'যম* (ঢাকা : সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৯), পৃ. ১১।

৮০৪. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)

মাতৃবংশ

ইমাম হোসেন (রা.)

ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.)

ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র.)

ইমাম জাফর সাদেক (র.)

হযরত আলী রেজা (র.)

হযরত মুসা কাজেম (র.)

হযরত সায়্যেদ মোহাম্মদ (র.)

হযরত আবু আলাউদ্দিন (র.)

হযরত সায়্যেদ মূসা (র.)

হযরত আবু কালাম (র.)

সায়্যেদ মোহাম্মদ (র.)

আবু জামাল (র.)

আব্দুল্লাহ মায়ী (র.)

উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র.)

আবদুল কাদির জিলানী (র.)

পিতৃবংশ

ইমাম হাসান (রা.)

হযরত হাসান মুসান্না (র.)

সায়্যেদ আবদুল্লাহ আল মাহজ (র.)

সায়্যেদ মুসা আল জরন (র.)

সায়্যেদ মুসা সানি (র.)

সায়্যেদ আবদুল্লাহ (র.)

সায়্যেদ দাউদ (র.)

সায়্যেদ মোহাম্মদ (র.)

সায়্যেদ ইয়াহইয়া যাহেদ (র.)

সায়্যেদ আবু সালেহ মূসা (র.)

সায়্যেদ আবু আবদুল্লাহ (র.)

সায়্যেদ আব্দুল্লাহ (র.)

সায়্যেদ আবু তাহের (র.)

এভাবে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) হাসানি ও হুসাইনি উভয় ধারার বংশদ্ভূত। কাজেই তিনি হযরত মোহাম্মদ (স.) এর আহলুল বাইয়াত মহান সদস্য।[৮০৫]

নামকরণ

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর জন্মের পর তাঁর পিতা দৈববাণীর (প্রত্যাদেশ) নির্দেশ অনুযায়ী পুত্রের নাম রাখে 'আবদুল কাদির'। আধ্যাত্ম সাধনার অগ্রনায়ক, তাপসকুল গৌরব আদুল কাদির জিলানী (র.) নামে পরিচিত হলেও খোদার ভক্ত মহৎপ্রাণ সুধীমণ্ডলীর নিকট বিভিন্ন গুণবাচক নামেও তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর গুণবাচক নামগুলো হল কুতুবুল আযম বা বড়পীর (র.) মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, নূরে ইয়াজদানী, গাউসে ছামদানী মহীউদ্দিন।[৮০৬]

বাল্যকাল

শৈশবকাল থেকেই গাউসুল আযম (র.) খুব গম্ভীর ও সংযত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কখনও তিনি খেলাধুলায় লিপ্ত হন নাই। শৈশবকাল থেকেই তিনি চিন্তাশীল ছিলেন। ছোটবেলায় খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের স্পৃহা তাঁর মনে যে একেবারেই উদয় হয়নি তা নয়। কিন্তু কখনও তিনি তা প্রশ্রয় দিতে পারতেন না। কেননা এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁর পবিত্র জীবনকে গড়ে তুলেছিল। গাউসে পাকের সন্তান হযরত সাইয়েদ আবদুর রায্যাক (র.) বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং গাউসে পাক বলেছেন যে, "শৈশবে কখনও সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করার ইচ্ছা মনে উদিত হলে তৎক্ষণাৎ আমি গায়েবী বাণী শুনতাম, হে মুবারক শিশু! আমার দিকে আস। এরকম গায়েবী আওয়ায শুনে আমি ভয় পেতাম এবং দৌড়ে মায়ের কোলে আশ্রয় নিতাম।"[৮০৭]

---

৮০৫. আবদুল খালেক, *গাওসে আ'যম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৮০৬. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)* (ঢাকা : হেরা পাবলিকেশন, ১৯৯১), পৃ. ৩৭-৩৮।

৮০৭. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

শিক্ষা জীবন

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা-মাতার মাধ্যমে। তিনি তাঁর পিতা এবং মাতার কাছ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষনীয় বিষয়গুলি বাড়ীতেই সমাপ্ত করেছিলেন। গৃহ শিক্ষার বাইরে জিলান নগরের স্থানীয় মক্তবেও তিনি বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রখর ধীশক্তি, প্রতুৎপন্নমতিত্ব ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার ফলে বাল্যকালেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮০৮] তিনি অতি শৈশবেই কোরআন শরীফ মুখস্ত করেছিলন।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) খুব অল্প বয়সে পিতাকে হারান। তাকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করেন তাঁর নানা ও পূণ্যবতী মা। তাঁর বয়স যখন ১৭ বছর তখন তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। তখনকার দিনে ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বাগদাদে আবদুল কাদির জিলানী (র.) জামিয়া নিজামিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা আবু জাকারিয়া তাবরিজী (র.) এর প্রিয় ছাত্রে পরিণত হন। সেখানে তিনি আট বছর পড়াশুনা করেন এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে তাঁর দখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ সময়টা তাঁর জন্য ছিল চরম পরীক্ষা–নিরীক্ষার। তিনি অভাবের তাড়নায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটালেও কারো নিকট ভিক্ষা করেননি। শিক্ষা সমাপান্তে তিনি অধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। কঠোর ধ্যানে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন।[৮০৯] এ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন, "ইরাকের মরু-প্রান্তরে ও বন-জঙ্গলে আমি সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল একাকী অতিবাহিত করেছি। দিবা-রাত্রির মধ্যে একমাত্র আল্লাহ পাকের যিক্‌র ছাড়া আমার অন্য কোন কাজ ছিল না। বছরের পর বছর আমি এশার নামাজের ওযু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করেছি। অসংখ্য ও অগণিত রাত আমার উপর দিয়ে এইভাবে অনিদ্রায় কেটে গেছে যে, নিমিষের জন্যও আমি চোখ বন্ধ করি নাই। ঘুমের প্রবল আক্রমণ হলে আমি এক পায়ের উপর দাড়িয়ে নফল নামাজে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতাম।

---

৮০৮. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৮০৯. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী* (ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১৪৭।

এইভাবে বহু বছর পর্যন্ত আমি রাতে নফল নামাজে দাড়িয়ে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেছি।"[৮১০] তাঁর এ পরিশ্রম ছিল সত্য ও আল্লাহর সন্ধানে। অবশেষে তিনি বিখ্যাত দরবেশ শেখ আবু সাঈদ মাখজুমীর শিষ্যত্ব বরণ করেন। পীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করলে শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (র.) তাঁর মধ্যে প্রকৃত শিষ্যত্বের যোগ্যতা দেখতে পেয়ে তাঁকে মুরীদ করলেন এবং মারেফতের গুপ্ততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি অচিরেই পীরের দীক্ষায় মারেফতের উচ্চতর সোপানে আরোহন করলেন। তিনি দীর্ঘ দিন পীরের দরবারে থকে ফয়জ ও বরকত লাভে ধন্য হলেন।[৮১১]

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মারেফতের তত্ত্বলাভে অনেক সহায়ক হয়ে থাকে। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) ছিলেন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পবিত্র কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, দর্শন, ভূগোল, সাহিত্য, ব্যাকারণ, রসায়ন ও ইতিহাস শাস্ত্র প্রভৃতি তেরটি শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। স্বীয় কঠোর সাধনা ও বিভিন্ন সাধকদের সাহচর্যে পূর্বেই তিনি রূহানী জগতের শ্রেষ্ট পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত ছিলেন। তদুপরি কামেল পীরের সাহচর্য তাঁকে পুরিপূর্ণ কামিয়াবীর উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী করে তুলেছিল।[৮১২]

কর্ম জীবন

জাহিরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণতা লাভের পর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যখন বাগদাদে শিক্ষারত ছিলেন, তখন হযরত আবু সাঈদ মুবারক (র.) তাঁর শিক্ষা-দিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও কামেল ওলী-আল্লাহ ছিলেন। তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজেই সেখানে শিক্ষকতা করতেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও গুণগরিমার পরিচয় পেয়ে ছাত্র জীবনেই তাঁর শিক্ষকগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই হযরত আবু

---

৮১০. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৮১১. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৮১২. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

সাঈদ মুবারক (র.) নিতান্ত আগ্রহের সাথে তাঁর হাতে মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষকতার ভার অর্পণ করলেন। তিনি ও মৃতপ্রায় ইসলামের খেদমতে এই পথ পেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাদ্রাসা পরিচালনা ও শিক্ষকতার কাজ সম্পাদন করতে লাগলেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য দুনিয়ায় তখন অতুলনীয় ছিল।[৮১৩]

হযরত বড়পীর (র.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ফলে প্রচলিত ঘুনেধরা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। যুগ ও পরিবেশের উপযোগী তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীবৃন্দ সদলবলে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে ভীড় করতে লাগল। তিনি তেরটি বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রমকে দুইভাবে করেছিলেন। প্রথম ভাগের সময়কাল ছিল সকাল থেকে বেলা দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। এই সময় তিনি হাদীস শাস্ত্র, ন্যায়বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব এবং উসুল ও সাহিত্য বিষয়াদি সম্মন্ধে পাঠদান করতেন। আর দ্বিতীয় ভাগের সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পর হতে এশার নামাজ পর্যন্ত। এই সময় তিনি পবিত্র কুরআন অনুবাদ, তাওহীদ ও আইন শাস্ত্রাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছল যে, মাদ্রাসার মাঠে নিকটবর্তী ঘরসমূহের ছাদে এমনকি সড়কের উপর ও ছাত্রগণ হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর তালিম ও তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করতে লাগল।[৮১৪] সত্বরই এই মাদ্রাসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ মাদ্রাসা গৃহটি সম্প্রসারিত করে তাঁর মজলিসের উপযোগী করে তোলেন। তাঁর মজলিসে লোকের ভীড় এমন পরিমাণে বাড়তে লাগল যে, অবশেষে মাদ্রসায় তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট থাকত না। তাঁর ওয়াজ শুনতে গোটা বাগদাদ যেন ভেঙ্গে পড়ত। আল্লাহপাক তাঁকে এমন প্রভাবমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন যা বড় বড় রাজা-বাদশাহর ভাগ্যেও জোটেনি। 'মুগনী' প্রণেতা শায়খ মু'ফিক উদ্দীন ইবনে কুদামা বলেন, "কেবল ধর্মের কারণে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী হতে আমি আর কাউকে

৮১৩. আবদুল খালেক, *গাওসে আ'যম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

৮১৪. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

দেখিনি।” বাদশাহ ও উযীরবৃন্দ তাঁর মজলিসে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে হাযির হতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপবেশন করতেন। উপস্থিত উলামা ও ফকীহদের সংখ্যা নিরূপণ করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। এক একটি মজলিসে চার শ’র মত দোয়াতই দেখা যেত। এগুলো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য লোকেরা নিয়ে আসত।[৮১৫]

খোলাফায়ে রাশেদার পর ‘শরিয়ত’ ও ‘তরীকতের’ প্রবক্তাদের মধ্যে চরম দ্বন্ধ দেখা দেয় এবং এই দুই পন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হচ্ছিল না। মুতাজিলা পন্থীদের ধর্মীয় যুক্তিবাদ ইসলামের মৌলিক চেতনায় বিরাট আঘাত হেনেছিল। মুতাজিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন দু’জন ক্ষমতাধর আব্বসীয় খলিফা মামুন ও মুতাসিম। মুতাজিলা মতবাদের বিস্তার ইসলামের মহান নবীর আদর্শের ভিত্তি নরবড়ে করে দেয়। এই দ্বন্ধে আব্বসীয় খলিফার হাতে ইমাম আহমদ বিন হাম্মল চরমভাবে নিগৃহীত হন। সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানী (র.) দু’টি চরমপন্থা-মনসুর হাল্লাজের আধ্যাত্মিকতাবাদ ও মুতাজিলাদের যুক্তিবাদের মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মধ্যে শরিয়ত ও তরিকতের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তিনি দু’টির মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখতেন। সেকারণে তাঁকে বলা হয় ‘মহীউদ্দিন’ অর্থাৎ ‘ধর্ম বিশুদ্ধকারী’। ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলের অনুসারী ছিলেন।[৮১৬]

গুনাবলী ও চরিত্র

হযরত শায়খ আবু সাঈদ (র.) এবং হযরত শায়খ আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (র.) বলেন, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর শরীর ক্ষীন, মধ্যম আকৃতি, স্বর্ণকান্তি, বিস্তৃত বক্ষ, দাড়ি দীর্ঘ ও ঘন, ভ্রুযুগল যুগ্ম এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ ও স্পষ্ট ছিল। তিনি কথা বললে সভাস্থল গমগম করে উঠত। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে অথবা সভায় বক্তৃতা দিলে শ্রোতাবৃন্দ নিস্তব্দ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুনতে থাকত এবং তাঁর প্রতি অমনোযোগী

---

৮১৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

৮১৬. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

হওয়ার ক্ষমতা কারও থাকত না।[৮১৭] এত উন্নত ও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সীমাতিরিক্ত বিনয়ী ছিলেন। একটি শিশু কিংবা একটি বালিকাও তাঁর সাথে কথা বললে তিনি দাঁড়িয়ে তা শুনতেন এবং তার ফরমায়েশ মুতাবিক কাজ করে দিতেন। অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নিকট তিনি বসতেন এবং তাদের কাপড়-চোপড় পরিস্কার করে দিতেন। অপরদিকে তথাকথিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিংবা সাম্রাজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সম্মানার্থেও তিনি দাঁড়াতেন না। খলীফার আগমন ঘটলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই আপন গৃহে চলে যেতেন এবং খলীফা এসে উপবেশন করলে তারপর গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতেন যাতে করে খলীফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে না হয়। তিনি কখনও কোন উযীর কিংবা সুলতানের দরজায় গিয়ে দাঁড়াননি।[৮১৮]

সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানী (র.) অত্যন্ত সহজ, সরল ও নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করেছেন। তিনি দিবাভাগে ইসলামের সত্যিকার নীতির প্রচার করেছেন এবং রাতে ইবাদত ও ধ্যানের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল সরলতা, নিঃস্বার্থপরতা ও সত্যবাদিতার আদর্শ। খুব সাধারণ খাবার তিনি খেতেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। মানুষের কাছে সব সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী শোনাতেন, "সেই সর্বোত্তম মানুষ, যে মানুষকে ভালবাসে এবং মানবতার সেবা করে।"[৮১৯] হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর নিকট সবসময় অসংখ্য হাদিয়া আসত। তিনি তা স্পর্শও করতেন না। তিনি সম্পূর্ণই দান করে দিতে আদেশ করতেন। বাদশাহ কোন হাদিয়া নিয়ে তাঁর দরবারে আসলে তিনি তা স্পর্শ না করেই তৎক্ষণাৎ মুসাফির ও মুরীদানের জন্য কেনা রুটির মূল্যস্বরূপ রুটিওয়ালাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করতেন। তাঁর জন্য চারটি রুটি তৈরী করা হত। খাওয়ার সময় হলে তিনি নিজের হাতে তা ছিড়ে টুকরা করতেন এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তাই তিনি

---

৮১৭. আবদুল খালেক, *গাওসে আ'যম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৮১৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

৮১৯. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

খেতেন।[৮২০] ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াতে ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণে তিনি দেদার অর্থ ব্যয় করতেন এবং এতে আনন্দ পেতেন। কালাইদু'ল-জাওয়াহির প্রণেতা লিখেছেন, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর নির্দেশ ছিল, রাতের বেলা প্রশস্ত দস্তরখানা বিছানো হবে। তিনি নিজে মেহমানদের সাথে বসে খানা খেতেন। গরীব ও দুর্বল লোকদের সঙ্গ দিতেন এবং ছাত্রদের জিজ্ঞাসা সমূহ ধৈর্য সহকারে শুনতেন। প্রত্যেকেই মনে করত, সেই শায়খের সবচেয়ে কাছের লোক এবং সেই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি তার সম্পর্কে খোঁজ–খবর নিতেন এবং তাঁর জন্য চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন। সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। ছোটখাটো দোষ ক্রটি ও ভুলচুক তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন।[৮২১]

সন্তান

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) ৫১ বছর বয়সে দাম্পত্য জীবনে পদার্পণ করেন এবং ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই ৪০ বছর বিবাহিত জীবনে তিনি চারটি বিবাহ করেন। তাঁর চার স্ত্রীর গর্ভে ৪৯ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তারমধ্যে ২৭ জন পুত্র ও ২২ কন্যা। তারা সকলেই ছিলেন মহান পিতার অনুসারী ও বিজ্ঞ আলেম এবং বুযুর্গ। আধ্যাত্ম সাধনা, ইবাদত বন্দেগী, রিয়াযত, মোজাহাদা, জাহেরী ও বাতেনী ইলমের ক্ষেত্রে তাদের সকলেই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) নিজেই অধিকাংশ সন্তানদের শিক্ষাদান করতেন।[৮২২]

রচনাবলী

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর কর্মময় জীবন ছিল মানব জাতির জন্য জীবনাদর্শ। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা ও আদর্শ উজ্জলরূপে ফুটে উঠেনি। তিনি আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও সাধনার পথে জীবনকে

---

৮২০. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৮২১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৮২২. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

অতিবাহিত করেননি। বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যান ও মঙ্গলের জন্য এবং মানব সমাজের সামগ্রিক পরিশুদ্ধির জন্য সাধনা করে গেছেন যা মুসলিম গণমানসে হেদায়েতের উজ্জ্বল মশালরূপে চিরকাল ভাস্কর হয়ে থাকবে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদি অনুসারে আব্দুল কাদির (র.) প্রায় ৬৯টি কিতাব রচনা করেছেন।[৮২৩] তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ –

১. আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিলি হক্ক। ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব। পাক-ভারত উপমহাদেশ ও মিসরসহ অন্যান্য দেশেও ছাপা হয়েছে।
২. ফুতূহুল গায়িব। তরীকত ও মা'রিফাত শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ।
৩. আল-ফাতহুর রাব্বানী। তাঁর সেসব ওয়ায়ের সংকলন সেগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশসহ অন্যান্য দেশেও ছাপা হয়েছে।
৪. সিররুল আসরার ওয়া মাযহারুল আনওয়ার ফী-মা ইয়াহতাজু ইলায়হিল আবরার
৫. বাশায়িরুল খায়রাত। দরূদ শরীফ সংক্রান্ত আলোচনা
৬. জালাউল খাতির ফিল বাত্বিনি ওয়ায্ যাহির
৭. আল-আওয়াকীত ওয়াল হিকাম
৮. আল-ফুয়ূযাতুর রাব্বানিয়্যাহ
৯. তাফসীরে জিলানী
১০. আল-মাওয়াহিবুর রাহমানিয়্যাহ
১১. আদাবুস্ সুলূক ওয়াত্ তাওয়াস্‌সুল ইলা মানাযিলিল মুলুক
১২. ইগাসাতুল আরিফীন ওয়া গায়াতুল ওয়াসিলীন
১৩. রদ্দুর রাফাদ্বাহ্
১৪. মারাতিবুল ওয়াজুদ
১৫. দু'আউ ওয়া আওরাদুল ফাত্‌হিয়্যাহ্ : দো'আ-উল বাসমালাহ

৮২৩. এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ, *ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর অবদান*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, পৃ. ৭৬।

১৬. মাকাতিব, এটি ফারসী ভাষায় তাঁর পত্র সংকলন

১৭. আল-হিযবুল কবীর

১৮. রিসালাতুন ফিল আসমা-ইল আযীমাহ্

১৯. আওরাদুল আইয়্যামি ওয়াল আওকাত

২০. দিওয়ান-এ-গাউসিয়্যা, এটি ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁর কবিতা সংকলন, যাতে তরিকতের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

২১. 'ইমদাদে ইয়াওমিয়া', তরীকত পন্থীদের জন্য সঞ্জীবণী গ্রন্থ।

২২. কিতাবু ফিল ফিকহি ওয়াত্ তাসাওউফ।

২৩. ইদরাবে মুসতাফীযাহ্ ও

২৪. সালাতুশ শরীফ।[৮২৪]

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর আরও অনেক কিতাব ছিল যা বাগদাদে ৬৫৬ হিজরীতে মোঙ্গলদের আক্রমনের ফলে চিরতরে হারিয়ে যায়।[৮২৫] তাই তাঁর যেসব বইয়ের একাধিক কপি বাগদাদের বাইরে ছিল, কেবল সেগুলোই বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ইন্তেকাল

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) হিজরী ৫৬১ সালের রবিউল আউয়্যাল মাসে কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলেন। দিনে দিনে তাঁর শরীর অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়ল। রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর শত চেষ্টায়ও তা ভাল হল না। বরং দিন দিন তা বেড়ে যেতে থাকল। তাঁর বিদায়ের করুণ সুর যেন অলক্ষ্যে থেকে থেকে বাঁজতে লাগল। পরবর্তী রবিউসসানী মাসের প্রথম শুক্রবার হতে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন।[৮২৬]

---

৮২৪. এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ, *ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর অবদান*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, প্রাগুক্ত, ৭৬-৭৭।

৮২৫. তাকিউদ্দিন ইবন তাইমিয়্যা আল হাররানী, *রিসালাতু শারহু কালিমাতি মিন ফুতুহুল গায়ব*, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত (ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ৩২।

৮২৬. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর জীবন সায়াহ্নের চরম মুহূর্ত আসন্ন হয়ে পড়ল। তাঁর চোখে-মুখে অদৃশ্য জগতের নূরানী লীলা খেলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠতে লাগল। তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট সন্তানদেরকে বললেন– আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমি বাহ্যত তোমাদের সাথে থাকলেও অপ্রকাশ্যে অন্যের সাথে রয়েছি। আমার কাছে তোমরা ছাড়াও আরো বহু লোক (ফেরেশতা) রয়েছে। তাদের জন্য জায়গা খালি করে দাও এবং তাদের সঙ্গে আদব রক্ষা কর। এখানে বিরাট রহমত নাযিল হচ্ছে। তার জন্য জায়গা সংকীর্ণ করো না। তিনি বারবার বলছিলেন- তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত (নাযিল) হোক। আল্লাহ আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমার ও তোমাদের তওবাহ্ কবূল করুন।[৮২৭]

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর রূহ মোবারক উর্ধ্বজগতের দিকে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে তিনি নতুনভাবে গোসল করলেন। এশার নামাজ আদায় করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে রইলেন। তিনি সকলের জন্য দোয়া করলেন এবং কয়েকবার পাঠ করলেন –"ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতি রহম করুন।[৮২৮] তারপর সিজদা হতে মাথা তুলে তিনি পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারন করলেন, "আমি সেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করছি যিনি ছাড়া আর কেউই উপাস্য নেই, তিনি নির্ভয়দাতা ও চিরঞ্জীব। বান্দাগণকে মৃত্যু দান করতে তিনি ক্ষমতাবান। আমি তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রিয় রাসূল।"[৮২৯] তিনি তিনবার–আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! বললেন। এরপর তাঁর আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যায়, জিহবা তালুর সঙ্গে লেগে যায় এবং তাঁর

---

৮২৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

৮২৮. ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, *আব্দুল কাদির জিলানী* (বৈরুত : দারুল জিল, ২০০১), পৃ. ৬৬।

৮২৯. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

রূহ মুবারক মহালোকে যাত্রা করে। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) ৫৬১ হিজরী সনের ১১ই রবিউসসানী ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৮৩০] আবার কারো মতে তিনি ৫৬১ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৮৩১] আবার কেউ বলেছেন, তিনি ৫৬১ হিজরীর ১১ রবিউসসানী, মতান্তরে ৯ অথবা ১০ অথবা ১৭ রবিউসসানী সোমবার প্রভাতে ইন্তেকাল করেন।[৮৩২] সমগ্র মুসলিম এবং অমুসলিম দেশসমূহে তাঁর ভক্তবৃন্দ ১১ রবিউসসানীকেই তাঁর ইন্তেকালের তারিখ মেনে তাঁর বার্ষিক ওরস শরীফ উদযাপন করে থাকেন।

মুহূর্তের মধ্যে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক তাঁকে একবার দেখার জন্য আসতে লাগল। রাস্তা–ঘাট, বাড়ী–ঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ল। অত্যাধিক লোক সমাগমের জন্য দিনের বেলা তাঁকে দাফন করা সম্ভব হল না। তাঁর ছেলে আবদুল ওহাব (র.) জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। পরিবারের সদস্যরা রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করেন।[৮৩৩] তাঁর মাদ্রাসার চত্বরে তাঁকে দাফন করা হয়। বাগদাদ শহরে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর মাযার শরীফ আজও বিদ্যমান রয়েছে।

---

৮৩০. মাওলানা নূরুর রহমান, *গাওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০১১), পৃ. ১৬৬।

৮৩১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৮৩২. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৮৩৩. চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, *আমার পীর হযরত গওসল আজম (র.)* (ঢাকা : পাবলিকেশন্স, ১৯৯০), পৃ. ১০৫।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.)

জন্ম ও বংশ

ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের পাতিয়ালা রাজ্যের ওমরগড় নিজামাতের অধীন সিরহিন্দ শরীফে হিজরী ৯৭১ সনের ১৪ শাওয়াল জুম্মার রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৩৪] তাঁর নাম রাখা হয় আহমদ। তাঁর কুনিয়াত আবুল বারাকাত, তাঁর উপাধি বদরুদ্দীন অর্থাৎ ধর্মের পূর্ণচন্দ্র আর মুজাদ্দিদ তাঁর যুগোচিত পদবী। তাঁর পিতার নাম শেখ আব্দুল আহাদ (র.)।[৮৩৫]

হযরত মুজাদ্দিদ আফফে সানী (র.) এর জন্মস্থান ও হেদায়েতের কেন্দ্র সিরহিন্দ শব্দটি 'সিহেরেন্দ' শব্দের অপভ্রংশ। 'সিহেরেন্দ' শব্দের অর্থ ব্যাঘ্রের আবাস। স্থানটি প্রথম দিকে দুর্গম জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রের আবাসভূমি ছিল বলে সম্ভবত এর নাম সিরহিন্দ হয়। পাঠান সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে এই স্থানটি আবাদ হয়।[৮৩৬] সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সৈন্যদলে একজন কামেল ওলী ছিলেন। তিনি কাশফের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, এই স্থানে এমন একজন ওলী আল্লাহর আবির্ভাব হবে, যিনি হবেন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যাবতীয় উম্মতের মধ্যে অতুলনীয়। তিনি এই কথা সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলককে জানান। সুলতান সেই সময় ঐ স্থানে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দেন। সে অনুযায়ী হিজরী ৭৬০ সনে সেখানে একটি নগর পত্তন করা হয়। পরবর্তীকালে এই শহর ১২ মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[৮৩৭]

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) বংশগত দিক দিয়ে ফারুকী। তাঁর বংশধারা উর্ধ্বতন ৩১ মাধ্যমে আমীরুল মু'মিনীন ফারূক-ই-আজম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) পর্যন্ত

---

৮৩৪. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ২০০১), পৃ. ২৫।

৮৩৫. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০১০), পৃ. ১১১।

৮৩৬. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৮৩৭. মাওলানা মো: তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

গিয়ে পৌছে।[৮৩৮] হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ফারূক (রা.) একজন বড় মাপের সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত ইমান হুসাই (রা.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (র.) কে বিয়ে করেন। তাঁদের বংশই হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) পর্যন্ত পৌছিয়েছে। এজন্যই আবু জাফর মুহাদ্দিস (র.) এর মতে তাঁর সন্তানগণ 'সৈয়দ'।[৮৩৯] হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর বংশতালিকা নিম্নরূপ :

হযরত আমীরুল মু'মিনীল ওমর ফারুক (রা.)
হযরত শেখ আব্দুল্লাহ (রা.)
হযরত শেখ আছেম (র.)
হযরত শেখ হাফ্ছ (র.)
হযরত শেখ ওমর (র.)
হযরত শেখ আব্দুল্লাহ (র.)
হযরত শেখ নাসের ওরফে আদহাম (র.)
হযরত শেখ ইব্রাহীম বিন আদহাম (র.)
হযরত শেখ ইসহাক (র.)
হযরত শেখ আবুল ফত্হে (র.)
হযরত শেখ আব্দুল্লাহ ওয়ায়েজে আকবর (র.)
হযরত শেখ আব্দুল্লাহ ওয়ায়েজে আছগর (র.)
হযরত শেখ মাসউদ (র.)
হযরত শেখ সোলাইমান (র.)
হযরত শেখ মাহমুদ (র.)
হযরত শেখ নাছীরুদ্দীন (র.)
হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন ওরফে ফররুখ শাহ কাবুলী (র.)
হযরত শেখ ইউসুফ (র.)

---

৮৩৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৮৭-৮৮।

৮৩৯. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

হযরত শেখ আহমদ (র.)

হযরত শেখ শোয়াইব (র.)

হযরত শেখ আব্দুল্লাহ (র.)

হযরত শেখ ইসহাক (র.)

হযরত শেখ ইউসুফ (র.)

হযরত শেখ সুলাইমান (র.)

হযরত শেখ নাছীরুদ্দীন (র.)

হযরত শেখ ইমাম রফীউদ্দীন (র.)

হযরত শেখ হাবীবুল্লাহ (র.)

হযরত শেখ মুহাম্মদ (র.)

হযরত শেখ আব্দুল হাই (র.)

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন (র.)

হযরত শেখ মাখদুম আব্দুল আহাদ (র.)

হযরত শেখ ইমানে রব্বানী কাইউমে জামানী আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন শেখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.)।[৮৪০]

শৈশবকাল

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) মাতৃগর্ভ হতেই ওলী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য শৈশব ও বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল, যা অন্য সাধারণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শৈশব ও বাল্যকালের অনেক গুন তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি খাতনাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কোনদিন বিছানায় বা মায়ের কাপড়ে প্রস্রাব-পায়খানা করেন নাই। প্রস্রাব-পায়খানা করার প্রয়োজন হলেই তিনি খুব ছটফট করতেন যা দেখে তাঁর মা বুঝতে পারতেন তঁর প্রয়োজনীয়তা। তিনি কখনও উলঙ্গ দেহে থাকতেন না। কখনও তাঁর দেহ অনাবৃত হয়ে পড়লে, তিনি নিজেই কাপড় টেনে ছতর ঢেকে নিতেন।[৮৪১] অন্যান্য

---

৮৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

৮৪১. মাওলানা মো: তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

ছেলেদের মত তিনি ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতেন না। তিনি সব সময় হাসিমুখে থাকতেন। দুধ পান করাবার মধ্যে যদি কোন গাফলতি হত তাহলেও তিনি কান্নাকাটি করতেন না। তাঁর চালচলনের মধ্যে বিশিষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হত।[৮৪২]

শৈশবে তিনি একবার কঠিন রোগে ভোগার কারণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর পিতা পুত্রের জন্য খুব ঘাবড়ে যান। সেই সময় হঠাৎ একদিন হযরত শাহ কামাল (র.) সরহিন্দে আগমন করেন। সংবাদ পেয়ে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর পিতা তাঁকে নিয়ে শাহ শাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং পুত্রের রোগমুক্তির জ্য দো'আ করতে আবেদন জানালেন। হযরত কুতবুল আক্তাব শিশুর প্রতি দৃষ্টি করা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এই শিশুটি এ যুগে উম্মতে মুহাম্মাদী (স.) এর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর তা'যীমের জন্যই আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। এই বলে তিনি নিজের জিহ্বা শিশুর মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখলেন। তিনি বললেন, আমি কাদেরিয়া তরিকার সমুদয় বরকত এই শিশুকে দান করলাম। দেখতে দেখতে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেন।[৮৪৩]

শিক্ষা জীবন

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে তিনি কালামুল্লাহ শরীফ মুখস্ত করতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র কুরআন মজীদ মুখস্ত করেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট এবং কিছু কিছু সরহিন্দের অন্যান্য আলেমের নিকট অধ্যয়ন করেন। সাধারণ পাঠ্যপুস্তক ও তাসাউফ সংক্রান্ত কিতাব সমূহ যথা আওয়ারিফুল মা'আরিফ, ফুসুলুল হিকাম ইত্যাদি পিতার নিকট পড়েন।[৮৪৪] পিতার নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য লাহোর ও শিয়ালকোটে যান। শিয়ালকোটে তিনি মাওলানা কামাল উদ্দিন কাশ্মীরী ও

---

৮৪২. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৮৪৩. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৮৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৯), পৃ. ২।

মাওলানা ইয়াকুব কাশ্মীরীর মত বিখ্যাত শিক্ষকগণের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন।[৮৪৫] তিনি মাওলানা কামালউদ্দিন কাশ্মিরীর নিকট হতে আজুদী প্রভৃতি কঠিন কিতাবাদি ও আসানির সাথে ইলমে মানতেকের কঠিন কিতাবাদি অতিশয় তাহকীক সহকারে আয়ত্ত করেন। তিনি মাওলানা ইয়াকুব কাশ্মিরীকে হাদীসের কিতাবাদি শুনিয়ে হাদীসের সনদ ও কাবরবিয়া–সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার এজাযত হাসিল করেন।[৮৪৬] হযরত মাওলানা কারী বাহলুল বাদাখশানীর কাছে ইমাম ওয়াহেদী কৃত তাফসীরে 'বসীত ও অসীত,' আসবাবুন্নযূল, তাফসীর বায়জাভী, মিনহাজুল অসূল, 'আল-গায়াতুল কুসওয়া', সহীহ বুখারী শরীফ, আল-আদাবুল মুফরাদ, সুলসিয়াত, মিশকাত শরীফ ও শামায়েলে তিরমিযী অধ্যায়ন করেন।[৮৪৭] তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে ইলম হাসিল সমাপ্ত করেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) পার্থিব ও অপার্থিব এবং এ সবের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে শিক্ষা সমাপ্তির পর দরস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠন এর সূচনা করেন এবং আরবী ও ফারসীতে কিছু বই লেখেন।[৮৪৮] এই সময়ে দুই একবার তিনি তৎকালীন রাজধানী আকবরাবাদ (আগ্রা) গমন করেন এবং সেখানে আবুল ফজল ও ফৈজীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের সাথে বহু কিছু আলোচনা করে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করেন। কেননা এই দুই ব্যক্তি বাদশাহ আকবরের ফেতনার নায়কগণের অন্যতম। পরবর্তীতে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮৪৯]

তরীকত শিক্ষা

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) মাত্র সতের বছর বয়সে পার্থিব শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমে তিনি সম্মানিত পিতার

৮৪৫. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

৮৪৬. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৮৪৭. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৮৪৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৮৪৯. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

নিকট চিশতিয়া তরীকায় বায়াত হন এবং এর চলার স্তর সম্পন্ন করেন। পুনরায় কাদেরী তরীকায় সাধনার কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর পথ প্রদর্শক ও মুর্শিদ ছিলেন তাঁর পিতা নিজে। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব কিবরুইয়াহ পরস্পরার সেকালের একজন প্রসিদ্ধ অলী ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) তার থেকে কিবরুইয়াহ তরীকাও লাভ করেন।[৮৫০] তিনি ইবাদত ও রিয়াজতে মশগুল হয়ে তাঁর পিতার নিকট হতে পনরটি সিলসিলায় খেলাফত প্রাপ্ত হন। শরা-শরীয়ত ও মারিফাত বিশারদ নিজ পিতা হযরত মাখদুম আব্দুল আহাদ (র.) হতে তিনি বিশিষ্ট ইলমে তা'লীম প্রাপ্ত হন এবং খাস করে তাসাউফের কিতাবাদি, 'আওয়ারেফুল মায়া'রিফ', 'ফছুছুল হেকাম' শিক্ষা করেন। তিনি নিসবতে ফরদিয়ত ও ইবাদাতে নাফেলা আদায় করার তওফীকও হাসিল করেন।[৮৫১]

পিতার ইন্তেকালের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) ১০০৮ হিজরীতে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায়ের মানসে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সরহিন্দ থেকে যাত্রা শুরু করে দিল্লি পৌছেন। দিল্লীর উলামা ও ফুযালা-ই-কিরাম যাঁদের কানে তাঁর বুযুর্গী ও কামালিয়াতের খ্যাতি পূর্বেই পৌছেছিল– তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগম করেন। তাদের মধ্যে মাওলানা হাসান কাশ্মীরীও ছিলেন যাঁর সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। আলাপচারিতার সময় তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহর উচ্চ মর্তবা ও আধ্যাত্মিক শক্তির উল্লেখ করেন। যিনি কিছু দিন আগেই মাত্র দিল্লী এসেছেন।[৮৫২] মাওলানা হাসানের মুখে নকশবন্দী তরীকার একজন কামেল পীরের আলোচনা শোনা মাত্রই মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) কাল বিলম্ব না করে খাজা সাহেবের খিদমতে হাযির হন। খাজা সাহেব তার সাধারণ অভ্যাসের খেলাফ মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সাধে অধিক সৌজন্য ও হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং আরো দুই-চার সপ্তাহ

---

৮৫০. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৮৫১. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৮৫২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

দিল্লীতে অবস্থান করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) আড়াই মাস দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং এই আড়াই মাসে তাঁর বিশুদ্ধ আত্মা স্বর্ণের রূপ ধারণ করে। তিনি নকশবন্দীয়ার নিসবাত পরিপূর্ণভাবে লাভ করে তখনকার মত বিদায় নিলেন। তারপর তিনি আরো দুইবার দিল্লী আগমন করেন এবং খাজা বাকীবিল্লাহ (র.) এর দরবারে হাযির হন।[৮৫৩] অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নকশবন্দীয়া তরীকায় অসাধারণ উন্নতি লাভে সমর্থ হন। অত্যন্ত সফলতার সাথে তরীকার মাকামসমূহ অতিক্রম করে নিসবত লাভ করেন এবং খাজা বাকীবিল্লাহ (র.) এর নিকট থেকে রুখসত লাভ করেন। তরীকার শিক্ষায় তাঁর অসাধারণ দখল দেখে খাজা বাকীবিল্লাহ (র.) তাঁকে তরীকার খিলাফত ও খিরকা দান করেন। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে তিনি অন্যান্য শিষ্যর কাছে গর্ব করে বলতেন যে– "শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর হাতে তরীকা নকশবন্দীয়া খিলাফতরূপ আমানত সোপর্দ করতে পেরে আমি দায়মুক্ত হয়েছি।"[৮৫৪] খাজা বাকিবিল্লাহ (র.) তাঁর এক পত্রে শেখ আহমদ (র.) সম্পর্কে লিখেন, "সিরহিন্দে শেখ আহমদ নামে এক ব্যক্তি আছে, যার জ্ঞানের কোন পরিধি নেই এবং তার ইচ্ছাশক্তি বিপুল। কিছুদিন সে আমার সাথে ছিল। তার আচার ব্যবহার ও দিন যাপনের অদ্ভুত ধারা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি আশা করি সে নিজেকে এমন এক আলো হিসেবে প্রমাণ করবে যা গোটা বিশ্বকে আলোকিত করবে। সে নিঃসন্দেহে সুফীবাদ ও আধ্যাত্মবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে যে কারণে আমি এসব লিখছি।"[৮৫৫]

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র.) স্বীয় হাসিলকৃত সমুদয় বাতেনী নিয়ামত ও নিসবতে কামালী হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.) কে দান করেন এবং ইরশাদের ঝাণ্ডা তাঁর শির মোবারকে উত্তোলন করে সমস্ত খলিফার হেদায়েত ও মুরিদগণের তরবীয়ত তাঁর উপর

---

৮৫৩. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৮৫৪. মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *মুজাদ্দিদ ই আলফেসানী (র.) এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি* (ঢাকা : হেযবুল্লাহ লাইব্রেরী, ১৯৭৯), পৃ. ৫২।

৮৫৫. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

সোপর্দ করেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বদেশ ভূমি সিরহিন্দ শরীফে রোক্ছত করেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি সালেকগণের তা'লীম ও তরবীয়তের মধ্যে মশগুল থাকেন।[৮৫৬]

মুজাদ্দিদ আলফে সানী উপাধি লাভ

"মুজাদ্দিদ আলফে সানী" অর্থ হিজরী "দ্বিতীয় হাজারের সংস্কারক।"[৮৫৭] মানুষ যখন ধর্ম বিমুখ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করে, যখন জাতীয় জীবন হতে সৎ, আদর্শ ও নৈতিকতা লোপ পেয়ে যায়, তখন তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য কোন মহা পুরুষের আবির্ভাব হয় –এটাই চিরন্তন রীতি। নবুয়তের ধারা জারী থাকা পর্যন্ত যুগে যুগে নবী ও রাসুলের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে নবী চরিত্রের যাবতীয় গুণের অধিকারী নায়েবে নবীগণের উপর সেই মহান দায়িত্ব ন্যস্ত হতে থাকে। নবুয়াত ও মুজাদ্দিদিয়াত (সংস্কারক) এই উভয় পদের মনোনয়ন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হতেই হয়ে থাকে। এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, নবুয়ত হচ্ছে মূলবৃক্ষ এবং মুজাদ্দিদিয়াত হল এর প্রতিবিম্ব।[৮৫৮]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর প্রচারিত শরীয়তকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাযতের ব্যবস্থাদিও যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়েছে এবং উম্মতগণকে এই ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত করে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ হওয়াও এই ব্যবস্থাগুলির অন্যতম। হাদীসে বর্ণিত আছে –"নিশ্চয়ই আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি দ্বীনের 'তাজদীদ' বা সংস্কার সাধন করবেন।"[৮৫৯]

---

৮৫৬. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৮৫৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব* (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ৫০।

৮৫৮. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৮৫৯. ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.) মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল হক, *সহীহ আবু দাউদ শরীফ, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যয়*, হাদীস নং- ৪২৪৩ (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০০৮), পৃ. ৯১৬।

মুজাদ্দিদ সম্পর্কে এই মুখবন্ধের পরে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর পূর্বে সাধারণত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হতেন কিন্তু হাজার বছরের মুজাদ্দিন কেউ হন নাই। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর পূর্বের মুজাদ্দিগণ কেউই দীনের সকল শাখা-প্রশাখায় মুজাদ্দিদ হন নাই বরং তাঁরা বিশেষ বিশেষ শাখার মুজাদ্দিদ হতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) কে দীনের সকল বিভাগের মুজাদ্দিদিয়াত দান করে এক বিশিষ্ট মাকামে উন্নীত করেছেন। এর সারাংশ এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগণের সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (স.) এর খাসখাস বিষয়ের মধ্যে নায়েবী হাসিল ছিল। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে নায়েবী হাসিল ছিল। এই দুই প্রকার নায়েবীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাঁর পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগণের খিদমতের প্রভাব মাত্র এক শতাব্দীর জন্য এবং তাঁর মুজাদ্দিদীয়াত এক হাজার বছরের জন্য।[৮৬০]

একথা স্পষ্ট যে, সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ হওয়ার সম্পর্ক শুধুমাত্র ইবাদত, সাধনা এবং সুন্দর আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বনের সাথে নয়, বরং যে সব কর্ম সাধনার মাধ্যমে সংস্কারক হওয়ার গৌরব অর্জন করা সম্ভব তা এর থেকে ভিন্নতর। এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) বলেন –"আমাকে সৃষ্টি করার সাথে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে তা সত্বেও আমার উপর এক বিরাট কারখানা ন্যস্ত করা হয়েছে। পীর মুরীদী করবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি। সালেকীনদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং ইরশাদ–তালকীন করাই আমাকে সৃষ্টি করার লক্ষ্য নয়, এটা ভিন্নতর জিনিস এবং স্বতন্ত্র কারকানা। যে কারখানার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে তার তুলনায় ইরশাদ–তালকীনের কাজ পথে পড়া একটি সাধারণ বস্তু তুল্য।"[৮৬১]

---

৮৬০. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৮৬১. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

হিজরী ১০১০ সনের ১০ রবিউল আউয়াল শুক্রবার ফজরের নামাজ অন্তে যখন হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) হালকায়ে জিকিরে রত ছিলেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) অতি সুন্দর ও বহু মুল্যবান একটা জুব্বা নিয়ে এসে নিজে হাতে তাঁকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এটাই আলফে সানীর মুজাদ্দিদের যোগ্য পোশাক।" এই ঘটনার পর হতেই তিনি মুজাদ্দিদ আলফে সানী উপাধিতে ভূষিত হলেন।[৮৬২]

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তিনি শুধু শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন না– বরং সহস্রাব্দেরই মুজাদ্দিদ ছিলেন। যে ফেৎনা ফেসাদ পূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তিনি বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে ভারত বর্ষের তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন ধারার সংস্কার সাধনের ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁকে শত বছরের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে হাজার বছরের সংস্কাররূপে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিল।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সংগ্রাম

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে ভারতে ইসলামের সম্প্রসারণ এক নাজুক অবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং ইসলামের বিধি-বিধান প্রকাশ্যে লংঘন করা হতে থাকে। সম্রাট আকবর স্বয়ং ধর্মহীন সভাসদ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তারা হিন্দু ধর্মের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন। তাদেরই উৎসাহে আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহীকে' রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন যা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।[৮৬৩] অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাদের ধর্মের আংশিক বিধান পালনে কোন ক্ষতি না হলেও ইসলামে এমন চিন্তাও করা যায় না। কেননা ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের সাধ্য নেই এতে কোন কিছু সংযোজন করা বা বিয়োজন করা। অথচ আকবর ভয়ংকর ধৃষ্টতায় এ কাজটিই করেছিলেন। তার নবপ্রবর্তিত ধর্মে যে সকল বিধান প্রচলন করা হয় সেগুলো হল :

---

৮৬২. মাওলানা মো: তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৮৬৩. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

১. সূর্য, নক্ষত্র, আগুন, পানি, গাছপালা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিষয়াবলী এবং গুরু পূজার ব্যবস্থা রাখা হয়।

২. সাধারণভাবে দাঁড়ি রাখা এবং গরু যবেহ নিষেধ করা হয়।

৩. আখিরাতের জীবনের পরিবর্তে পূনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়।

৪. সুদ ও জুয়াকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।

৫. একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়।

৬. জানাবাতের গোসল রহিত করা হয়।

৭. নিকাহ মুতআর বৈধতা দেওয়া হয়।

৮. উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদির গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়।

৯. বাঘ, ভাল্লুকের গোশত হালাল ঘোষণা করা হয়।

১০. বারো বছরের আগে খাতনা করা নিষিদ্ধ এবং এরপরে খাতনা করাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা করা হয়।

১১. মৃতদেহ কবরস্থ করা বা শ্মশানে পোড়ানোর পরিবর্তে ইট বা পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। পানি না পাওয়া গেলে জ্বালিয়ে দেয়া অথবা পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে দাফন করার বিধান রাখা হয়।

১২. দেখা হলে আসসালামু আলাইকুম এর পরিবর্তে 'আল্লাহ আকবর' এবং জবাবে ওয়া আলাইকুমুস সালাম এর পরিবর্তে 'জাল্লাজালালুহু' বলার বিধান রাখা হয়।

১৩. নির্দিষ্ট দিনে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়।

১৪. রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান চালু করা হয়।[৮৬৪]

আকবরের নীতি ও জীবন পদ্ধতি ইসলামী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিকাশের জন্য ধ্বংসাত্মক। তার আমলে ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্য থেকে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়। অর্থ দিয়ে অথবা বলপূর্বক সকল বিরোধীতা দমিয়ে রাখা হয়। গোটা পরিস্থিতি একজন সংস্কারের আবির্ভাবের জন্য ছিল উপযুক্ত। যে মহান সংস্কারক এই লক্ষ্য

৮৬৪. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ২৩৬।

নিয়ে আবির্ভূত হলেন তিনি শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র.)। তিনি দৃঢ়তার সাথে সম্রাট আকবরকে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ও নিরলস প্রচেষ্টার সাহায্যে তিনি আবার ইসলামকে ভারত ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে ইসলামের সাক্ষ্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র.) এর নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে এই পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়।[৮৬৫]

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) ইসলাম প্রচার ও সুন্নতের প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশের সর্বত্র স্বীয় মুরীদগণকে পত্রের মাধ্যমে তাগিদ করতে লাগলেন এবং নিজেও এ বিষয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। আকবরের নতুন ধর্ম প্রচারে যারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর প্রতি আগে থেকেই চটে ছিল। আকবরের মৃত্যুর পর তার পূত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হলে তারা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারনা চালিয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল।[৮৬৬] সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) কে পত্রের দ্বারা শাহী দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে গমন করেন, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী হওয়ায় সম্রাটকে কুর্ণিশ করেননি। সম্রাট এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আমি অদ্যাবধি আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (স.) নির্দেশিত আদব-কায়দা ও নির্দেশ অনুসরণ করে আসছি। এর বহির্ভূত অন্য কোন আদব ও রীতিনীতির সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিজদা করতে বলেন। উত্তরে শায়খ বলেন, আল্লাহ ভিন্ন কাউকে যেমন কখনও সিজদা করিনি, কখনও করবোও না। সম্রাট এতে আরও অসন্তুষ্ট হন এবং গোয়ালিয়র দূর্গে তাঁকে নজরবন্দী করার নির্দেশ দেন। গ্রেফতারের পর তাঁর ঘর বাড়ী, কুয়া, বাগান ও কিতাবাদি সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।[৮৬৭]

---

৮৬৫. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

৮৬৬. মাওলানা মো: তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

৮৬৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) যখন গোয়ালিয়ার দূর্গে পৌঁছলেন, তখন সেখানে কয়েক হাজার অমুসলিম কয়েদীও ছিল। তিনি সেখানে তাবলীগ করে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন এবং শত শত লোককে মুরীদ করে বিলায়েতের স্তরে পৌছিয়ে দিলেন।[৮৬৮] শেখ আহমদের নিঃসঙ্গ কারাবাস ছিল আল্লাহর রহমত স্বরূপ। জনৈক মীর মোহাম্মদ নোমানের কাছে লেখা পত্রে তিনি নিজে একথা স্বীকার করেছেন যে, কারাগারে থাকাকালে ধ্যানমগ্ন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং এর ফলে তাঁর মাঝে অন্যান্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছে।[৮৬৯] মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর শেষ পর্যন্ত তার ভুল উপলব্ধি করে শেখ আহমদ সিরহিন্দী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) কে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে আহ্বান করেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আরোপ করেন :

১. সিজদায়ে তাযিমী বন্ধ করতে হবে।
২. বন্ধ করে দেওয়া মসজিদসমূহ চালু করতে হবে।
৩. গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করার সরকারি আদেশ বাতিল করতে হবে।
৪. কাযী, মুফতী, মুহতাসিব প্রভৃতি শরঈ পদসমূহ পূণপ্রবর্তন করতে হবে।
৫. জিযিয়া কর পূনপ্রবর্তন করতে হবে।
৬. বিদআতী তরীকা বন্ধ করে সুন্নতী তরীকা চালু করতে হবে।
৭. রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সম্রাট তাঁর শর্তাবলী মেনে নিলেন। সাথে সাথে গোটা সম্রাজ্যে শাহী ফরমান জারী করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হল। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) রাজদরবারে এসে পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান ভাষণ দিলেন। এতে সম্রাট সহ সভাষদ সকলের মধ্যে ভাবান্তর হল। তারা অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে তওবা করলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন।[৮৭০]

---

৮৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৮৬৯. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

৮৭০. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ২৩৭-২৩৮।

শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র.) তাঁর গোটা জীবন পরিশ্রম করেছেন ইসলামী শরীয়তকে যথাযথরূপে ভারতীয় মুসলমানদের জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থাপিত করার জন্য। তিনি যা প্রচার করেছেন তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে প্রতিপালন করেছেন। ক্ষমতার কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। তাঁর মত বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংস্কারক ভারতে আর আবির্ভূত হয়নি। তিনি শরীয়তের বিধান পুরোপুরি কায়েমের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন।[৮৭১]

বিবাহ

তৎকালে থানেশ্বরের শাসনকর্তা ছিলেন শেখ সুলতান। তিনি দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ হতে থানেশ্বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেযুগের অন্যতম আলিম ও ফাযেল। তিনি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাকে বলছেন- "হে সুলতান! তোমার কন্যাকে শেখ আহমদ সিরহিন্দীর সাথে বিবাহ দাও।" এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি খুবই অধীর হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি শেখ আহমদ সিরহিন্দীকে চিনতেন না। এর কিছুদিন পর তিনি আবার সেই একই স্বপ্ন দেখেন। এবার তাকে শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র.) এর অবিকল প্রতিকৃতি ও দেখান হল। এর কয়েকদিন পরেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) বিশেষ কাজে থানেশ্বর গেলেন এবং ঘটনাক্রমে থানেশ্বরের শাসনকর্তা শেখ সুলতানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শেখ সুলতান তাঁকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর কাছে স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) নিজেও এলহামের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হতে এইরূপ নির্দেশ আগেই লাভ করেছিলেন। তাই সুলতানের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হল। তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন মহাবিদূষী, পরমা ধার্মিকা ও পরমা পুণ্যবতী।[৮৭২] এই বিবাহ দ্বারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়। তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য সিরহিন্দ

---

৮৭১. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

৮৭২. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

শরীফে একখানি নতুন হাবেলী নির্মাণ করেন।[৮৭৩] বিবাহ উপলক্ষে তাঁর স্ত্রী যে অর্থ পেয়েছিলেন তা দিয়ে তিনি একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮৭৪]

সন্তান

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) কে সাত পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান দান করছিলেন।[৮৭৫]

পুত্রগণ

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাদেক (র.) : তিনি জন্মগতভাবে অলী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর জীবীত অবস্থায় হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। অল্প বয়সেই তিনি বেলায়েতের সর্বস্তর অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও সৎ প্রকৃতির জন্য গর্ব করতেন। যেহেতু তাঁকে সিরহিন্দে দাফন করা হয়েছিল, এজন্য হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) সিরহিন্দকে পবিত্র আবাস ভূমি বলতেন।[৮৭৬]

২. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ওরফে খাযীনাতুর রহমাত (র.) : তিনি ১০০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সিলসিলার প্রচার, ভক্ত মুরীদ ও অনুরক্ত শাগরিদদের তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদানে তিনি ব্যাপক অংশ নেন।[৮৭৭]

৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সুম : তাঁর উপাধি ছিল 'উরওয়াতুল উসকা'। তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতার ইলম এর ধারক-বাহক, ভাষ্যকার, গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার, বিশ্বস্ত রক্ষক, খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে মুজাদ্দিদিয়া তরীকা এর তালীম ও তাছীর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীর বিখ্যাত খানকাহ যা আরব-আজমের আধ্যাত্মিক ধারার প্রাণকেন্দ্র

---

৮৭৩. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৮৭৪. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

৮৭৫. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

৮৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৮৭৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

তাঁরই সিলসিলার ছিল। তিনি ১০০৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৮৭৮]

৪. হযরত মুহাম্মদ ইয়াহইয়া : হযরত মুজাদ্দিদ আলসে ফানী (র.) এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। তিনি বুযুর্গ ভাইদের কাছ থেকেই ইলম হাসিল করেন এবং তরীকতে কামালিয়াত লাভ করেন। ১০৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৮৭৯]

৫. মুহাম্মদ ফররুখ : ১৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬. মুহাম্মদ আশরাফ : মাতৃদুগ্ধ পান করা কালেই তার মৃত্যু হয়।

৭. মুহাম্মদ ঈসা : ৮ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।[৮৮০]

কন্যাগণ

১. খাদীজা বানু।

২. উম্মে কুলসুম

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর এই দুই কন্যাই শৈশবে ইন্তেকাল করে।[৮৮১]

চরিত্র ও গুণাবলী

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর শরীরের আকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের। উজ্জ্বল মুখাবয়ব সাদা মিশ্রিত গন্দমী রং। তাঁর ললাট ছিল প্রসস্ত। ঘন দাঁড়ী, বড় বড় চোখ, বেলায়েতের নূরে তিনি ছিলেন জ্যোতিস্মান। তাঁর সৌন্দর্য ও লাবণ্যের সাথে মিশ্রিত ভয় ভীতির নিদর্শন যে কেউ অবলোকন করলে, আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলে অবিভূত হয়ে আনায়াসেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেকীন।[৮৮২] তাঁর মুখমণ্ডল মধ্যম গোলাকৃতি ও ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল এবং দাঁতগুলি মিলিত সুদর্শন ছিল। তাঁর হাতের আঙ্গুলিগুলি সরু ও লম্বা ছিল এবং আঙ্গুলির নখগুলি কাঁচের মত স্বচ্ছ ছিল। তাঁর

---

৮৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

৮৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৮৮০. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৮৮১. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

৮৮২. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

পা ছিল হালকা ও লম্বা। তিনি মাথায় সব সময় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। তিনি একটি মেছওয়াক সর্বক্ষন সঙ্গে রাখতেন এবং প্রত্যেকবার ওজু করার আগে মেছওয়াক করতেন। অন্য সময়ে খুব সাধারণ পোষাক ব্যবহার করলেও জুমা ও দুই ঈদের দিনে তিনি মূল্যবান পোশাক পরতেন।[৮৮৩]

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) ছিলেন বড়ই সহিষ্ণু, দানবীর, শরীফ বিনয়ী ও ভদ্র, দাতা চিন্তাশীল, উত্তম তদবীরকারী, মেধাবী, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। তাঁর কথাবার্তা ছিল খুবই সুমিষ্ট বিশিষ্ট, বিনয়ে পরিপূর্ণ ও ভদ্র সমুচিত এবং চরিত্র ছিল স্বচ্ছ, সরল ও আত্মসম্মানবোধে পূর্ণ। তিনি নিজের বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হতেন না। অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষিতার বিষয়ে তাঁর অবস্থা এরকম ছিল যে, জাহাঙ্গীরের মত প্রতাপশালী সম্রাট তাঁর মুরিদ হওয়া স্বত্বেও বাদশাহের কাছ থেকে নিজ সুবিধার খাতিরে কোন রকম অনুগ্রহ লাভের কোন উপায়ই তিনি করেন নাই এবং এ ধরনের কোনরূপ কল্পনাও তাঁর মনে উদয় হয় নাই।[৮৮৪]

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন। কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার ব্যবহার, আহার-নিদ্রা, এবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সুন্নতের পুরাপুরি অনুসরণ করে চলতেন। সুন্নত তরিকার বহির্ভূত কোন নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করার কথা তিনি কখনও কল্পনাও করতে পারতেন না।[৮৮৫] মোট কথা তিনি জীবনের প্রত্যেক ধাপের খুব সাধারণ ও মামুলী ধরনের ছোটখাট বিষয়গুলির মধ্যেও তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সুন্নতের তাহকীক ও তালাশীর পূর্ণ চেষ্টা করতেন।

---

৮৮৩. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮৮৪. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

৮৮৫. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

রচনাবলী

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) অনেক কিতাব ও রিসালা লিখেছেন। নিম্নে বিশেষ প্রসিদ্ধ কিছু কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **মকতুবাত শরীফ :** এটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সবচেয়ে বড় ইলমী সংস্কার ও পূর্ণজাগরণমূলক স্মারক এবং আল্লাহ প্রদত্ত কামালিয়াত, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ সূলভ তাহকীক ও মা'রিফাতের মকাম, তাঁর দিলের আবেগ ও হৃদয়ানুভূতির দর্পণ স্বরূপ যার উপর ভিত্তি করে তাঁকে 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী" তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ উপাধি প্রদান করা হয়। এই পুস্তকটি ভারতবর্ষের একক রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত যার উপর বহিঃভারতের উন্নতমানের মনীষী বুযুর্গ ও গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেছেন। আরবী ও তুর্কী ভাষায় এর তরজমা হয়েছে।[৮৮৬] এই পুস্তক তাঁর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত খলিফাগণের কাছে লিখিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। মাকতুবাতের সাকুল্য সংখ্যা ৫৩৬। এটি তিনটি দফতর সম্বলিত।[৮৮৭] এই তিনটি খণ্ডের সামগ্রিকভাবে নাম 'মকতুবাত শরীফ' তবে প্রত্যেক খণ্ডের স্বতন্ত্র নাম আছে। নিম্নে মাকতুবাত শরীফ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ক. প্রথম দফতর : একে দুররুল মা'রেফাত অর্থাৎ মা'রেফাতের মুক্তা বলা হয়। এতে মোট ৩১৩টি মকতুব (পত্র) সংকলিত হয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর মুরিদ খাজা ইয়ার মুহাম্মদ জদীদ বদখশী তালেকানী এর সংগ্রহীতা।[৮৮৮]

---

৮৮৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১০।

৮৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

৮৮৮. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

খ. দ্বিতীয় দফতর : একে নূরুল খালায়েক অর্থাৎ সৃষ্টির আলো বলা হয়। এটা একটি ঐতিহাসিক নাম। এটা হিজরী ১০১৯ সনে সংকলিত হয় এবং নামের অক্ষরের সংখ্যার মান হতে ও সংকলনের তারিখ সূচক হিজরী সনটি নিরূপিত হয়। এতে মোট ৯৯টি মকতুবাত সংকলিত হয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর মুরিদ খাজা আবদুল হাই ইবনে খাজা চাকার হেছারী এর সংগ্রহীত।[৮৮৯]

গ. তৃতীয় দফতর : একে মা'রেফাতুল হাকায়েক অর্থাৎ হাকীকত দর্পণ বলা হয়। এতে ১২৪টি মকতুব সংকলিত হয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর মুরিদ ও খলীফা খাজা হাশেম কাশামী বোরহানপুরি এটার সংগৃহীতা। হিজরী ১০৩১ সনে তিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর সান্নিধ্যে থেকে এই মকতুবগুলি সংগ্রহ করেন।[৮৯০]

২. **ইছবাতু'ন নুবূওয়া (আরবী) :** হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, মুজাদ্দিদী খান্দানের পারিবারিক লাইব্রেরী ও কানকাহগুলোতে সুরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছিল। কুতুবখানা ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ, করাচী ১৩৮৩ হিজরীতে আসল আরবী মতন (মূলপাঠ) ও উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করে। এরপর ইদারায়ে সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে অন্যান্য পুস্তিকার সঙ্গে আসল মতন ছাড়াই উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করে।

৩. **রদ্দে রওয়াফিয :** পুস্তিকাটি কতক ইরানী শী'আ আলিম লিখিত পুস্তিকার জওয়াবে লিখিত। এটি সম্ভবত ১০০১ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে লিখিত। পুস্তিকার কিছু কিছু নিবন্ধ দফতর আওয়াল, মকতূব নং ১৮০ ও ২০২ এও পাওয়া যায়। পুস্তিকার ফারসী মতন মকতূবাত শরীফ ফারসীর শেষে বহু প্রকাশক প্রকাশ করেছেন।

---

৮৮৯. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

৮৯০. এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, *হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

৪. **রিসালায়ে তাহলীলিয়া (আরবী) :** পুস্তিকাটি হিজরী ১০১০ সনে সংকলিত হয়। এর কেবল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী থেকে ১৩৮৪ হিজরীতে আরবী মতন উর্দূ অনুবাদসহ এবং ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া, লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে কেবল আরবী মতন (মূলপাঠ) অপরাপর পুস্তিকাসহ প্রকাশ করে।

৫. **শরহে রুবা'ঈয়াত :** এতে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহর দু'টি রুবা'ঈর হযরত খাজার কলমে ব্যাখ্যা এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর কলমে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা লেখা। ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর এবং ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ করাচীর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে ১৩৮৫ হি. ও ১৩৮৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এই শরহে রুবাঈয়াত এর ব্যাখ্যা লিখেছেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী যা 'কাশফু'ল-গায়ন ফী শারহি রুবা'আতায়ন' নামে মাতবা' মুজতাবাঈ দিল্লী থেকে ১৩১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৬. **মা'আরিফে লাদুন্নিয়্যা (ফারসী) :** এটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.)-এর বিশেষ মা'আরিফ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসম্বলিত যা স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবই বিন্যস্ত করেছিলেন হিজরী ১০১৫ কিংবা ১০১৬ সনে। প্রতিটি নিবন্ধেরই নাম দিয়েছিলেন "মা'রিফাত"। এসব মা'রিফের সংখ্যা সর্বমোট ৪১টি। পুস্তিকাটির ফারসী মতন সর্বপ্রথম হাফিজ মুহাম্মদ আলী খান শওকত মাতবা'আহমদী, রামপুর থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করেন।

৭. **মাবদা ও মা'আদ (ফারসী) :** পুস্তিকাটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর ইলম ও মা'রিফাতের পরিচয় সম্বলিত। এর নিবন্ধনগুলো বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল যেগুলোকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর খলীফা মাওলানা সিদ্দীক কাশ্মী হিজরী ১০১৯ সনে সংকলিত ও বিন্যস্ত করেন এবং এর নিবন্ধনগুলোকে 'মিনহা' শিরোনামে পৃথক করে দেন। সংকলিত নিবন্ধের সংখ্যা

৬১টি। প্রকাশিত নুসখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ফারসী নুসখা মাতবায়ে আনসারী দিল্লী কর্তৃক ১৩০৭ হিজরীতে প্রকাশিত।

৮. **মুকাশিফাতে আয়নিয়া :** এটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর এমন পাণ্ডুলিপি সম্বলিত যা কোন কোন খলীফা হেফাজত করেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর ওফাতের পর মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হি. ১০৫১ সনে এটি বিন্যস্ত করেন। পুস্তিকাটি ১৩৮৪ হিজরীতে প্রথমবার ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী, ফারসী মতন উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশ করে।[৮৯১]

ইন্তেকাল

হিজরী ১০৩২ সনে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) আজমীর শরীফে থাকাকালে একদিন তিনি তাঁর উপস্থিত মুরীদানকে লক্ষ্য করে বললেন, ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আমার পরপারে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ইন্তেকালের বছরখানিক আগে হতেই তিনি কঠিন ও দূরারোগ্য হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। মাঝে মাঝে রোগ বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ সাত দিন যাবত তিনি খুবই কষ্ট পেতেন, আবার আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতেন। এইভাবেই প্রায় বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হল।[৮৯২] এমতাবস্থায় তিনি অধিক পরিমাণে সাদকা ও দান–খয়রাত করতেন। ১২ মুহাররম তারিখে তিনি বলেন- "আমাকে বলা হয়েছে যে, ৪৫ দিনের মধ্যেই তোমাকে এই জগৎ ছেড়ে অপর জগতের দিকে যাত্রা করতে হবে এবং আমাকে আমার কবরের জায়গাও দেখানো হয়েছে।" ২২ সফর তারিখে তিনি খাদেম ও আত্মীয় বান্ধবদেরকে ডেকে বললেন যে, আজ চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। দেখা যাক, বাকী সাত-আট দিনে কী ঘটে। এরপর আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অপরিমেয় পুরস্কারের কথা বলতে থাকেন। ২৩ সফর তারিখে তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় ও পোশাকাদি খাদেমদের মধ্যে বন্টন করে দেন।[৮৯৩]

৮৯১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

৮৯২. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *হযরত মুজাদ্দেদে আল্ ফেসানী (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৮৯৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

সফর মাসের ২৮ তারিখেও হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন। জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তিনি খাদেমদেরকে বললেন, আমার অসুখের সময় তোমরা বড় কষ্ট করে আমার খিদমত করেছ। তোমাদের এ কষ্ট আজ শেষ হবে।[৮৯৪] ফজরের নামাজের পর তিনি মোরাকাবায় বসলেন। মোরাকাবা শেষ করে এশরাকের নামাজও আদায় করলেন। সকালের দিকে প্রশ্রাবের জন্য পাত্র চেয়ে পাঠালেন। পাত্র আসলে দেখা গেল তাতে বালি নেই। কাপড়ে ছিটা পড়তে পারে বলে বালি দিতে বললেন। পাত্রে বালি ভরে দেওয়া হল। তিনি বললেন এখন আর সময় কোথায় যে, পেশাবের পর ওযু করতে পারব। তিনি আর প্রস্রাব করলেন না। তিনি বললেন, আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। তখনই তাঁকে কেবলামুখী করে শুইয়ে দেওয়া হল। শুয়ে তিনি ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে যিক্র করতে লাগলেন। আল্লাহ, আল্লাহ যিকির করতে করতে অল্পক্ষনের মধ্যে তাঁর পবিত্র রূহ আল্লাহ পাকের দরবারে চলে গেল। দিনটি ছিল হিজরী ১০৩৪ সনের ২৮ সফর।[৮৯৫] মুতাবিক ১৬২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর।[৮৯৬] এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) এর পবিত্র দেহ যখন গোসল প্রদানের জন্য বাইরে আনা হল দেখা গেল সালাতে কিয়ামরত অবস্থায় যেরূপ দুই হাত পরস্পর বাঁধা অবস্থায় থাকে তেমনি বাম হাতের কব্জীর উপর ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাঁধা। পুত্রেরা হাত দু'টো পরস্পরের থেকে আলাদা করে দেন। কিন্তু গোসল প্রদানের পর দেখা গেল হাত দুটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। মুখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মুচকি হাসছেন।[৮৯৭] জানাযার নামাজ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ পড়ালেন এবং সিরহিন্দ শহরে তাঁর বড় পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাদেকের কবরের সামনে তাঁকে দাফন করা হলো। এই জায়গা সম্পর্কেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) তাঁর মকতুবে লিখেছেন, "আমার অন্তরের নূর তথায় উজ্জ্বল।"[৮৯৮]

---

৮৯৪. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৮৯৫. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৮৯৬. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিখ্যাত শত মুসলিম মনীষী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

৮৯৭. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৮৯৮. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *আলেম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

সুপারিশমালা
(Recommendations)

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো সূফীবাদ। এর উপর ভিত্তি করেই শাশ্বত চিরশান্তির ধর্ম ইসলামি জীবন বিধান বিরচিত। সূফীবাদের মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং এ সম্পর্কে মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হলো :

- ❖ সূফীবাদ বিষয়টিকে সভা, সমিতি, সেমিনার, ওয়াজ-মাহফিল প্রভৃতি গণজামায়েতের মাধ্যমে প্রচার করা যায়। এসব জনসমাবেশে ইসলামে সূফীবাদের গুরুত্ব সবার সামনে সহজ ভাষায় তুলে ধরতে হবে, যাতে করে এ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা বিদূরীত হয়।
- ❖ পত্রিকা, সাময়িকী, কবিতা, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে সূফীবাদের গুরুত্ব প্রচার করা যেতে পারে। ইসলামি জীবনদর্শনভিত্তিক এসব লেখনি মানুষের মধ্যে স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।
- ❖ ইসলামি দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর মাধ্যম হলো শিক্ষাব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সমন্বয় করে সূফীবাদের বিষয়টি মূল শিক্ষা ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বিশেষ করে ধর্মীয় পাঠ্য বইয়ের মধ্যে আনা যায় কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং সুযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার সব পর্যায়ে সূফীবাদকে পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- ❖ বেতার, টেলিভিশনে নিয়মিতভাবে সূফীবাদের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়। সূফীদের জীবনী নিয়ে চলচিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে। বেশ কিছু তুরকী সিনেমা রয়েছে যা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত। সেই সকল সিনেমা বাংলা ডাবিং করে প্রচার করা যেতে পারে। সূফীদের জীবনীমূলক গল্প, সাহিত্য মিডিয়ায় প্রচার করা সম্ভব হলে এ

বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ আরো বেশী জানতে পারবে। তথ্যবহুল ও আবেদনময় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করলে জনসাধারণের মনে এর বিশেষ প্রভাব পড়বে।

- ❖ প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় ইমাম সাহেব যদি সূফীবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন তবে এ বিষয়টি প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।
- ❖ সংগীত মানুষের হৃদয়ে খুব তাড়াতাড়ি স্থান করে নিতে পারে। সংগীত বিভিন্নভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই মারেফাত বিষয়ক সংগীত, ইসলামি সংগীত প্রচারে মাধ্যমেও সূফীবাদের আবেদন তুলে ধরা যেতে পারে।
- ❖ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যোগে একটি বিশেষ দল গঠন করে দেশ-বিদেশে এদেরকে পাঠিয়ে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা যেতে পারে। এই বিশেষ দলের পরিবারের দায়িত্ব রাষ্ট্র সমাজ পালন করবে। এতে করে তারা নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবেন।
- ❖ সূফীবাদের উপর লিখিত মূল বইগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদের সরকারি উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগ বেশী ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়। আগেও এই ফাউণ্ডেশন থেকে অনেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার বই ফারসী ভাষায় রয়েছে। এ সকল ফারসী ভাষার বই বাংলায় অনুবাদ করা গেলে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে মানুষের পরিস্কার ধারণা তৈরী হবে আশা করা যায়। এ ধরনের বই অনুবাদের জন্য আর্থিক সাপোর্টের দরকার হয় যা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষে বহন করা সম্ভব। সুতরাং মূল বইগুলো সর্বসাধারণের হাতে পৌছাতে পারলে সূফীবাদ সম্পর্কে মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে।
- ❖ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা গেলে ধর্ম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।
- ❖ অনেক সময় দেখা যায় সূফীসাধকগণ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের স্বীকার হন। এ বিষয়ে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরী। যাতে করে সূফীগণ তাঁদের কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারেন।

- ❖ যারা খানকা বা মাজারে ইসলাম বিরোধি কর্মকণ্ড পরিচালনা করে তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। তা না হলে ইসলাম ও ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
- ❖ এ দেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সভা, সেমিনার, সিম্পজিয়াম, প্রস্তক প্রকাশনী ইত্যাদির মাধ্যমে সূফীবাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে।
- ❖ ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি যাতে সর্বপ্রথম প্রাধন্য পায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- ❖ তাসাউফ ফাউণ্ডেশনের মতো আরো কিছু ফাউণ্ডেশন গঠন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সূফীবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা যায়।
- ❖ তাসাউফ ফাউণ্ডেশনের মতো আরো যে সকল ছোট খাট ফাউণ্ডেশন রয়েছে, তারা যদি একত্রে কাজ করে তাহলে এ সকল ফাউণ্ডেশনগুলোর কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে এবং প্রচার প্রচারণা আরো ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করলে মানুষের অন্তরে সূফীবাদের আবেদন পৌছানো সম্ভব হবে। সেই সাথে সত্যিকারের সূফীসাধকগণ যে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছেন তা বন্ধ হবে। আর সাধারণ সহজ-সরল জনগণ ভণ্ড সূফীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

উপসংহার
(Conclusion)

ইসলাম তথাকথিত শুধুমাত্র নিছক ধর্ম নয়। ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জীবনদর্শন। ইসলামের মূল লক্ষ্য মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধন, সামগ্রিক শান্তি বিধান। ইসলামের লক্ষ্য শুধুমাত্র মানবজীবনের একটি বিশেষ দিক নয়। মানুষের জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের সামগ্রিক উন্নয়নসাধনই ইসলামের লক্ষ্য। আর ইসলামের পূর্ণরূপই সূফীবাদ। কারণ সূফীবাদ ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দু'দিকের সমন্বিত রূপ। তাই মানবাত্মাকে বিশুদ্ধ করে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সূফীবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সূফীবাদ আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে জানার বিজ্ঞান। শরীয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচারণ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা, আর সূফীবাদ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আত্মিক উপায়। সূফীবাদ ইসলামের সেই বিজ্ঞানময় দিকের শিক্ষা দিয়ে আসছে, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্তরচক্ষু দিয়ে স্রষ্টার দর্শন লাভ করা সম্ভব। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যে বিভেদকারী পর্দা রয়েছে সুফীবাদ চর্চার মাধ্যমে সে পর্দা অপসারিত হয়ে যায়। ফলে মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালার একক সত্ত্বা বাস্তবে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং সূফীবাদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। সেখান থেকেই ইসলাম ধর্মের মূল শক্তি উৎসারিত।

মূলত যে বিজ্ঞান চর্চা করলে মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় পৌছাতে পারে তাকে সূফীবাদ বলে। সূফী সাধনার মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত মহাজাগতিক সব বিষয় অবহিত হয়ে আশরাফুল মাখলুকাতের গুনাবলী অর্জন করে এবং এভাবেই সে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করতে পারে। সূফীবাদ পৃথিবীর আদিমতম মৌলিক জ্ঞান যা মহান আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কে নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন- "আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন

(অর্থাৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন)" (আল-কুরআন, ২ : ৩১)। আল্লাহ তায়ালা নিজে যে অতিন্দ্রিয় পদ্ধতিতে হযরত আদম (আ.) কে জ্ঞান দান করেছিলেন তাই সূফীবাদ। এই পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করেই হযরত আদম (আ.) হতে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের কাছে তাওহীদের বাণী প্রচার করতেন।

এ গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, সূফী দর্শন বাইরের কোন চিন্তাধারা থেকে কিংবা অন্য কোন ধর্মের সাথে সংঘর্ষ করে সৃষ্টি হয়নি। পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর মহান বাণী ও আচরন থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এটা ইসলামের নিজস্ব সম্পদ এবং ইসলামি শরিয়তের আওতায় আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে যুগে যুগে উন্নতির শিখরে আরোহন করে মুসলিম দর্শনকে সারা বিশ্বের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও অনুকরণীয় করে তুলেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অনেক রহস্যাবৃত ঘটনা ও আয়াতে সূফী দর্শনের বীজ নিহিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স.) তার বিশিষ্ট সাহাবীদের সূফীবাদের শিক্ষা দান করেছেন। তবে তিনি সাধারণ সাহাবীদের কাছে তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করেননি। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে যার ধারণ ক্ষমতা আছে বলে তিনি দেখেছেন এমন কিছু বিশেষ সাহাবিকে মিনহাজের (সরল পথ) জ্ঞান দান করেছেন। শুধু সাহাবিদের নয়, রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে ও সূফীবাদের চর্চা করতেন। তিনি চিরদিনই আড়ম্বরহীনতা পছন্দ করতেন; অল্প খাদ্য, অল্প নিদ্রা, অল্প কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। দীর্ঘ সময় ধরে মোরাকেবা ও মোশাহেদায় নিমগ্ন থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের যে ইলম শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল মূলত ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতের সর্বোত্তম সমন্বয় এবং এ দুটি ইলমের সমন্বয়েই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর কোন একটাকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলা যায় না। এ দুটি ইলমের সমন্বয় নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে রাসূলুল্লাহ (স.) মানুষের জন্য মহান আদর্শ নির্ধারিত করে গেছেন। সূফী দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নিজের বাতেনকে সঠিক করে নিজের প্রকৃতি উন্নততর করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণ

অন্যদেরকে সে পথ প্রদর্শন করা। সূফী আন্দোলনের মূল কথাই হলো ইমানের জীবন্ত বীজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

সূফী সাধনা বা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারনা রয়েছে যে, এটি ইসলাম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড। এ বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীরা দলিল হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করে। তাদের মতে, কুরআনের কোথাও তাসাউফ বা সূফীবাদের কথা বলা নেই। কুরআনে নামাজ, রোজা ইত্যাদির কথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। তাই বলে এগুলোর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। সালাত ও সাওম দ্বারা যেমন নামাজ ও রোজাকে বোঝান হয়েছে তেমনি তাজকিয়া, ইহসান, ইসলাম, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি দ্বারা সুফীবাদকে বোঝান হয়েছে। এর পাশাপাশি উপরোক্ত গুনগুলোর বিপরিত দোষক্রটি যেমন- দুনিয়াসক্তি, লোভ-লালসা, লৌকিকতা, অহংকার, কু-প্রবৃত্তি, রাগ-হিংসা ইত্যাদির থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে এবং অপারগদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর নামই ইসলাহে বাতেন। এটিই তরিকত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই মহা উপকারী বিদ্যা সূফীবাদকে অস্বীকার করা চরম অজ্ঞতা তথা দ্বীনের একাংশকে অমান্য করার সামিল। পাশাপাশি সূফী সাধকদের সংসর্গে থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে সৎসংগের প্রতি উৎসাহ ও অসৎসঙ্গ থেকে নিরুৎসাহীত করা হয়েছে। আল্লাহ ওলাদের কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে গেলে তাদের কাছে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণভাবে নিজেকে সোপর্দ করতে হবে। তাদের প্রতি অগাধ ভক্তি, মুহাব্বত ও আস্থা রাখতে হবে। এর মাধ্যমে পীরের মুরিদ হওয়ার ব্যাপারে বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকেই বোঝা যায় সূফীবাদ বা আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। শুধু তাই নয় বরং বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজতাহিদগণ যারা ইলমে, আমলে, আখলাকে, সততায়, নিষ্ঠায়, শায়খের খেদমতে, সোহবতে বিশ্বময় জুড়ে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিলেন, তারা সূফীবাদকে শুধু মৌখিকভাবেই স্বীকার করেননি বরং এর উপর আমল করে

মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে জগতবাসীর জন্য অনুকরনীয় ও বরণীয় হয়েছেন।

অতএব, বলা যায়, মানবজীবনের রহস্য ও তার মূল তাৎপর্য উদ্ধার, সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য নিরূপন আল্লাহর জ্ঞান ও দর্শন একমাত্র সূফীবাদের মাধ্যমেই সম্ভব। জগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও স্বরূপ নিরূপনে সূফীবাদ ছাড়া কেউ সক্ষম নয়। সূফীবাদ যেহেতু দেহ-আত্মা উভয়কেই স্বীকার করে, সেহেতু আজকের মানবজাতির সামনে সূফীবাদ এক বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয়ের প্রতীক। সকল হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে সূফীবাদই। আধুনিক বিশ্বকে প্রকৃত শান্তি, সৌহার্দ, সাম্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারে একমাত্র সূফীবাদ। তাই এই অভিসন্দর্ভে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনে সূফীবাদের শিক্ষা, ভূমিকা ও অবদান তুলে ধারার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliogrpahy)

আ

১. আল-কুরআন

২. আবদুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৪।

৩. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ : *আমাদের সূফী সাধক*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৭৭।

৪. আবুল হাশিম (মুসলিম চৌধুরী অনূদিত) : *ইসলামের মর্মকথা*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮১।

৫. আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা, ২০০৭।

৬. আবদুল করিম : *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*
বাংলা একাডেমী
ঢাকা, ১৯৯৪।

৭. আবদুল করিম : *চট্টগ্রামে ইসলাম*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮০।

৮. আবুল হাসান চিশতি : *রূহ*
খানকায়ে হাসানিয়া
খুলনা, ১৯৬৩।

৯. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী : *তাফসীরে তাবারী শরীফ*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৩।

১০. আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী : *হাদীসে কুদসি*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

১১. আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (রহ.) (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত) : *ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ* মদীনা পাবলিকেশন্স ঢাকা, ২০০৫।

১২. আবদুল মালেক নূরী : *সূফীবাদ* অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ঢাকা, ২০০৪।

১৩. আমীনুল ইসলাম : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

১৪. আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত) : *সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ* মাকতাবাতুল আযহার ঢাকা, ২০১৪।

১৫. আল্লামা শিবলী নোমানী (কাউসার বিন খালেদ অনূদিত) : *ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন* কোহিনূর লাইব্রেরী ঢাকা, ২০০৩।

১৬. আল্লামা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হোসেইন তাবাতাবাঈ (মো. ইরফানুল হক অনূদিত) : *আধ্যাত্মিক সফর* ওয়াইজম্যান পাবলিকেশন্স ঢাকা, ২০০৮।

১৭. আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী (আব্দুল কুদ্দুস বাদশা এবং মোঃ মাঈনউদ্দিন অনূদিত) : *বেলায়েতের দ্যূতি* দারুল কোরআন ফাউণ্ডেশন ঢাকা, ২০১০।

১৮. আফরোজা বেগম : *ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০১৬।

১৯. আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু : *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও বিশ্ববিখ্যাত* শত মুসলিম মনীষী ঐতিহ্য প্রকাশনী ঢাকা, ২০০২।

২০. আবদুল খালেক : *গাওসে আ'যম* সোবহানিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, ১৯৭৯।

২১. আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর (খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত) : *সীরাতে ইবনে কাছীর* আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টার ঢাকা, ২০০৬।

২২. আয়াতুল্লাহ আল উযমা নাসের মাকারিম সিরাজী (এস. জামান অনূদিত) : *ইমামত* আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতানী খুলনা, ২০০৩।

২৩. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র.) (হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল অনূ.) : *মিনহাজুস সালেহীন* প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৪।

ই

২৪. ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী (আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত) : *রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ* ঐতিহ্য প্রকাশনী ঢাকা, ২০১৬।

২৫. ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ হাফেজ: ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ (রহ.) (মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান অনূদিত) *রূহ কি* মীনা বুক হাউস ঢাকা, ২০২২।

২৬. ইমাম আল গাজ্জালী : *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* ৪র্থ খণ্ড এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, ১৯৮৬।

২৭. ইমাম আল গাজ্জালী : *এহইয়া-উল-উলুমুদ্দিন* ৪র্থ খণ্ড বায়তুল মোকাররম আদর্শ পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি ঢাকা, ১৯৯০।

২৮. ইমাম আল গাজ্জালী : *মিনহাজুল আবেদিন* রশিদ বুক হাউস ঢাকা, ১৯৮২।

২৯. ইমাম আল গাজ্জালী : *মুকাশাফাতুল ক্বুলুব*
দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ
ঢাকা, ১৯৮৯।

৩০. ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশয়াস আস-সিজিস্তানী (র.) (মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল হক অনূদিত) : *আবু দাউদ শরীফ*
মীনা বুক হাউস
ঢাকা, ২০০৮।

৩১. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত) : *রিয়াদুস সালেহীন*
প্রথম খণ্ড
ভূঁইয়া প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৬।

৩২. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী: (মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদ আলম হাতিয়ুবী অনূদিত) *রিয়াদুস সালেহীন*
৩য় খণ্ড
ভূঁইয়া প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৬।

৩৩. ইমাম গাযযালী (র.) (হাফেজ মাওলানা মুহা. রফিকুল ইসলাম খান অনূদিত) : *দাকায়েকুল আখবার*
নেছারিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা, ২০১১।

৩৪. ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) (মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন অনূদিত) : *পীর, মুরীদ ও বায়আত*
মুহাম্মদী কুতুবখানা
চট্টগ্রাম, তারিখ বিহীন।

৩৫. ইমাম গাজ্জালী (র.) (মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূদিত) : *আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল*
ইমাম গাজ্জালী ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) ফাউণ্ডেশন
ঢাকা, ২০১২।

৩৬. ইমাম গাযযালী (র.) (মাওলানা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান অনূ.) : *মিশকাতুল আনোয়ার*
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
ঢাকা।

এ

৩৭. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম : *আনওয়ারে আম্বিয়া*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

৩৮. এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী : *হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি*
মিল্লাত লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৯৭৯।

৩৯. এম এ মোমিন চিশতি : *ইসলাম–তরিকত ও মুর্শেদ দর্শন*
সৃজনী পাবলিকেশন
ঝিনাইদহ, ২০০১।

৪০. এ. এফ. এম আবদুল আযীম ও : *হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)*
জীবন ও কর্ম
সিদ্দিক আহমদ খান
প্রথম খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০১।

৪১. এ. এফ. এম আবদুল আযীম ও : *হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)*
জীবন ও কর্ম
সিদ্দিক আহমদ খান
দ্বিতীয় খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৭।

৪২. এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম : *ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০০।

৪৩. এ. টি. খলীল আহমদ : *মকতুবাত শরীফ অবলম্বনে*
আত্মদর্শনে সত্যদর্শন
প্রথম খণ্ড
জামান প্রিন্টার্স
ময়মনসিংহ, ১৯৭৬।

৪৪. এ. কে. এম. নাজির আহমদ : *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা, ১৯৯৯।

খ

৪৫. খান বাহাদুর আহছানউল্লা : *তরীকত শিক্ষা*
আহছানিয়া মিশন
ঢাকা, ১৯৯০।

৪৬. খান সাহেব মৌলভী হামিদু রহমান : *শরফুল ইন্সান*
গড়পাড়া এমামবাড়ী দরবার শরীফ
মানিকগঞ্জ, ১৯৮৭।

৪৭. খান বাহাদুর আহছানউল্লা : *ছুফী*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮০।

৪৮. খাজা মোজাম্মেল হক : *স্রষ্টা সৃষ্টি ও ওয়াসীলা*
খাজা ফাহিম হুমামা
শ্যামলীবাগ
ঢাকা, ১৯৯২।

গ

৪৯. গোলাম সাকলায়েন : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

জ

৫০. জালাল উদ্দীন খন্দকার : *দীদারে এলাহী*
র‍্যামন পাবলিশার্স
ঢাকা, ২০১৩।

৫১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী : *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ*
প্রগতি প্রকাশনী
ঢাকা, ১৯৮৮।

৫২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী : *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর ও মাশায়েখ*
১ম ও ২য় খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৫।

ড

৫৩. ড. আমিনুল ইসলাম : *জগৎ জীবন দর্শন*
বাংলা একাডেমী
ঢাকা, ১৯৯২।

৫৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : *ইসলাম প্রসঙ্গ*
রেনেসা প্রিন্টার্স
ঢাকা, ১৯৬৩।

৫৫. ডক্টর আব্দুল করিম : *চট্টগ্রামে ইসলাম*
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
চট্টগ্রাম, ১৯৮০।

৫৬. ড. তারা চাঁদ (এস. সজিব উল্লাহ অনূ.) : *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৮৮।

৫৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক : *বঙ্গে সূফী প্রভাব* র‍্যামন পাবলিশার্স ঢাকা, ২০০৬।

৫৮. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল : *সূফীতত্ত্বের ইতিকথা* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ঢাকা, ২০১৩।

৫৯. ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ ও ড. এ. কে. এম. রিয়াজুল হাসান প্রমুখ : *সুফি দর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গে* আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ২০১৩।

৬০. ড. তাহের আল-কাদেরী : *তাসাউফের আসল রূপ* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০১২।

৬১. ড. ফকির আবদুর রশীদ : *সূফী দর্শন* প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার ঢাকা, ২০০০।

৬২. ড. আবদুল কাদের : *নোয়াখালীতে ইসলাম* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯১।

৬৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : *মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (র.)* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৫।

৬৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক : *পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম* আদিল ব্রাদার্স ঢাকা, ১৯৮৪।

৬৫. ড. ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার* ধারা বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩।

৬৬. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক : *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (র.)*
ইনষ্টিটিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ
এণ্ড কালচার
ফরিদপুর, ১৯৮৮।

৬৭. ড. আ. র. ম. আলী হায়দার : *শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার*
পীর আবূ বকর সিদ্দীক (র.)
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৪।

৬৮. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক : *রূহের খোরাক*
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
ঢাকা, ২০০৪।

৬৯. ড. রশীদুল আলম : *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন
ঢাকা, ১৯৬৯।

৭০. ড. মোঃ গোলাম দস্তগীর : *বাংলাদেশে সূফিবাদ*
খাজা এনায়েতপুরীর জীবন দর্শনের আলোকে
হাক্কানী পাবলিশার্স
ঢাকা, ২০১১।

৭১. ড. মোঃ আজম আলী খান : *হযরত শাহ সূফী খাজা মুহাম্মদ*
ইউনুছ আলী এনায়েপুরী (র.) এর
জীবন ও কর্ম এবং এলমে তাসাউফ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০১৫।

৭২. ড. রশীদুল আলম : *সূফী সাধনার ভূমিকা*
আয়শা কিতাব ঘর
ঢাকা, ২০০২।

৭৩. ড. মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ : *তাবি'ঈদের জীবন কথা*
প্রথম খণ্ড
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা, ২০০২।

৭৪. ডাক্তার সুলতানুজ্জামান : *কবরের খবর বা রূহানী জগত*
আব্বাছিয়া লাইব্রেরী

ঢাকা, ১৯৯০।

৭৫. ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী : *শিরক কী ও কেন?*
এডুকেশন সেন্টার
সিলেট, ২০০৭।

৭৬. ড. মুফতী মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী : *আত্মার সংশোধন ও পরিচর্যা*
রিয়াদুল জান্নাহ প্রকাশনী
ঢাকা, ২০১৭।

৭৭. ড. কাজী আবদুল মোনয়েম : *আধ্যাত্মিক জীবন*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮০।

৭৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার* ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৫।

৭৯. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক : *দীন-ই-ইলাহী ও মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র.)*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৪।

দ

৮০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : *হযরত শাহ জালাল (র.) দলিল ও ভাষ্য*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৯।

৮১. দেওয়ান মোঃ আজরফ : সিলেটে ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৫।

৮২. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : অগ্রপথিক সম্পাদিত সংকলন : *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৪।

ফ

৮৩. ফকির চিশতী নিজামী : *আহলে বাইয়েত কিতাব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*
র‍্যামন পাবলিশার্স
ঢাকা, ২০০২।

৮৪. ফেরদৌস ইসলাম : *চার আউলিয়ার কাহিনী*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮০।

৮৫. ফয়েজ আহমদ ইসলামাবাদী : *তাযকিরায়ে জামীর*
হাটহাজারী ফয়েজ মঞ্জিল
চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

ব

৮৬. বজলুর রহমান জুলকারনাইন : *ঈমানের ইশারা*
১ম খণ্ড
মাহমুদা শিরীন উয়ায়েছী
মোহাম্মদপুর
ঢাকা, ১৪০৩ বাংলা।

ম

৮৭. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী : *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*
নবরাগ প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৮।

৮৮. মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী : *হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)*
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
ঢাকা, ১৯৯৬।

৮৯. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) : *তাছাওউফ তত্ত্ব*
আল-আশরাফ প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৩।

৯০. মাওলানা এম. ওবায়দুল হক : *বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ*
মদীনা পাবলিকেশন্স
ঢাকা, ২০০৮।

৯১. মোহাম্মদ তফিজ উদ্দিন কাদেরী : *সুফিবাদ ও আত্মদর্শন*
রোদেলা প্রকাশনী
ঢাকা, ২০১৩।

৯২. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির : *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য*
মীনা বুক হাউস
ঢাকা, ২০১৫।

৯৩. মাওলানা আব্দুল বাতেন : *সীরাত-ই-কারামত আলী* জৌনপুরী
আসরার-এ-কারীয়ী প্রেস
এলাহাবাদ, ১৯৪৭।

৯৪. মাওলানা নুরুর রহমান : *তাযকিরাতুল আওলিয়া*
এমদাদিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৯৮২।

৯৫. মানবেন্দ্রনাথ রায়
(মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনূদিত) : *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*
শতদল প্রকাশনী
ঢাকা, ১৯৯০।

৯৬. মাহাবুবুর রহমান খান : *মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়*
খান প্রিন্টার্স
ঢাকা, ১৯৮৮।

৯৭. মাহমুদ বখ্‌ত : *বাংলাদেশের সূফীবাদের দিশারী যারা*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

৯৮. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী : *রংপুরে ইসলাম*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৪।

৯৯. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন : *আধ্যাত্মিক মানস*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

১০০. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার : *ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*
বাংলা একাডেমী
ঢাকা, ১৯৮৪।

১০১. মাওলানা মনসুর নোমানী	:	*তাসাউফ কাকে বলে* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৮৯।
১০২. মাওলানা মোঃ মকিম উদ্দীন	:	*গঞ্জে আছরার বা মারেফাত তত্ত্ব* এনায়েতপুর দরবার শরীফ সিরাজগঞ্জ, ১৪০৯ বাংলা।
১০৩. মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা জামান	:	*হযরত শাহজালাল ও শাহপরান (রহ.) এর জীবনী* মাহমুদ প্রকাশনী ঢাকা, ২০০৫।
১০৪. মোহাম্মদ নূরনবী	:	*আল্লাহ তত্ত্ব* গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড ঢাকা, ১৯৮১।
১০৫. মুহাম্মদ নূর উললাহ আযাদ সম্পাদিত	:	*বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর জীবনী আশ্চর্য কারামতসহ* আনোয়ারা বুক হাউস ঢাকা, ২০০৩।
১০৬. মাওলানা তাহের সুরাটী	:	*কাসাসুল আম্বিয়া* ১ম ও ২য় খণ্ড সালমা বুক ডিপো ঢাকা, ২০০৩।
১০৭. মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা	:	*ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৭।
১০৮. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	:	*মোসলেম বঙ্গের সামাজিক* ইতিহাস গ্রন্থকার প্রকাশিত ঢাকা, ১৯৬৫।
১০৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর হামিদী	:	*রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনে আল্লাহর কুদরত ও রূহানিয়াত* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০১।

১১০. মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ : *তা'লীমে মা'রেফৎ*
ছারছীনা দারুছুন্নাত লাইব্রেরী
পিরোজপুর, ১৯৯৫।

১১১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) : *রূহে তাসাউফ (মা'রেফাতের মর্মকথা)*
হাফিজিয়া কুতুবখানা
ঢাকা, ১৯৯৭।

১১২. মুহাম্মদ নূর উললাহ আযাদ সম্পাদিত : *হযরত শাহ জালাল (রহ.)*
সোলেমানিয়া বুক হাউস
ঢাকা, ২০০১।

১১৩. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম : *আরব জাতির ইতিহাস*
বাংলা একাডেমী
ঢাকা, ২০০৪।

১১৪. মাওলানা রফিউদ্দিন চিশতী আজমেরী : খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) জীবনী
(মাওলানা মাসুম বিল্লাহ চিশতী অনূদিত) মীনা বুক হাউস
ঢাকা, ২০১২।

১১৫. মোঃ ছফিউল্লাহ মাহমুদী : *তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি*
পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স
ঢাকা, ২০০৬।

১১৬. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশাবন্দি: *সুফি তত্ত্ব*
(মুফতি কাজি মুহাম্মদ হানিফ অনূদিত) মাহফিল প্রকাশনা
ঢাকা, ২০১৬।

১১৭. মোহাম্মাদ হাদী আমীনী : *পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত*
(মোহাম্মাদ জামাল উদ্দিন অনূদিত) নুরুসসাকলায়েন জন কল্যাণ সংস্থা
ঢাকা, ১৯৯৯।

১১৮. মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী এবং : *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষন*
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক মাকতাবাতুল আশরাফ
(মাওলানা মুতীউর রহমান অনূদিত) ঢাকা, ১৪২৫ হিজরী।

১১৯. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী : *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*
(মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী অনূদিত) মাকতাবাতুল আযহার
ঢাকা, ২০১৪।

১২০. মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আলী : *পবিত্র কোরআন-হাদীসের* আলোকে ক্বলব সংশোধন
মদীনা পাবলিকেশন্স
ঢাকা, ২০০৪।

১২১. মাওলানা আবদুল মতীন : *শরীয়ত ও মা'রেফত*
শর্ষিনা আলীয়া লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৩৮২ বাংলা।

১২২. মোঃ আবদুল করিম : *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০২।

১২৩. মাওলানা রুহুল আমিন : *তাসাওফ তত্ত্ব তরিকত দর্শন*
প্রকাশ ভবন
ঢাকা, ১৯৮৫।

১২৪. মোফাখখারুল ইসলাম : *আদি তরিকাহ*
সুরাইয়া সুলতান মুফলিহা
ঢাকা, ১৯৮৮।

১২৫. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান : *ইমাম গাযালী, তাসাউফ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা*
মদিনা পাবলিকেশন্স
ঢাকা, ২০০১।

১২৬. মুহম্মদ মহসিন : *মানুষতত্ত্ব*
উয়ায়সি মহল
ঢাকা, ১৯৮৫।

১২৭. মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) (মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী অনূদিত) : *মসনবী শরীফ*
১ম খণ্ড
খায়রুন প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৮।

১২৮. মোঃ কামাল উদ্দিন ভূঞা : *তাসাউফ সঞ্জীবনী*
আহমদ পাবলিশিং হাউস
ঢাকা, ১৯৯৯।

১২৯. মোস্তাক আহমাদ : *দিওয়ান-ই-হাফিজ*
রোদেলা প্রকাশনী
ঢাকা, ২০১৪।

১৩০. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান চিশতি : *মিলাদ ও কিয়াম দর্শন*
গঞ্জে তৌহিদ প্রকাশনী
মানিকগঞ্জ, ২০১৩।

১৩১. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) : *জা'আল হক*
(মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান অনূদিত)
২য় খণ্ড
মুহাম্মদী কুতুবখানা
চট্টগ্রাম, ১৯৮৮।

১৩২. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন : *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*
থানভী লাইব্রেরী
ঢাকা, ২০০৭।

১৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নু'মানী (র.) : *দীন ও শরীয়ত*
(মাওলানা আবু তাহের রাহমানী অনূদিত)
বাগদাদ লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৯৯৯।

১৩৪. মুহাম্মদ সিরাজুল হক : *হযরত দাতাগঞ্জে (র.) ও তার*
অমুল্য গ্রন্থ কাশফুল মাহজূব
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০১৬।

১৩৫. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী : *হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)*
হেরা পাবলিকেশন
ঢাকা, ১৯৯১।

১৩৬. মনির উদ্দীন ইউসুফ : *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৪।

১৩৭. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী : *আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায়*
খোদার রহমত
(কাজী মাওলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী অনূ.)
মুহাম্মদী কুতুবখানা
চট্টগ্রাম, ২০০৮।

১৩৮. মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনুদিত : *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফ (র.)*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯১।

১৩৯. মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আলী : *ক্বলব সংশোধন*
মদীনা পাবলিকেশন্স
ঢাকা, ২০০২।

১৪০. মোস্তাক আহমাদ : *আল-কুরআনের মারেফত তত্ত্ব*
সমাচার প্রকাশনী
ঢাকা, ২০১৪।

১৪১. মাহমুদা খানম : *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব*
বাংলা একাডেমী
ঢাকা, ২০০৩।

১৪২. মাওলানা খাজা ছাইফুদ্দীন : *তাসাওফের ওজিফা বা মারেফাত তত্ত্ব*
মুজাদ্দেদীয়া তরিকত মিশন
লালকুঠি দরবার শরীফ
শম্ভূগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৯।

র

১৪৩. রশীদ আহমদ : *বাংলাদেশের সূফীসাধক*
মডার্ণ লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৯৭৪।

১৪৪. রওশন জাহিদ : *সূফি সাধনায় রাজশাহী*
আনন্দধারা প্রকাশনী
ঢাকা, ২০০৯।

১৪৫. রিচার্ড এম. ইটন (হাসান শরীফ অনূ.) : *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৮।

১৪৬. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার ইতিহাস*
১ম খণ্ড
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা, ১৪০৫ বাংলা।

ল

১৪৭. লাভলী আখতার ডলি : *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা*
সাফা পাবলিকেশন
ঢাকা, ২০০১।

শ

১৪৮. শায়খ ওয়াসীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী (র.) (মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামান অনূ.) : *মেশকাত শরীফ* ৫ম খণ্ড তাজ কোম্পানী লিমিটেড ঢাকা, ২০০৫।

১৪৯. শাইখ শরফুদ্দীন : *বাংলাদেশে সুফিপ্রভাব ও ইসলাম প্রচার* বর্ণায়ন প্রকাশনা ঢাকা, ২০১০।

১৫০. শ. ম. শওকত আলী : *কুষ্টিয়ায় ইসলাম* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯১।

১৫১. শরীফ মুহাম্মদ মুজিবুল হক : *হযরত শাহ মাদার (র.) ও শাহ মাদার দরগাহ শরীফ* এস. এস. প্রিন্টার্স ঢাকা, ১৯৯৯।

১৫২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেশ দেহলবী (র.) (সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী অনূ.) ; *আল কওলুল জামিল ও ফয়সালায়ে হাফতে মাসআলা* এবং আল হাজী ইমাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) রশীদ বুক হাউস ঢাকা, ২০১১।

১৫৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ : *হযরত ওয়েছ করণী (র.)* দি তাজ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৮৩।

১৫৪. শামসুল হক দৌলতপুরী : *তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৯।

১৫৫. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান : *ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৭।

১৫৬. শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসের আসসা'দী (এ. কে. এম. আবদুর রশীদ অনূ.) : *তাওহীদের মর্মকথা* দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৪।

স

১৫৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী (মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনূদিত) : *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৩।

১৫৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) : (আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূ.) *হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র.)* আলিফ পাবলিশার্স ঢাকা, ১৯৯৯।

১৫৯. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি : *মাওলার অভিষেক* ইসলামিয়া চিশতিয়া সংঘ কেরানীগঞ্জ, ১৯৯৯।

১৬০. সৈদয় আবুল হাসান আলী নদভী (আবু সাঈদ মোঃ ওমর আলী অনূ.) : *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক* ৩য় খণ্ড ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৮৬।

১৬১. সাদেক শিবলী জামান : *বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী-আউলিয়া* 'রহমানিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, ১৯৯৩।

১৬২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত : *ইসলামি দর্শন* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৪।

১৬৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ* নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ১৯৬৯।

১৬৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৪।

১৬৫. সৈয়দ বদরুদ্দোজা মাইজভাণ্ডারী : *আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে* মাইজভাণ্ডার শরীফ চট্টগ্রাম, ১৪০২ বাংলা।

১৬৬. সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন : *খানে আজম হযরত খান জাহান আলী (র.)*
মোরশেদ পাবলিকেশন
বাগেরহাট, ১৯৮২।

১৬৭. সাইয়েদ আবদুল হাই : *ভারতীয় দর্শন*
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
ঢাকা, ২০০৭।

১৬৮. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী
দাতাগঞ্জে বখ্‌শ হাজরেরী
(মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন অনূদিত) : *কাশফুল মাহজুব*
রশীদ বুক হাউস
ঢাকা, ২০১২।

১৬৯. সৈয়দ ইমাম আবুল ফজল সুলতান
আহমদ চন্দ্রপুর (র.) : *নূরুল আসরার (নূর তত্ত্ব)*
প্রথম খণ্ড
চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফ
ফরিদপুর, ১৯৭৩।

১৭০. সৈয়্যেদ শাহ সুফী আহম্মদ আলী
জান শরীফ সুরেশ্বরী : *ছফিনায়ে ছফর*
সুরেশ্বর দরবার শরীফ
শরীয়তপুর, ১৯৯৯।

১৭১. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম : *বাংলাদেশ ও ইসলাম*
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
ঢাকা, ১৯৯৯।

১৭২. সামসুদ্দীন : *ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৩।

১৭৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
(আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূ.) : *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*
প্রথম খণ্ড
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
ঢাকা, ১৯৮৭।

১৭৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
(আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূ.) : *সংগ্রামী সাধকের ইতিহাস*
চতুর্থ খণ্ড
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
ঢাকা, ২০০৬।

১৭৫. সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী : *আহলে বাইতের পরিচয় ও সমাজ*
র‍্যামন পাবলিশার্স
ঢাকা, ২০০৮।

১৭৬. সংকলনঃ আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (মোমতাজ উদ্দীন আহমদ অনূদিত) : *হাদীসে কুদসী*
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৮৭।

১৭৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ইসলামি বিশ্বকোষ*
তৃতীয় খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
ঢাকা, ১৯৮৭।

১৭৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ইসলামি বিশ্বকোষ*
২৩শ খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
ঢাকা, ১৯৯৭।

১৭৯. সাইফউদ্দিন ইয়াহইয়া : *শরীয়তের দৃষ্টিতে জিকির*
আল ফাতাহ প্রকাশনী
ঢাকা, ১৯৯৯।

১৮০. সম্পাদন পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*
১ম ও ২য় খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ১৯৯৬।

১৮১. সাদেক শিবলী জামান : *ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)*
রহমানিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা, ১৯৮০।

১৮২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*
১ম খণ্ড
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা, ২০০৮।

হ

১৮৩. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) (ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূ.) : *ইমদাদুস সুলূক* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০১।

১৮৪. হাফেজ মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব : *পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা* হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ঢাকা, ২০০২।

১৮৫. হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (র.) (জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান অনূ.) : দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন সদর প্রকাশনী ঢাকা, ২০০৩।

১৮৬. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) : *গুনিয়াতুত্তালেবিন* ফেরদৌস পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৯৮৫।

১৮৭. হযরত শারফুদ্দিন আহমদ ইয়াহইয়া : *মাকতুবাতে স'দী* মানেরী মীর পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৯৮৬।

১৮৮. হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) (সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী অনূ.) : *সিররুল আসরার* রশীদ বুক হাউস ঢাকা, ২০১০।

১৮৯. হুমায়ূন আবদুল হাই : *মুসলিম সংস্কার ও সাধক* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৯।

১৯০. হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক অনূ.) : *মা'আরিফে লাদুন্নিয়া* সেরহিন্দ প্রকাশন ঢাকা, ১৪১৪ হিজরী।

১৯০. হাফেজ আবুল কালাম : *কোরআন হাদীসের আলোকে সেমার বিধান* গাউছিয়া হক মঞ্জিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ চট্টগ্রাম, ২০০২।

A

191. A. J. Arbery : *The Doctrine of Sufis*
Cambridge University Press
London, 1950.

192. A. J. Wensinck : *The Muslim Creed*
London, 1965.

193. Anil Chandra Banerjee : *History of India*
A. Mukherjee and Co. Private Ltd.
Colcutta, 1981.

194. A. L.Clay : *Principal heads of the history and statistics of Dacca Division*
London, 1968.

195. A. J. Arbery : *Sufism*
London, 1943.

196. Abu Muhammad Ordoni : *Falema the Gracious*
Ansarian Pablications
Iran, 1997.

197. Ayatullah Muhammad Baqir Al-Sadr : *Ghadir*
Ansariyan Publications
Iran.

198. A. Karim : *A Social History of the Muslims of Bengal*
Dhaka, 1959.

199. A. S. Triton : *Muslim Theology*
London, 1947.

200. Al-Balagh Foundation : *Ahlul Bait*
The Ahlul Bait World Assembly
Iran, 1992.

201. A. F. Ehwany : *Islamic Philosophy*
Cairo, 1957.

B

202. Board Researchers : *Islam in Bangladesh Through Ages*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1995

203. Beochmann : *Contribution to the Geograpy and History of Bengal*
Calcutta, 1873.

C

204. Chittick William C : *Sufism*
One world publication
(Sales and Editorial)
Oxford OX2 7AR
England.

205. Charles Stewart : *History of Bangal*
1847.

D

206. D. M. Matheson : *An Introduction to Sufi Doctrine*
Sh. Muhmmad Asraf
Lahore, 1968.

207. Dr. Abdul Jalil Mia : *A Contemporay Philosophy of Religion*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1982.

208. Dr. Sahera Khatun : *Persia's contribution to Arabic Literature*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1995.

209. Dr. Gholam Rasool : *Chisthi-Nizami Sufi Order of Bengal* Idarah-i-Adabiyat Delhi, 1990.

210. David Waines : *An Introduction to Islam* Cambrige University 1995.

211. Dr.Zahurul Hasan Sharib : *Khawaja Gharib Nawaz* Muhammad Asraf 1961.

212. Dr. A. K. M. Ayub Ali : *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* Islamic Foundation Bangladesh Dhaka, 1983.

213. Dr. Muin-ud-Din Ahamed Khan : *History of the Faraidi Movement* Islamic Foundation Bangladesh Dhaka, 1984.

214. D. L. O'Leary : *Arabic Thought and its place in history* London, 1954.

215. Dr. Muhammad Enamul Haq : *A history of sufi-ism in Bengal* Asiatic Society of Bangladesh 1975.

216. Dr. Abdur Rahim : *Social and cultural history of Bengal* Vol- I Karachi.

217. Dr. Mohammad Mohar Ali : *History of the Muslims of Bengal* Vol- IB Survey of Administration Society and culture Islamic Foundation Bangladesh Dhaka.

218. Denis Hermann and mathicu Terrier (Edited) : *Shi'i Islam and sufism*
I.B. Tauris
Bloomsbury Publishing Plc
London, 2020.

E

219. Elizabeth Sirriyeh : *Sufis and Anti-Sufis*
Routledge
New York, 2013.

220. Editors Board : *Islam in Bangladesh throuth ages*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1995.

F

221. Francesco Piraino,Mark Sedgwick (Editors) : *Global Sufism*
Hurst and company Ltd
London, 2019.

222. Fitzroy Morrissey : *Sufism and the scriptures*
I. B. Tauris
Bloomsbury publishing plc
2021.

G

223. G. E. Von Grunebaum : *Medieval Islam*
Chicago, 1947.

J

224. Johr Renard : *The A to Z of Sufism*
The A to Z Guide Series
No. 44
Scarecrow press Inc
London, 2009.

225. J. N. Parquhar : *Outline of the religious*
literature of India, 1920

226. Jethmal Parsram Gulraj : *Sind and its Sufis*
Madraj, 1924.

M

227. Milad Milani : *The Nature of Sufism*
Routledge
London and New York
2022.

228. Muhammad Muzammel Haq : *Some Aspects of the principal sufi orders in India*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1985.

229. Mohammad Azraf : *Abu Dharr Ghifari*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1980.

230. Maulavi S.A.Q. Husaini : *Ibn Al-Arabi*
Mohammad Ashraf
`Lahore, 1931.

231. Muhammad Amir Haider Khan : *The right path (A-Murajat)*
Zahara Publication
USA, 1987.

232. Mohammad Taqi Shariati : *Why Hassain Took Stand*
Islamian Grand Library
Iran.

233. M. T. Titus : *Idian Islam*
Oxford, 1930

234. M. Smith : *Studies in Early*
Mysticism in the near and middle east
London, 1931.

235. M. Wahiduddin : *Quranic Sufism*
London, 1959

Dhaka University Institutional Repository

236. Mukhtar H. Ali : *Philosophical Sufism*
An Introduction to the
School of Ibne al-Arabi
Routledge
London and New york
2022.

R

237. Rachida Chih : *Sufism in Ottoman Egypt*
Routledge
London and New York
2019.

238. R. A. Nicholson : *Mystics of Islam*
Cambridge, 1921.

S

239. Saiyid Safdar Hossain : *The Early History of Islam*
Peermahomed Trust
Pakistan.

240. Sayyid Ahmed Muhani : *Al-Sahifah Al Sajjadiyyah*
WOFIS
Iran, 1984.

241. Shah Sufi Syed Ahmadullah : *Azimpur Dayera Shariff*
Azimpur Dayera Shariff Khankah
Dhaka, 1996.

242. S. A. Ali : *The Sprit of Islam*
London, 1964.

243. S. A. Hai : *Muslim Philosphy*
A short survey
Dhaka, 1986.

244. S. A. Nasar : *History of Islamic Philosophy*
Vol- I and II
London, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

245. Said Abdul Hai : *Muslim Philosophy*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka,1982.

246. Spencer : *Mysticism in world religion*
London, 1965.

247. Susil Kumar Dey : *Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bangal*
Kolkata, 1942.

248. Sayedur Rahman : *An Introduction to Islamic Culture and philosophy*
Mullick Brothers
Dacca, 1963.

249. Sayed Mahmudul Hasan : *Islam*
Islamic Foundation Bangladesh
Dhaka, 1980.

250. Sir Md. Iqbal : The Reconstruction of religious thought in Islam
Lahore, 1965.

251. Sayed Athar Abbas Rezbi : *A History of Sufism in India*
Munshiram Monoharlal
Publishers Pvt. Ltd.
New Delhi, 2003.

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা ও ম্যাগাজিন

বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা ঃ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৯৯ বাংলা)

বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা ঃ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৯৭ বাংলা)

বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা ঃ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৪০১ বাংলা)

বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা ঃ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ১৯৮৪)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৭)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ ৩৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ২০০৪)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ২০০৬)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ২০০৮)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (ঢাকা ঃ ৬ষ্ঠদশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৪০৫ বাংলা)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (ঢাকা ঃ ১৩শ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (ঢাকা ঃ জুন, ২০০১)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (ঢাকা ঃ জুন, ২০০৭)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পত্রিকা (রাজশাহী ঃ ভাদ্র, ১৩৯৩ বাংলা)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পত্রিকা (রাজশাহী ঃ ১৯৭৩)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েল দর্শন বিভাগের পত্রিকা (জাহাঙ্গীরনগর ঃ জুন, ১৯৮৭)

প্রত্যাশা ঃ ত্রৈমাসিক (ঢাকাঃ এপ্রিল- সেপ্টেম্বর, ২০১২)

আত্মার বাণী ঃ মাসিক (ঢাকাঃ ডিসেম্বর, ২০০৮)

প্রথমআলো ঃ দৈনিক (ঢাকাঃ ২৮শে এপ্রিল, ২০২১)

পাঞ্চজন্য ঃ দৈনিক পত্রিকা (চট্টগ্রাম ঃ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৯ বাংলা)

জ্যোতি ঃ ত্রৈমাসিক (ঢাকাঃ জানুয়ারী, মার্চ, ২০০৩)

মদীনা ঃ মাসিক (ঢাকা ঃ মে, ২০০৫)

মদীনা ঃ মাসিক (ঢাকা ঃ মে, ২০০৬)

মঈনুল ইসলাম ঃ মাসিক (চট্টগ্রাম ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

আল বাইয়্যিনাত ঃ মাসিক (ঢাকা ঃ নভেম্বর, ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

Bengal District Gazetteers – Hughli, 1912

Bengal District Gazetteers – Rajshahi, 1916

Bengal District Gazetteers – Mymensing, 1910

Bengal District Gazetteers – Birbhum, 1910

East Bengal District Gazetteers – Dinajpur, 1912

East Bengal District Gazetteers – Dacca, 1912

East Bengal District Gazetteers – Chittagong, 1908

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1870

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1878

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1922

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1923

Varendra Research Society, Rajshahi, 1960

Proceedings of Asiatic Society of Bangal, 1870

Journal of Southeast Asian Studies, 2008